আবহমান

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিধর্মী
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
স ম্পা দ ক

শওকত হোসেন
নির্বাহী সম্পাদক

সুশান্ত শুভ
জনসংযোগ ব্যবস্থাপক

কবির আহমেদ কামাল
বর্ণবিন্যাস

তরুণকুমার মহলানবীশ
সেলিম আলফাজ
বানান সমন্বয়

আনিসুজ্জামান সোহেল
পৃষ্ঠাসজ্জা

প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৩/এফ-১ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট
পান্থপথ, ঢাকা ১২০৫
মুদ্রণ

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
প্রকাশক

১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
৯৬৬০৮১২, ৮৬১৮৫৬৭
০১৭৬ ৪৩৪৪৬৫
সম্পাদক ও প্রকাশকের ঠিকানা

কাইয়ুম চৌধুরী
প্রচ্ছদ

৩০.০০
মূল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

প্রবন্ধ

আবদুশ শাকুর

লণ্ঠন নন ঝাড়লণ্ঠন ১১

কবিতা

রফিক আজাদ

মৌলবীর দৌড় ভালো লাগে ৫৯

নির্মলেন্দু গুণ

মাগরিবের নিঃসঙ্গ আজান ৬১

আবিদ আনোয়ার

সন্ন্যাসীরা গাজন থামা ৬২

নাসির আহমেদ

শব্দভাষ্য ৬৩

শিহাব সরকার

প্রহরচিত্র ৬৪

কাজলেন্দু দে

একটি নিঃসঙ্গ গাছ ৬৫

ইকবাল আজিজ

মৃত্যু আর জীবনের কাব্য ৬৬

রেজাউদ্দিন স্টালিন

মুসা ও ফেরাউনের গল্প ৬৮

গল্প

শহীদুল জহির

কার্তিকের হিমে, জ্যোৎস্নায় ৬৯

প্রবন্ধ

মোঃ আনিসুর রহমান

'দারিদ্র্য' চিন্তার মানবিকীকরণ ৮৬

যতীন সরকার

অমূল্য বিদ্যাধনের মূল্যহীনতা ৯৭

আনু মুহাম্মদ

ধর্মের কথা জীবনের কথা ১১৯

কবিতা

রহমান হেনরী

অগ্নিকাণ্ড ১৩৬

চঞ্চল আশরাফ

প্রজন্ম ১৩৭

টোকন ঠাকুর

কুরঙ্গগঞ্জন : হরিণের লজ্জা দেখার লোভ ১৩৮

তুষার গায়েন

প্রকৃতির সন্নিহিত কোণে ১৩৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা পারভীন
বেহুলা কথন ১৪১
মজনু শাহ্
লীলাচূর্ণ ১৪২

গল্প
জাকির তালুকদার
আপনগোত্রের মানুষ ১৪৩
অদিতি ফাল্গুনী
জয়নালউদ্দিনস্ ট্রাভেলস্ ১৫২

অনুবাদ
খোন্দকার আশরাফ হোসেন
বাল্টিক সাগরের হাওয়া ১৭০

প্রবন্ধ
আহমাদ মোস্তফা কামাল
সংশয়ীদের ঈশ্বর ১৮৭
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম
বাংলার জাগরণের প্রথম পুরুষ
অক্ষয়কুমার দত্ত ২০১
মুশফিকুর রহমান
বিশ্বের উষ্ণায়ন এবং আমাদের
অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ ২২২
শোয়াইব জিবরান
নব্বই দশকের কবিতা প্রসঙ্গে ২২৯

বই
মাহবুবুল হক
'Postmodern Bangla
Poetry' : অধুনান্তিক বাংলা
কবিতার সংকলন ২৩৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স ম্পা দ কী য়

কারো কারো হয়তো মনে আছে যে, ষাট-সত্তর দশকে, আমরা, সেকালের তরুণরা, 'কণ্ঠস্বর'-নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা বের করেছিলাম। সেটি ছিল লিটল ম্যাগাজিন।

লিটল ম্যাগাজিনের মূল কাজ সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। নতুন সময়ের নতুন জীবনস্পন্দনকে তুলে ধরা। ঐ পত্রিকার মাধ্যমে আমরা কমবেশি সে-চেষ্টা করেছিলাম। এ কেবল আমরা করেছিলাম তা-ই নয়, এ আকুতি ছিল সারা ষাটের দশক জুড়েই। তাই ঐ দশকে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন বেরিয়েছিল। ষাটের দশক ছিল লিটল ম্যাগাজিনের দশক।

গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের সবক্ষেত্রের মতো এর শিল্পসংস্কৃতির অঙ্গনও হয়ে পড়ে দুরপনেয় নৈরাজ্যের শিকার। সাহিত্যিক সৃজনশীলতা হয়ে যায় নিষ্পত্রতা ও শৈত্যের হাতে জিম্মি। উঁচুমানসম্পন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতিধর্মী পত্রপত্রিকা, বিচ্ছিন্ন কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদে, হয়ে উঠেছিল একেবারেই দুর্লভ। সাহিত্যের অভিভাবকত্ব চলে গিয়েছিল দৈনিক পত্রিকার অর্ধরম্য হালকা চটুল সাহিত্যপাতার হাতে। সেখানকার ক্ষীণ পরিসরে ও রমণীয় আবহাওয়ায় আমাদের সম্পন্ন সাহিত্যের ধারা তার ঈপ্সিত চরণভূমি পায়নি। ফলে তা একধরনের ত্বকসর্বস্বতা ও আপাতরম্যের পায়ে আত্মনিবেদনের ভেতর নিঃশেষিত হয়েছে।

পৃথিবীর সব সৃষ্টির আগে একটা নৈরাজ্যের পর্ব থাকে। ঐ নৈরাজ্য তার যাবতীয় বিভ্রান্তি আর ভুলের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরবর্তী সৃষ্টির পথ কেটে বের করে। আমাদেরও হয়েছে তাই। বিশৃঙ্খলতার তীব্র আবর্তে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় চারপাশে ছড়িয়ে-পড়া আমাদের শিল্পসাহিত্যের অঙ্গন, প্রাথমিক দুর্যোগ কাটিয়ে, সম্প্রতি আবার সংঘবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে এসেছে এক শক্তিমান নতুন প্রজন্ম যা সম্পন্ন ফল উপহার দেওয়ার প্রস্তুতি শেষ করেছে। অপেক্ষাকৃত প্রবীনেরাও তিন দশকের নৈরাজ্য ও অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে আবার সৃষ্টি-সম্ভাবনায় যূথবদ্ধ হচ্ছেন। এরই মধ্যে সম্ভাবনার আশা জাগিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় বের হয়েছে ত্রৈমাসিক মননশীল পত্রিকা 'নতুন দিগন্ত' ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সম্পাদকীয় নেতৃত্বে মাসিক 'কালি ও কলম'। আশা করি এ ধরনের পত্রিকার সংখ্যা এখন ধীরে ধীরে বাড়বে। 'আবহমান' এই ধারায় একটি নতুন পালক সংযোজন করল।

'আবহমান'কে আমরা একটি ভালোমানের মননশীল ও সৃষ্টিশীল পত্রিকা হিসেবে বের করার কথা ভাবি। এই পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে রচনার সম্পন্নমান—এদের শৈল্পিক ও মননধর্মী দীপ্তি। এই ব্যাপারে পারতপক্ষে আপোস করা হবে না। অনন্তকাল বের করার দায় নিয়ে এই পত্রিকা বের হচ্ছে না। ততদিনই এ বের হবে যতদিন একটা মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যমান এ বজায় রাখতে পারবে।

০১.০১.২০০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ ব দু শ শা কু র

লণ্ঠন নন ঝাড়লণ্ঠন

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হয়নি কো নজরুল।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের বহুশ্রুত এই ছড়াটা কিন্তু বিভ্রান্তিই ছড়ায়। কারণ, 'ভাগ হয়নি' তো রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদও। বাংলাগানের এই পঞ্চপ্রধানের যৌথপরিবারটিও টিকে আছে আজও। মেজো, সেজো, ও ন-সদস্য দুর্বল হয়ে পড়লেও জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ উভয়েই প্রবল রয়েছেন অদ্যাবধি। কেবল রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলসংগীতই এখনও বহুলগীত। কারণ খুঁজলে মেলা কথাই পাওয়া যাবে, তবে শেষ কথা তো চাহিদা আর জোগানই। যদিও পঞ্চপ্রধান সংগীতপরিবারের মঞ্চে ব্যস্তসমস্ত আজ মাত্র দুই প্রধান, তবু জয়েন্ট ফ্যামিলির সমস্যাটি তো থেকেই যায়—কোনো-না-কোনো কারণে কাউকে-না-কাউকে ঠকতেই হয়। এ ক্ষেত্রে ঠকছে ছোটো তরফ।

বড়ো তরফের অবদানের তুলনা নেই অবশ্য ক্ষেত্রেই। তেমনি সংগীতের ক্ষেত্রেও তুলনা নেই, তবে সেটা তাঁর স্বদেশে—ধ্রুপদের দেশে। খেয়াল-ঠুংরির দেশে কথাটা খাটবে না। খাটবে যে না, তা আবার মনে থাকে না অনেকেরই। ফলে, 'তাল ভালো না কাঁঠাল ভালো'র মতো অর্থহীন প্রশ্নের উত্তরেও শোনা যায় রবীন্দ্রসংগীত ভালো (অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিলীপকুমারকে বলেছেন 'বটগাছের বিশেষত্ব তার ডাল আবডালের বহুল বিস্তারে, তালগাছের বিশেষত্ব তার সরলতা ও শাখা পল্লবের বিরলতায়। বটগাছের আদর্শে তালগাছকে বিচার করো না')। কথাটার জের টেনে বলা যায়, তার উল্টোটা করে উপরোক্ত উত্তরটাও দিও না। তবে ওই অতিসরলীকৃত জবাবটি নিহিত থাকে আমজনতার বোধে। বোধটি ওখানে বপিত হবার সূত্র বহুতর। রবীন্দ্রসংগীত রচিত হয়েছে সাতটি দশক ধরে, চর্চিত হয়েছে পাঁচ জেনারেশন কর্তৃক, মূল্যায়িত হয়েছে বেশুমার সভা-সেমিনার-প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেদার সংগীতগুণীর অজস্র গ্রন্থ মারফত। প্রতিপক্ষে, নজরুলসংগীত রচিত হয়েছে কিঞ্চিদধিক দেড়দশক সময়ে, মহোৎসাহে গীত হয়েছে প্রথম জেনারেশনে, অসাংগীতিক কারণে বিস্মৃত রয়েছে পরের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনারেশনে, পুনঃস্মৃত হয়েছে বর্তমান জেনারেশনে এবং মূল্যায়িত হচ্ছে কেবল বছর বিশেক ধরে।

তিন সহস্রাধিক গানের অন্বেষণ, আহরণ, শুদ্ধ্যশুদ্ধি নিরূপণ, বিশ্লেষণ, অনুধাবন, নির্ধারণের পরম্পরায়, বলতে গেলে, এখনও চলছে কেবল আজীবন অসুবিধাগ্রস্ত সংগীতস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলামকে সম্পূর্ণ আবিষ্কারের পর্ব। বিস্ময়বিক্ষুব্ধ তাঁর সংগীতসমুদ্রের উত্তুঙ্গ থেকে উত্তুঙ্গতর তরঙ্গের অভিঘাতে আবিষ্কারকেরও এখনও চলছে নিত্যনব অভিভবের পালা। তাই আমার মনে হয় নজরুলসংগীতের সম্যক মূল্যায়ন সুস্থিত হতে আরও অনেক সময় লাগবে। প্রকারান্তরে একই কথা বলেন সঙ্গীত প্রভাকর দেবব্রত দত্তও :

> 'কাব্য ও সুরবৈভব একই সুরসূত্রে সম্পৃক্ত ক'রে মালাকার তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য সুরগীতি সৃষ্টি ক'রে গেছেন তার সত্যিকারের মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয়নি। কবি নজরুল সঙ্গীত-জগতে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরকার। যা, কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করার উপায় নেই।' *['সঙ্গীত-তত্ত্ব (নজরুল প্রসঙ্গ)', পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯১, ব্রতী প্রকাশনী, কলিকাতা।]*

সত্যিকার মূল্যায়নকল্পে নজরুলবিষয়ক বহুবিধ কর্মসূচির বাস্তবায়ন বর্তমানে অপ্রতুল হলেও চলছে, যেসব শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। এখন দেখতে হবে অতীতের মতো অবমূল্যায়ন যেন ততদিনে আর একটা না-চলে। ভুঁইফোঁড় জ্ঞানে নজরুলের কাব্য অবজ্ঞাভরে পড়তে মানা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। ঘটনাটা সবিস্তারে বলা হবে যথাস্থানে। নজরুলসংগীতকে খাটো করতে বারণ করে আসছেন সাংগীতিক ও সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরীও—প্রথমে তাঁর প্রধান গ্রন্থ *সঙ্গীত পরিক্রমায়* :

> 'অধুনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার আবহাওয়ার ভিতর নজরুলসঙ্গীতকে খাটো করবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। একে ঠিক সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র বলতে চাই নে, তবে চারিদিকে যে নজরুল-সঙ্গীতের বিরুদ্ধে একটা ফিসফাস-গুজগাজের অভিযান চলছে সে লক্ষণ অতি স্পষ্ট। এই অভিযান অচিরেই স্তব্ধ হওয়া দরকার।' *[সঙ্গীত পরিক্রমা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃ. ১৯৫, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।]*

একই কথা তাঁকে পুনরায় বলতে হয়েছে তেরো বছর পরে, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাজী নজরুলের গান'-এ :

> 'কোনো কোনো মহলে নজরুলের সাংগীতিক প্রতিভার অবমূল্যায়ন করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতার সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের সম্পর্ক আছে। তাছাড়া উত্তরভারতীয় সংগীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে অচেতনতা কিংবা রাগ-রাগিণী সম্পর্কে অজ্ঞতাও এর একটা কারণ হতে পারে। প্রবণতাটি অশ্রদ্ধেয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।' *['কাজী নজরুলের গান', ১৯৭৭, পৃ. ৮৯-৯০, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।]*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব মহলের তিনজন সর্বজনবিদিত প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধের শেষাংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, যাতে এঁদের রচনাবলী পড়ে পাঠক নজরুলসংগীত সম্পর্কে একতরফা ধারণার বশবর্তী না হন।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম প্রতিষ্ঠা পান কবিতায়। তাঁর সংগীতও সমাদৃত হয় পরপরই। শেষের দিকে তিনি নিজেই তাঁর কাব্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশের সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে সংগীতে অবদানের ব্যাপারে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁর সেই পূর্বাভাষকে সঠিক প্রমাণ করে আজ নজরুলের সংগীতই উঠে এসেছে অগ্রে, কাব্যকে পশ্চাতে ঠেলে। তবু ভুললে চলবে না যে কবি নজরুল কবিতা দিয়ে কলকাতা জয় না করলে গায়ক নজরুল গান দিয়ে অমন তাৎক্ষণিক মনোযোগ পেতেন না উপমহাদেশের ওই সাংস্কৃতিক রাজধানীর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলকাতার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বৎসরের চোখধাঁধানো ফসল নজরুলকে একের পর এক বিশেষণ অর্জন করে দেয়—'হাবিলদার কবি', 'বাঁধনহারার কবি', 'শাতিল আরবের কবি', 'সৈনিক কবি' প্রভৃতি। বছরটি ঘুরতেই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে নজরুলের স্থায়ী বিশেষণটি জুটে যায়—'বিদ্রোহী কবি'। তাই নজরুলের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালীন সাহিত্যকৃতির কথা কিছুটা বিস্তারিতই বলতে হবে—আনুপূর্বিক ধারাভাষ্যের মতো হলেও। তাতেই বোঝা যাবে যে, একেবারে ভুঁইফোঁড় ছিলেন না নজরুল। পারিপার্শ্বিকতার নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে হলেও, প্রস্তুতি-নির্মিতি চলছিল তাঁর সর্ব অবয়বেই।

AMARBOI.COM

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ ১৯১৯ খৃস্টাব্দে। তিনি করাচি থেকে গল্প পাঠালেন 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী', প্রকাশিত হল সওগাত পত্রিকায়। একই বছর তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়। ১৯২০ সালে করাচি থেকে কলকাতায় চলে এলেন তিনি। সেখানে প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক সাড়াজাগানো কবিতা 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম', 'আনোয়ার', 'কামাল পাশা'। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে রচিত 'বিদ্রোহী' ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'বিজলী' পত্রিকায় আগে এবং 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় পরে। 'বিজলী'র ম্যানেজার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরোনো কথা'-নামক রচনায় (বসুমতী, কার্তিক ১৩৬১) জানিয়েছেন যে, নজরুল 'বিজলী'র কপি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে তাঁর 'গুরুজী'-কে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি শুনিয়ে এসেছেন। সে-বছরই প্রকাশিত হয় তেইশ বছরের যুবক নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ *ব্যথার দান*, প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিবীণা*, প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ *যুগবাণী*।

এ-বছরেরই ১১ আগস্ট আত্মপ্রকাশ করে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'। পত্রিকাটির জন্য আশীর্বাণী চেয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। টেলিগ্রামটি পেয়েই কবিগুরু বাণীটি প্রেরণ করেন। এ-সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে লেখেন, 'এ নজরুল যার কবিতায় পেয়েছেন তিনি তপ্ত প্রাণের নতুন সজীবতা। শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন ধূমকেতুর মর্মকথা কি!...' রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত আশীর্বাণীটি 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা থেকে ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত ১ম পৃষ্ঠায় আর ৭ম সংখ্যা থেকে সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপরে ছাপা হয় :

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন!

২৪শে শ্রাবণ *শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*
১৩২৯

'ধূমকেতু'র ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে'-শীর্ষক রূপক কবিতাটি প্রকাশিত হয়, যে-কবিতার জন্য তাঁকে গ্রেফতার ও বিচার করে দণ্ড দিয়ে আলীপুর জেলে পোরা হয়। বিচারকালে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রদত্ত নজরুলের বিবৃতি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'-নামে ধূমকেতুর 'কাজী নজরুল সংখ্যা'য় প্রকাশিত হয় ২৭শে জানুয়ারি ১৯২৩ সালে। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে নজরুলের কারাবাসকালে তাঁকে ১৯২৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি উৎসর্গ করে উৎসর্গপত্রে লেখেন :

উৎসর্গ
শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু
১০ই ফাল্গুন ১৩২৯

বইটি কারারুদ্ধ কবির হাতে পৌছানোর প্রক্রিয়ায় একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। তাই সেটা 'স্ট্রেট ফ্রম দ্য হর্সে'জ মাউথ' শোনা ভালো। নজরুলের সুহৃদ 'সবুজপত্রে'র সম্পাদনা-সহকারী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে (১৮৯৩–১৯৭৪) ডেকে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো, আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও।" *[পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবি স্বীকৃতি, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, শীতসংখ্যা ১৩৭৬]*

সম্ভবত ঠাকুর পরিবারের বা ব্রাহ্মসমাজের বাইরে তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করতেন না রবীন্দ্রনাথ তখনও পর্যন্ত। তার ওপর উৎসর্গপত্রে লিখেছেন 'কবি'। মোট কথা উপস্থিত ভক্তগণ অখুশি হন। ফলে অমল হোমের নেতৃত্বে তাঁদের সঙ্গে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত বাক্যবিনিময় হয় :

"নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র।

মার মার কাট কাট ও অসির ঝনঝনার মধ্যে রূপ ও রসের প্রলেপটুকু হারিয়ে গেছে, উপস্থিত একজন মন্তব্য করলেন।

কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐক্যতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত।

কিন্তু তার রূপ হত ভিন্ন, আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল।

দু-জনের প্রকাশ তো দু'রকম হবেই কিন্তু তা বলে আমারটা নজরুলের চেয়ে ভাল হত, এমন কথাই বা জোর করে বলবে কি করে ?

যাই বলুন, ও অসির ঝনঝনা জাতির মনের আবেগ ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলী কাব্যের জনপ্রিয়তাও মিলিয়ে যাবে, মন্তব্য এল ফরাস থেকে।

জনপ্রিয়তা কাব্যবিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।" *[পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত]*

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য 'বসন্ত'র একটি কপিতে নিজের নামটি লিখে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন :

"তাকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিও তো চাই।" *[পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত]*

হয়তো কবিগুরুর কাছে কবি-স্বীকৃতি পাওয়ার প্রেরণাতেই সেই আলীপুর জেলে নজরুল রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। মাস দেড়েক পর নজরুল স্থানান্তরিত হন হুগলী জেলে। সেখানে রাজবন্দীদের ওপর জেলকর্মচারীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯২৩ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে অনশন-ধর্মঘটরত কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলকে শিলং থেকে টেলিগ্রাম পাঠান রবীন্দ্রনাথ :

Give up hunger strike, our literature claims you

পরে এ সম্পর্কে তিনি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে লেখেন, 'জেল থেকে memo এসেছে, the addressee not found অর্থাৎ ওরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না ... নজরুলের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।' আসলেই হয়তো তাই, যেজন্যে অনশন ভাঙার অনুরোধ করার জন্য ১৭ মে সশরীরে জেলখানায় গিয়েও নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হন উদ্বিগ্ন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পল্টন-ফেরৎ এক তরুণের মাত্র বছর-তিনেকের কবিতা, গান আর সম্পাদকীয় নিবন্ধের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক উৎসর্গকরণ, বাংলাসাহিত্যের জন্য তার জীবনরক্ষার দাবি উত্থাপন, একই অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য সশরীরে শরৎচন্দ্রের জেলখানায় গমন—সেই পুরাতন কথাটাই স্মরণ করায় যে, জহুরিই জহর চেনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল'নামী পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্রস্বরূপ নজরুল 'লাঙ্গল' পত্রিকা বের করেন ১৯২৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। 'লাঙ্গলে'র জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশীর্বচন জোগাড় করার ভার পড়েছিল মহর্ষির প্রপৌত্র বিপ্লবী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৯০১–৭৪) উপর। আর্জি পেশ করতেই রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন—'জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভরা হল, প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।' পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণীটি ছাপা থাকত।

বস্তুত, কবিগুরু এই প্রাণবন্ত তরুণ কবিকে সর্বদাই স্নেহের চোখে দেখতেন। ১৯৩৫ সালে নজরুল কলকাতার সাপ্তাহিক 'নাগরিক' পত্রিকার ২য় বর্ষ ১ম বার্ষিক সংখ্যার জন্যে লেখা চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে লেখেন :

'কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুশী হোলো। কিছু দাবী করেছ—তোমার দাবী অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুস্কিল এই, পঁচাত্তরে পড়তে তোমার এখনো অনেক দেরী আছে, সেইজন্য আমার শীর্ণ শক্তি ও জীর্ণ দেহের পরে তোমার দরদ নেই। কোনো মন্ত্রবলে বয়স বদল করতে পারলে তোমার শিক্ষা হোতো। কিন্তু মহাভারতের যুগ অনেক দূরে চলে গেছে, এখন দেহেমনে মানব সমাজকে চল্‌তে হয় সায়েন্সের সীমানা বাঁচিয়ে।...

তুমি তরুণ কবি, এই প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক, করুণা দাবী করতে পারে। অকিঞ্চনের কাছে প্রার্থনা করে তাকে লজ্জা দিওনা। এই নতুন যুগে যে সব যাত্রী সাহিত্য-তীর্থে যাত্রা করবে, পাথেয় তাদের নিজের ভিতর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।

শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়—কখনও যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে পারো খুশী হব। স্বচক্ষে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থাও দেখে যেতে পারবে।

ইতি ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪২।

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

[পৃ. ১৭৮–৭৯, কাজী নজরুল ইসলাম/জীবন ও সৃষ্টি, রফিকুল ইসলাম, দ্বিতীয় ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭]

নজরুল গুরুদেবের গদ্যপত্রটির উত্তর দেন কবিতায় (যেটি 'নাগরিক' পত্রিকার ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে) :

হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী, আমারে করিও ক্ষমা!
পর্বত-সম শত দোষ-ত্রুটি ও-চরণে হল জমা।
জানি জানি তার ক্ষমা নাই, দেব, তবু কেন মনে জাগে
তুমি মহর্ষি করিয়াছ ক্ষমা আমি চাহিবার আগে।
... ...
তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বের বিস্ময়,—
তব গুণ-গানে ভাষা-সুর যেন সব হয়ে যায় লয়,
তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব, এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মূক বাণী।
কাব্যলোকের বাণী-বিতানের আমি কেহ নহি আর,
বিদায়ের পথে তুমি দিলে তবু কোন্ এ আশিস হার ?
প্রার্থনা মোর, যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে,
আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে!!

[প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯]

AMARBOI.COM

নজরুলের সর্বজনপ্রিয়তা প্রথম বিঘ্নিত হয় ১৯২৪ সালে তাঁর আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহকে কেন্দ্র করে। বিয়েটির কারণে ব্রাহ্মসমাজের একাংশ বৈরী হলে 'প্রবাসী'তে নজরুলের লেখা ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। তিনমাসের মধ্যেই 'প্রবাসী' থেকে জন্ম হয় 'শনিবারের চিঠি'র। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে জানিয়েছেন যে, জন্ম থেকেই পত্রিকাটির গালাগালির তাক ছিল নজরুল এবং 'নজরুলী রন্ধ্রপথেই' তাঁর আর মোহিতলালের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশাধিকার জুটেছিল। নজরুল 'কল্লোল'গোষ্ঠীর লেখক হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারের বাড়তি সুবিধে হয়েছিল সজনী ও কোম্পানির। দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টায় নানান কায়দায় অত্যাধুনিক কল্লোলী লেখকগোষ্ঠী, বিশেষত কাজী নজরুল ইসলাম আর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে একসময় রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত জড়াতে সফল হয় 'শনিবারের চিঠি'র দল।

প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্রপরিষদে এক সংবর্ধনার উত্তরে বাংলা কবিতায় 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এক মন্তব্যে দীর্ঘসূত্রী বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 'শনিবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি'র সজনীকান্তের এবং 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> '... সেদিন কোন একজন বাঙ্গালী কবির কাব্যে দেখলুম তিনি 'রক্ত' শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙ্গা রং যদি না ধরে তা হলে বুঝব সেটাকে তাঁরি অকৃতিত্ব। তিনি রঙ্গ লাগাতে পারেন না ব'লেই তাক্ লাগাতে চান।'

নজরুল তাঁর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন এবং এর মধ্যে সেটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। গানটিতে আছে "কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশির প্রান্তর, বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে দরিদ্র-জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গেও বিরূপ মন্তব্য করেছেন—সেটাও দারিদ্র্য দ্বারা 'মহান'-হওয়া নজরুলের গায়ে লাগা অস্বাভাবিক ছিল না। সঙ্গত কারণেই অনেকের মতো নজরুলেরও মনে হয় যে, তিনিই এসব রবীন্দ্র-মন্তব্যের লক্ষ্য। অতএব ১৩৩৪ সালের ১৪ পৌষ প্রকাশিত 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ'-শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে ধারালো ভাষায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য খণ্ডন করে নজরুল আত্মপক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। বিষয়টি বিতর্কে গড়িয়ে যাওয়ায় মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসেন প্রমথ চৌধুরী এবং তিনি 'আত্মশক্তি' পত্রিকার ২০ মাঘ সংখ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা'-নামক একটি প্রবন্ধ লিখে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটান।

চৌধুরী মহাশয় তাঁর স্বভাবসুলভ স্টাইলে লেখেন যে, সে-সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং গুরুদেবের মন্তব্যটি স্বকর্ণে শোনা সত্ত্বেও লক্ষ্যবস্তু নজরুল বলে মোটেই মনে হয়নি তাঁর বরং মনে হয়েছে কবিগুরু কোনো উদীয়মান কবির 'খুনের' কথা বলছেন, উদিত কবির নয় (পরে 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত রিপোর্টমতে রবীন্দ্রনাথ 'কোন বাঙ্গালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম' বলেছিলেন)। তাছাড়া বাংলা কবিতায় যে 'খুন' চলছে না, এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ কাজী সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' কাব্যে 'খুনের' সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। তবে এসব খুন এত বেমালুম খুন যে হঠাৎ সে খুন কারও চোখে পড়ে না। উপসংহারে প্রমথ চৌধুরী খুনের কিছু গুণগানও করেন এই বলে যে, বাংলা ভাষায় খুনের যত মিল পাওয়া যায়, তার শতাংশের একাংশ মিলও রক্তের পাওয়া যায় না। সুতরাং খুনকে বাদ দেওয়া মানে 'রাইম'কে তালাক দেওয়া। অথচ কে না জানে যে 'রাইমে'র জন্য 'রিজনে'র সাত খুন মাফ। শুধু লিখেই দায়িত্ব শেষ করেননি, প্রমথ চৌধুরী অতঃপর নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান এবং তাঁদের শ্রদ্ধা-স্নেহের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে। অল্পদিন পরে সে-বছরেরই ৪ ও ৭ চৈত্র জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে নবীন সাহিত্যিকদের একটা সভা ডাকেন রবীন্দ্রনাথ। সভায় তিনি যেমন আধুনিকতার উগ্র তামসিকতাকে সমর্থন করেননি, তেমনি সাহিত্য সমালোচনায় অসাহিত্যিক পদ্ধতিকেও সমর্থন করেননি। সভাটির প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্লোলীদের সঙ্গেও বিক্ষুব্ধিমুক্ত হয়। সাহিত্যে এই 'খুনের মামলা'র পূর্বেই নজরুল সংগীতে অশ্রুতপূর্ব বীররসের গানের সমসময়ে অভূতপূর্ব শৃঙ্গাররসের গানেও চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার সংগীতসমাজের কানে।

নজরুলের সংগীতবিষয়ে লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত'-উৎসর্গের কথা এবং প্রমথ চৌধুরীর 'খুনের' মামলার কথা সবিস্তারে বলার উদ্দেশ্য কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এক। অসাধারণ অর্জনের শতাধিক বৎসরের পরম্পরায় পুঞ্জিত 'উন্নাসিকতা'র শহর কলকাতার বিশ্বখ্যাত সারস্বত সমাজের পটুতা, কুশলতা, নিপুণতা, কর্তব্যপরায়ণতাসহ বিস্ময়কর সচেতনতার স্তর। কোথা থেকে কোন্ এক ছোকরা এসে কী লিখল আর কী গাইল, অমনি তার তাবৎ খোঁজখবর নিয়ে হিসেব কষে নিকেশ করে প্রত্যেকটি উৎপাদের সঙ্গে প্রাইসট্যাগ সেঁটে সকল উপায়ে সকলকে সকলের জানিয়ে দেওয়া। জ্ঞানচারী সমাজের মিথস্ক্রিয়ার এই প্রক্রিয়াতেই বাংলার সাহিত্য-সংগীতের রাজা ও উজীর তথা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে অমেয় মূল্য পেয়ে যাওয়া নজরুলীয় ফসলের প্রথম মৌসুমেই।

দুই। বৃটিশভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতায় তখন চলছিল সকল বয়সের প্রতিভারই মিছিলের পর মিছিল। তাদের চোখধাঁধানো আতসবাজির রকমারি কারুকাজে মহানগরীর দিগন্ত থেকে দিগন্ত ছিল উদ্ভাসিত। সেখানে বাহির থেকে আরেকটা বড়ো মাপের প্রতিভা এসে হাজির হলেও প্রথমে হারিয়ে যাওয়াই হতো তার নিশ্চিত নিয়তি। কিন্তু সে-নিয়তি নজরুলের না-হওয়ার কারণ তাঁর জিনিয়াস আতসবাজির সঙ্গে আতসবাজি যোগ না-করে ফাটিয়েছিল আণববোমা—সমানে কাব্যে এবং সংগীতে। তাই উভয় জগতেই নজরুলের আগমনটাই ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আর, নতুন সংযোজনের অর্থে, তাঁর অবদান ছিল সংগীতের সব শাখাতেই ঐতিহাসিক—উদ্দীপনামূলক গানে, গজলশীর্ষক গানে, হিন্দু ভক্তিমূলক ও ইসলামী গানে, হালের নবনামাঙ্কিত 'ধ্রুপদী আধুনিক' গানে, লোকসুররঞ্জিত গানে এবং অশেষ প্রচ্ছন্নশক্তিসম্পন্ন রাগপ্রধান বাংলা গানে। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গানে তো নজরুল এককই—যাঁর 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার'-নামক 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র তুলনা সুভাষ বসু ভারতবর্ষের কোনো ভাষাতেই পাননি (গোপাল হালদার যেমন নজরুলের 'ভাঙার গান'কে বলেছেন 'জাতীয় আন্দোলনের প্রথম মহান সংগীত', Kazi Nazrul Islam, 1973, Sahitya Academy, New Delhi)। কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, জেলেদের গান, ছাত্রদলের গান এবং তাঁর অন্তরন্যাশনাল সংগীত (জাগো অনশন-বন্দী ওঠ রে যত) ইত্যাদি বিপ্লবী সংগ্রামী শ্রেণীসচেতন গানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা গণসংগীতের পথিকৃৎও জ্ঞান করতে হবে কাজী নজরুল ইসলামকেই। নজরুলের জাগরণী গানগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সঙ্ 'জাগো অনশন-বন্দী ওঠ রে যত' কমরেড মুজফফরের মতে 'বাংলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট তো বটেই, আমার বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় ভাষাগুলিতে যতসব অনুবাদ হয়েছে সেসবেরও সেরা'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাম্যবাদী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক এই ইন্টারন্যাশনাল সংগীতটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হয় অভিন্ন সুরে—দুনিয়ার মজদুরের ঐক্য বোঝানোর জন্য। নজরুলের অনুবাদে এই গান বাংলা গানের ইতিহাসে এক নতুন ধারা সংযোজন করে, এ-অর্থে যে বাংলা দেশাত্মবোধক ধারায় তাঁর এ রচনা অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক সাম্যের আন্তর্জাতিক আবেদনটির জোরালো প্রতিফলন ঘটায়।

তিন। বাংলার সংস্কৃতির জগতে আবির্ভাবমাত্রই নজরুলের স্বীকৃতির ভিত্তি ছিল কবিত্ব। ডে-ওয়ান থেকেই দুহাতে লেখা তাঁর কবিতা এবং স্বরলিপিসহ গান ছাপা হচ্ছিল 'কল্লোল' 'কালিকলম'সহ কলকাতার নামীদামী সকল পত্রিকায় সমীহ জাগানো মানে এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণে। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, বাংলা পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের পূর্বমুদ্রিত রচনার প্রতি অনাগ্রহ অতিশয় সুবিদিত হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের স্বরলিপিসহ বহু গান এবং দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর কবিতাও সংকলনপূর্বক পরপর মুদ্রিত হতো একের পর এক পত্রিকায়—এমনকি অনেক অভিজাত পত্রিকায়ও। রবীন্দ্রবলয়ের তখনকার দুই প্রধান কবিই নজরুলের কবিত্বে ছিলেন সমানে উচ্ছ্বসিত—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার (প্রাক্ 'বিদ্রোহী'-পর্বের)।

প্রথমজন একদিন 'গজেনদার আড্ডা'য় বলেন, "কই পবিত্র তোমার 'শাতিল আরবে'র কবি কোথায়! ...কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলো আমায় টানে। কি অনবদ্য মিল ও ছন্দ, অথচ কত আরবী পারশি শব্দ নিয়ে এ ছন্দ মিলকে বাঁধতে হয়েছে।" তারপর কাজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই 'সত্যেনদা জড়িয়ে ধরেন কাজীকে, বলেন, "তুমি ভাই, নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা ত' নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।" 'গুরুদেব আমার কোন লেখা পড়েছেন নাকি।' বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করে কাজী। "সত্যি বলতে কি" বললেন সত্যেনদা, "গুরুদেবই আমাকে একদিন নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছি কি না। তাঁর মতে ভাবের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনার এই এক নতুন অবদান আনছ তুমি।" 'গুরুদেব বলেছেন!' আনন্দের আতিশয্যে মুখের কথা শেষ করতে পারে না নজরুল। *[পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন' দ্বিতীয় পর্ব]*

দ্বিতীয়জন, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুলের 'খেয়াপারের তরণী' আর 'বাদল-প্রাতের শারাব' পড়ে মুগ্ধ হয়ে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদককে দীর্ঘ একটি প্রশংসাপত্র লেখেন কাব্যের ভাব, ছন্দ, ধ্বনি ইত্যাদির উৎকর্ষ সবিস্তারে ব্যাখ্যা সহকারে। তিনি প্রথম কবিতাটি সম্পর্কে লেখেন, 'বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই।' 'ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে, কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লংঘন করে নাই, এই প্রকৃত কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে।' নজরুলের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি আরও লেখেন, 'এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়ডম্বরু ধ্বনিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাভূত করিয়াছে—বিশেষ এই শেষ ছত্রের বাক্য "লা শরীক আল্লাহ্" যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্যযোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।' দ্বিতীয় কবিতাটি সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'বাদল-প্রাতের শারাব' শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিতেও কবির 'মস্ত' হইবার ও 'মস্ত' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।' পত্রটির এক জায়গায় অভিভূত কবি-সমালোচক মোহিতলাল লেখেন : 'আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি, এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখকসাধারণের পক্ষ হইতে আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।' *[১৩২৭ ভাদ্র সংখ্যা, মোসলেম ভারত]*।

পত্রিকাটির কার্তিক সংখ্যায় কবি নজরুলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব শান্তিনিকেতনের কবি সুধাকান্ত রায়চৌধুরী 'সৈনিক নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি'-শীর্ষক একটি কবিতায়। কবিতাটির প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি 'ছন্দে গানে বাজাও কবি বাজাও প্রাণের গান, / মুগ্ধ করো বিশ্বজনে দাও নূতন প্রাণ। / দমকে চলা হাওয়ার মত ছন্দ তোমার চলে / মাড়িয়ে সকল বাধা তোমার ক্ষিপ্র চরণ তলে।'

আধুনিক কবিতার বিখ্যাত ভাষ্যকার বুদ্ধদেব বসুও তাঁর 'নজরুল ইসলাম'-নামক প্রবন্ধে বলেন নজরুল 'সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনাপূর্ণ। সে-কবি শুধুই বীররসের নন, আদিরসের ক্ষেত্রেও তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, এমনকি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর।' বুদ্ধদেব তাঁর 'Modern Bengali Music and Nazrul Islam' শীর্ষক প্রবন্ধটিতেও লিখেছেন, 'His best songs are his best poems and, when considered in conjunction with the music, his strongest claim on posterity's attention.'

তাহলে দেখা যায় বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞগণ বলছেন যে, কাজী নজরুল ইসলাম একজন উচ্চমানের মৌলিক কবি। এখন দেখা দরকার—গীতিকাব্যের জন্য কত উচ্চমানের কবিতা প্রয়োজন এবং উচ্চতম মানের কবিতা অপরিহার্য কি-না। সুবিদিত সংগীতবোদ্ধা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কথা ও সুর' গ্রন্থে বলেছেন, 'বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় সাহিত্যের ও সঙ্গীতের আবেদন ভিন্ন আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া চাই। ... কবিতা বুঝতেই যদি বেগ পেতে হয় তবে সেটা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হতে পারে না। ... সেই জন্যই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় দুর্বোধ্য কথার বদলে পুরাতন ও পরিচিত কথারই প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে শ্রোতার দাবি খুব বেশি। গীতিকবিতায় অর্থ বোঝার তাড়া নেই, কাজ করবার হুকুমও নেই। আছে খেয়াল, খামখেয়াল, যেটি গম্ভীর হলেও চলবে—কিন্তু সুগভীর চিন্তাধারা হলে চলবে না, হাল্‌কা হলেও চলবে কিন্তু তার উত্তেজনায় নেচে উঠলে চলবে না।' সারকথা : সঙ্গীতে কাব্য থাকবে সনাতন। অর্থাৎ কাব্য সারগর্ভ না হলেও সঙ্গীতে সার বর্তাতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতে, কবিত্বের দোষে সংগীতে নজরুলের অতটা ভোগা সঙ্গত হয় না, যতটা তিনি ভুগছেন। আসলে এটা ঘটছে প্রধানত দোষৈকদর্শীদের কারণে। অন্যথায় নির্দোষ কাব্যাংশ সংবলিত কাব্যগীতিও তাঁর অত শতই রয়েছে যত শত সম্ভবত বাংলাগানের পঞ্চপ্রধান-পরিবারের মেজো, সেজো, অথবা ন-তরফ রচনাই করেননি। জ্যেষ্ঠ তরফের থেকেও হাজারখানেক গান বেশি রচনা করেছেন এই কনিষ্ঠতরফ—যা বাছপড়া হবার জন্যও যথেষ্ট হতে পারে। নজরুলসংগীতের অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে দুটি নির্দিষ্ট বিষয়ও মনে পড়ছে—কিছু শক্তিমান সমালোচকের অমনোযোগী উচ্চারণ আর অধিজন শ্রোতার অত্যল্পসংখ্যক নজরুলসংগীত শ্রবণ, তাও শ্রোতা হিসেবে যথেষ্ট প্রস্তুতি ব্যতিরেকে।

এই সমস্ত বিষয় সবিস্তার বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক, প্রামাণ্য নজরুলসংগীত গবেষক ডক্টর করুণাময় গোস্বামী তাঁর দীর্ঘ ডক্টরাল ডিসার্টেশনের উপসংহারে চুম্বকস্বরূপ যে-কথা বলেছেন সেটাই সারকথা :

> 'এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই বলা যায় যে বাংলা কাব্যগীতির মহান স্রষ্টারূপে কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। নবধারা প্রবর্তনে ও প্রবর্তিত ধারায় নবপ্রাণ সঞ্চারে বাংলা কাব্যগীতির সমৃদ্ধিসাধনে তিনি অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। অবদানের বিপুলতায় ও বহুমুখিতায় তাঁর কোন তুলনা আছে বলে মনে হয় না।' *[ডক্টর করুণাময় গোস্বামী, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ৪২৬)।*

সম্মানিত নজরুল-গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামও প্রকারান্তরে একই কথা বলেছেন :

> 'লেটো কবিয়াল নজরুল, স্বদেশী চারণ গীতিকার নজরুল, গণসংগীতের পথিকৃৎ নজরুল, বাংলা গজল গানের স্রষ্টা নজরুল, বাংলা ইসলামী গানের ধারা সংযোজক নজরুল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্যামাসংগীত রচয়িতা নজরুল ; লুপ্ত, অপ্রচলিত, নতুন রাগরাগিণীর উদ্ধারকারী ও স্রষ্টা নজরুল গ্রামোফোন, বেতার, চলচ্চিত্র ও মঞ্চ এই চারটি প্রধান মাধ্যমের অন্যতম প্রধান সংগীতস্রষ্টা ছিলেন ১৯২৮ থেকে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ প্রায় ১৪ বছর। এই সময়ে বাংলা গানের আধুনিক ধারার উদ্ভব ও বিকাশ। বস্তুত আধুনিক বাংলা গানের উদ্ভবলগ্নে অসাধারণ সৃজনশীল মৌলিক সংগীত প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলামের অবদান বাংলা গানের ঐ নতুন ধারাকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। হাজার বছরের বাংলাগানের প্রতিটি ধারার মহামিলন মোহনা 'নজরুল সঙ্গীত', যা অপর কোনো সঙ্গীতস্রষ্টার সৃষ্টিতে পাওয়া যায় না।' *[ডক্টর রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৯৭]।*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

কাজী নজরুল ইসলামের শিল্পীজীবনের প্রস্তুতি কিংবা নির্মিতি সম্পর্কে অবহিতির অভাবই পরিলক্ষিত হয় সাধারণ্যে। তিনি ভুঁইফোঁড় ছিলেন না (যেমনটা অনেকেরই অনুক্ত ধারণা)। তাঁর শিক্ষানবিসির প্রথম দুটি পর্ব কেটেছিল লেটোর দলে ও হাইস্কুলে আর তৃতীয় পর্বটি সৈন্যের দলে। নয় বছর বয়সে পিতৃহারা বালকটিকে মক্তব পাশ করেই মসজিদে ইমামতি এবং মাজারের খাদেমগিরি করতে হয়। নজরুল এগারো বছর বয়সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠকালেই লেটোর দলপতি পিতৃব্য কাজী বজলে করিমের দলে ভিড়ে গিয়ে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য হয়ে যান। উর্দু-ফার্সি-আরবীতে সুপণ্ডিত কাজী করিমের ভণিতায় গোপনে নিজেই গান লেখা শুরু করেন ভাতিজা নজরুল। শুনে গুরু নাকি ক্ষুদে শিষ্যটিকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত কবিয়াল ইসহাক মিঞার বিপক্ষে ওই বয়সেই অবতীর্ণ ক্ষুদে নজরুলের কবিয়ালির নমুনা :

পাল্লা সাথে লেটোর ল্যাঠা লাগলো
ছড়াদার ও দোঁহাররা সব ভাগলো॥
ওদের ছন্দসুরের মিল নাইকো গানেতে
ওঁ মিঞার জ্ঞান নাইকো তানেতে
(ওদের) মাটির সাথে 'আকড়া' মিশাল ধানেতে
ষাঁড়ের সাথে গাধা বাঁধা থামেতে
দেখে ইহা ভদ্রলোক রাগলো॥

লেটোর জগতেই নজরুলের সংগীতজীবনের উদ্বোধন হয়। লেটোর গান রচনার জন্য তাঁকে তখনই পড়তে হয়েছিল কোরান-হাদিস, গীতা-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি। নিজের লেটোদলের জন্যই নজরুল একের পর এক রচনা করেন চাষার সঙ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, শকুনিবধ, দাতাকর্ণ, আকবর বাদশাহ্, কবি কালিদাস, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ প্রভৃতি পালা এবং গ্রামীণ ইসলামী গান। লেটোর পালার শুরুতেই থাকে বন্দনা। কিশোর কবি রচিত বন্দনাগীতির নমুনা :

সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারীতালা
তারপর দরূদ পড়ি মোহাম্মদ সল্লে আলা।
সকল পীর আর দেবতাকুলে
সকল গুরুর চরণমূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে

দোওয়া কর তোমরা সবে হয় যেন গো মুখ উজালা
সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারি ওগো খোদাতালা॥

লেটোর দলের জন্যে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ অবলম্বনে প্রেমের জ্বালার গানও লিখলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাবালক কবি :

বুঝলাম নাথ এতদিনে
যুবকের ছলনা হে
কোথা শিখিলে এ প্রণয়
আমারে বল না হে॥
... ...
এই রূপে কত কামিনী
মজায়েছেন গুণমণি
কপালদোষে বিরহিণী
তোমার আর হল না হে॥

বিরহজ্বালায় মরিলাম
আর জ্বালায়ো না বাঁকাশ্যাম
ভেবে বলে নজরুল ইসলাম
মেরো না ললনা হে॥

গ্রামীণ নবীনের শহুরে প্রবীণের মতোই রঙ্গগীতি রচনার নমুনা :

রব না কৈলাসপুরে আই অ্যাম ক্যালকাটা বাউন্ড
যত সব ইংলিশ ফ্যাশান, আহা মরি কি লাইটনিং।

ইংলিশ ফ্যাশান সবই তার
মরি কি সুন্দর বাহার
দেখলে বন্ধু দেয় দেখায়
কামন্ ডিয়ার গুডমর্নিং।

বন্ধু আসলে পরে
হাসিয়া হ্যান্ডশেক করে
হোল্ডিং আউট এ মিটিং। ... ইত্যাদি।

রচনাটিতে গ্রামীণ কিশোরের শহর কলকাতার জন্য হাহাকার দিল্লীবাসী প্রবাদপ্রতিম কবি মির্জা গালিবের কবিতায় ব্যক্ত 'কলকাতা'-উচ্চারণ উদ্ভূত আহাজারি স্মরণ করায় আমাকে (কেলকাত্তে কা জো জিকর কিয়া তুনে হামনাশী / এক তীর মেরে সীনে মে মারা কে হায় হায় !)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ বহু বাঙালি কবি এমনি ইঙ্গবঙ্গ ভাষায় ব্যঙ্গকবিতা ও রঙ্গগীতি রচনা করেছেন একসময়।

শুধু রকমারি সৃজনশীলতা নয় নানারকম সংস্কৃতিমনস্কতাও ছিল, সব স্কুলেরই ক্লাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠ ছাত্র, নজরুলের জীবনের নিত্যসঙ্গী। তাঁর প্রারম্ভিক জীবন সম্পর্কে একটু-আধটু যা জানা যায় তাতেও অনুরূপ তথ্যই মেলে। যেমন, ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহের দরিরামপুরে ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় স্কুলের বিচিত্রানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' এবং 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে নজরুল আসর জমিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ধমানের যে-স্কুলে দশম শ্রেণীতে পাঠকালে ১৯১৭ সালে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, সেই সিয়ারসোল রাজ স্কুলের কয়েকজন গুণমুগ্ধ শিক্ষকের ব্যক্তিগত মনোযোগ সংগীত ও সাহিত্যে তাঁর প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। ভক্তিগীতি ও শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর হাতে-খড়ি হয় স্কুলশিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছে। নজরুলের কবিত্ব উৎসাহিত হয় প্রধানশিক্ষক নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্তৃক। স্কুলের বিদায়ী শিক্ষকদের বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হতো ছাত্র নজরুলের কবিতায়। পরবর্তী কালের বিদ্রোহী কবির বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তোলেন, বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, স্কুলশিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক। আরবী-ফার্সীর ভিত্তি তৈরী পেয়ে নজরুলকে গভীর আগ্রহে ফার্সী পড়িয়েছিলেন এই স্কুলেরই শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবী। হাফিজ সাহেবের এই শিক্ষার ভিত্তিতে নজরুল পরবর্তী পর্বে উচ্চতর ফার্সী শিক্ষাসহ ফার্সী কাব্যসাহিত্য ও গজলের ব্যাপক পাঠ নিতে পেরেছিলেন করাচিস্থ বাঙালি পল্টনের পাঞ্জাবি মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে। এককথায় সিয়ারসোল রাজস্কুলটিকে নজরুলের সকল প্রতিভারই নার্সারি জ্ঞান করা যায়।

সৈনিকজীবনেও-যে নজরুলের শিল্পীজীবনের শিক্ষানবিসি চলছিল তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর সহসৈনিক শম্ভু রায়ের পত্রে। তিনি লেখেন, করাচির সেনানিবাসে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অনেক গ্রন্থই ছিল কাজীর কাছে এবং পড়াশোনার প্রতি ছিল তাঁর সবিশেষ প্রীতি। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্তরে গ্রথিত। এর প্রমাণ যত্রতত্র দ্রষ্টব্য নজরুলের সেনানিবাসে লেখা যাবতীয় রচনায়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। 'ব্যাথার দান' রচনায় নজরুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গান 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' ও 'আমার পরান যাহা চায়' থেকে। কবিগুরুর 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে' গানটি দিয়ে শেষ হয়েছে গল্পটি। 'হেনা' গল্পেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' থেকে উদ্ধৃতি 'এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে', 'বাদল বরিষণে'-তে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গানটি থেকে উদ্ধৃতি, তাঁর 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' গানটি দিয়ে শেষ হয়েছে গল্পটি। 'ঘুমের ঘোর' গল্পে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ওহে সুন্দর, মরি মরি', 'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে', 'ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও'। 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই' ইত্যাদি গানের উদ্ধৃতি। শুধু উদ্ধৃতিই নয় নিজের সংগীতসৃষ্টিও শুরু হয়ে গিয়েছে একই সময়ে। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত 'উদ্বোধন' শীর্ষক গানটিও আসে করাচি থেকেই (বৈশাখ ১৩২৭, সওগাত)। 'বিষের বাঁশি' কাব্যে সংকলিত গানটিতে, আমার মতে ভবিষ্যতের নজরুলের অনেক বৈশিষ্ট্যই দ্রষ্টব্য :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র বিষাণে
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !
... ...
দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ দাও মুক্তি-গরব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

খুন্ দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে ;
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুন দাও গৌরব—
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটা'তে বাঁধন আন আঘাত প্রাণ-আহব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

নিবীর্য এ তেজঃ-সূর্যে
দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্যে,
শৌর্য, ধৈর্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব !
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !
[পৃ. ১০৪, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

একটি গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান ছেলের ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সের প্রবাসজীবনের রচনায় ব্যবহৃত এইসব অত্যাধুনিক বাংলা গানের পাশাপাশি হাফিজ ও রুমীর ক্ল্যাসিক্যাল ফার্সী গজল থেকে উদ্ধৃতি শিল্পী নজরুলের প্রস্তুতি সম্পর্কে যে-ধারণা দেয়, সেটি একজন স্বভাবশিল্পীর জন্য একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর 'নজরুল স্মৃতিকথা'য় জানান যে ১৯২০ সালে রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়ার পর সৈনিক নজরুল যখন করাচি থেকে এসে কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে ওঠেন, তখন তাঁর সঙ্গে সৈনিকের পোশাক ছাড়া ছিল কবিতা ও গানের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা, রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি এবং উর্দু অনুবাদসহ একটি 'দিওয়ানে হাফিজ'। তিনি আরও লেখেন, সেই ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে নজরুলকে প্রথম দিনই গান গাইতে হয়েছিল। তিনি গেয়েছিলেন একটি কাজরী 'পিয়া বিনা মোরা জিয়া না মানে, বদরী ছায়ি রে।' শুধু সুসাহিত্যিক নয়, সুগায়ক হিসেবেও নজরুল খ্যাতি লাভ করেন তাঁর কলকাতা-জীবনের শুরু থেকেই। গানের আসরে আমন্ত্রিত হতেন তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-কেরানীদের মেসে-হস্টেলে, তেমনি সংগীতপ্রিয় অভিজাত হিন্দু পরিবারের অন্দরমহলেও। প্রাগুক্ত স্মৃতিকথায় কমরেড মুজফফর লেখেন, নজরুল তখন গাইতেন প্রধানত রবীন্দ্রসংগীত এবং তা তাঁর এত বেশি কণ্ঠস্থ ছিল যে, তিনি তাঁকে রবীন্দ্রসংগীতের হাফিজ বলতেন। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে নজরুল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যান। কথাপ্রসঙ্গে শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন যে ট্রেন ভ্রমণকালে তাঁকে নজরুল 'গীতাঞ্জলি'র সবকটি গানই গেয়ে শুনিয়েছে। কবিগুরু বিস্মিত হয়ে বললেন, অসম্ভব স্মৃতিশক্তি তো। আমার 'গীতাঞ্জলি'র সবকটা গান আমারই মনে থাকে না। নজরুল গুরুদেবের কণ্ঠে গান আর আবৃত্তি শুনতে চাইলে তিনি তাঁকেই বললেন শোনাতে। নজরুল দ্বিরুক্তি না করে গুরুদেবের 'আগমনী' কবিতাটির আবৃত্তি শুনিয়ে দিলেন। ঘটনাটার বিবরণ লিখেছেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ভাই নিশিকান্ত রায়চৌধুরী 'আমার কৈশোর স্মৃতিতে নজরুল'-শীর্ষক রচনায় *['কথাসাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৭৭]*। সে যাক। তখনকার প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী হরিদাস চট্টপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুল বহু আসরে গান করেছেন। অবশ্য অবাঙালী শ্রোতাদের জন্য তিনি হিন্দুস্থানী গানও করতেন।

৪

কলকাতা-জীবনের প্রথমবর্ষে নজরুল ছিলেন সৌখিন গায়ক ও গীতিকার। সুর করার জন্য গান রচনা বা রচিত গানের সুর করা তখনও শুরু হয়নি তাঁর। তবে সে-পর্বও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অচিরেই এবং সেটা স্বদেশী গানের সূত্রে, যেটাকে তিনি সাম্যবাদী গানে রূপান্তরিত করে গণসংগীতের পথিকৃৎ হবার মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। নজরুল স্বদেশী হাওয়ায় তথা অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বেলিত হন কুমিল্লায়—করাচি থেকে ফেরার বছরখানেক পরে, ১৯২১ সালের জুন-জুলাই মাসে। তিনি তাঁর সদ্যরচিত দেশাত্মবোধক গান গাইলেন মিছিলমুখর কুমিল্লা শহরের রাস্তায় রাস্তায় 'এ কোন্ পাগল ছুটে এল বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়'। এ ছাড়াও সেসময় নজরুল আরও দুটি স্বদেশী গান 'মরণবরণ' (এস এস এস ওগো মরণ) এবং 'বন্দী-বন্দনা' (আজি রক্ত নিশি-ভোরে) রচনা করে কুমিল্লার টাউনহলে কংগ্রেসের সভায় গেয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন, যার অস্তিত্বই ছিল না বাংলার সংগীত-সংস্কৃতিতে এর আগে। একই বছরের নভেম্বর মাসে নজরুল পুনরায় ফিরে আসেন কুমিল্লায়। ২১ নভেম্বরে পালিত দেশব্যাপী হরতালের দিন তিনি মিছিলের পুরোভাগে শহর প্রদক্ষিণ করেন 'জাগরণী' গান গেয়ে—'ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ফিরে চাও ওগো পুরবাসী।'

ডিসেম্বরে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফিরে নজরুল প্রায় একই সময় রচনা করেন স্বাদে গন্ধে বর্ণে ছন্দে বাংলা কবিতা ও গানের ইতিহাসে অদ্যাবধি অনতিক্রান্ত 'বিদ্রোহী' কবিতা (বল বীর—বল উন্নত মম শির!) আর 'ভাঙার গান' (কারার ঐ লৌহ-কবাট ভেঙে ফেল্, কর্ রে লোপাট)। পরের বছর প্রমীলার সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের পরপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে ১৩২৯ সনের বাংলা নববর্ষের উৎসবকালে কুমিল্লাতেই রচিত হয় তাঁর আরেক অনতিক্রমণীয় কবিতা ও গান 'প্রলয়োল্লাস' (তোরা সব জয়ধ্বনি কর!)। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন সঙ্গী নবীন কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্বদেশে সাম্যবাদকে আহ্বান করে রচেন এই গানটি। সেই মহাবিপ্লবের প্রেরণাতেই কলকাতায় ফিরে আগস্ট মাসে নজরুল স্বাধীনতাকামী অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' বের করেন। পত্রিকাটির ১০ অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায় ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হয়। পত্রিকা মারফত এরকম খোলাখুলি দাবি বাংলা থেকে নজরুলই প্রথম উপস্থাপন করেন। এর আগের মাসেই কবি তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে'-শীর্ষক রূপক কবিতাটি মারফত পরাধীনতা নাশনের জন্যে মহিষাসুরমর্দিনীকে আহ্বান করেছিলেন (দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,/ ভূ-ভারত আজ কশাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী!...)। এহেন রাজদ্রোহ মুদ্রণের জন্য ২৩ নভেম্বর কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয় বিপ্লবী কবিকে। ১৯২৩ সালে রাজবন্দী নজরুল হুগলী জেলে রচনা করেন তাঁর অগ্নিঝরানো 'শিকল-পরার গান' (এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।/ এই শিকল প'রেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল ॥)। অসহযোগ আন্দোলনের ফসল এসব স্বদেশী গান সংবলিত 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান'-নামক দুটি গ্রন্থেরই বিজাতীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়া প্রকারান্তরে দেশবাসীর ওপর নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের প্রচণ্ড প্রভাব স্বীকৃত হওয়া।

এই স্বীকৃতি নজরুল জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকেও পেয়েছিলেন অন্যভাবে। যেমন ১৯২৫ সালে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সামনে নজরুল তাঁর জনপ্রিয় 'চরকার গান' স্বকণ্ঠে গেয়ে তাঁদের প্রাণঢালা প্রশংসা পেয়েছিলেন (ঘোর্ ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চরকা ঘোর্)। ১৯২৬ সালের মে মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পটভূমিকায় কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্যে নজরুল রচনা করেন সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী তাঁর অবিস্মরণীয় গান 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!' (দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার / লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!)। সম্মেলনে তিনি নিজে গানটি পরিবেশন করেন দিলীপকুমার রায় ও তাঁর সংগীতসম্প্রদায়ের সহযোগিতায়।

এর আগে মার্চ মাসে মাদারিপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীতরূপে তিনি রচনা করেন 'ধীবরদের গান' (আমরা নিচে প'ড়ে রইব না আর / শোন্ রে ও ভাই জেলে, / এবার উঠব রে সব ঠেলে! / ঐ বিশ্বসভায় উঠল সবাই রে, / ঐ মুটে-মজুর হেলে / এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥)। ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে নজরুল রচনা করেন 'ছাত্রদলের গান' (আমরা শক্তি আমরা বল / আমরা ছাত্রদল / মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান/ ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।/ আমরা ছাত্রদল ॥)। যুব-সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীতরূপে তিনি মার্চের সুরে রচনা করেন 'চল্ চল্ চল্' (ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, / নিম্নে উতলা ধরণী-তল, /

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরুণ প্রাতের তরুণ দল / চল্ রে চল্ রে চল্ / চল্ চল্ চল্ ॥)। 'টলমল টলমল পদভরে', 'অগ্রপথিক হে সেনাদল' প্রভৃতি গানও নতুন ধারার সমরসংগীতের তাল-লয়ে গ্রথিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কবি নজরুল এইসব সম্মেলনের, গায়কদের তো বটেই, উদ্যোক্তাদেরও অন্যতম ছিলেন। এই দিকগুলির কারণেও বাংলার বরেণ্য বাগ্‌গেয়কারদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের স্থান অনন্য এবং অতুলনীয়।

একই সময় নজরুল রচনা করেন তাঁর ('সর্বহারা' গ্রন্থে সংকলিত) সুবিখ্যাত কৃষক-শ্রমিকের গানগুলি। কংগ্রেসের 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র (কিংবা স্বতন্ত্ররূপে নবগঠিত 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে'র) কিষাণ সভার জন্য তিনি রচনা করেন 'কৃষাণের গান' (ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর ক'ষে লাঙল। / আমরা মর্‌তে আছি—ভাল ক'রেই মর্‌ব এবার চল্ ॥) নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীতরূপে নজরুল রচনা করেন 'শ্রমিকের গান' (ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল ! / ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥)। এসব গান সম্মেলনে স্বকণ্ঠে গেয়ে সমবেত জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা ছিল সমাজপরিবর্তন-কর্মী হিসেবে কবির পূর্বিতাপ্রাপ্ত কর্মসূচির অন্তর্গত—যার জন্য তিনি রোগশয্যা থেকেও ছুটে আসতেন জনসভায়। কারণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার চিন্তা ছিল তাঁর একসূত্রে গ্রথিত এবং সৃজনশীল সত্তার পাশাপাশি মননশীল সত্তায় প্রোথিত। শেষোক্ত গান দুটি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ঠাকুরবাড়ির একমাত্র 'বিপ্লবী', আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কমিউনিস্ট নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১–১৯৭৪) তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থে লিখেছেন : 'বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গান ছিল না এর আগে, নজরুলই তার পথকার।' (মহর্ষির আরেক প্রপৌত্র সুভগেন্দ্রনাথ ওরফে সুভো ঠাকুর (১৯১২–৮৫) ছিলেন বাড়িটির একমাত্র 'বিদ্রোহী' যিনি লিখেছিলেন, 'পোয়েট ট্যাগোর হন কে তোমার, জোড়াসাঁকোতেই থাক? / বাবার খুড়ো যে হন শুনিয়াছি, মোর কেহ হয় নাকো ?)

গণসংগীতের এই পথিকৃৎ ১৩৩৪ সালের একই তারিখে, পয়লা বৈশাখে, একের পর এক রচনা করেন 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত' (জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত/ জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত !), 'জাগর-তূর্য' (ও রে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী! / অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥), 'রক্ত-পতাকার গান' (ওড়াও ওড়াও লাল নিশান! / দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা/ ভরিয়া বাতাস জুড়িয়া বিমান! / ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥)। সামাজিক অন্যায়বিচারের জগদ্দল পাথর ভেঙে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে নজরুল এর আগে ১৩৩১ সালে ব্যান্ডের সুরে রচনা করেন 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল। / মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল ॥'। পরে ১৩৩৭ সালে রচনা করেন নারী-জাগরণী গান 'জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা। জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা ॥'। কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত ও বহুল উদ্ধৃত সাম্যবাদী কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'সাম্যবাদী' গ্রন্থে (যেমন সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, নারী, রাজা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজা, সাম্য ও কুলি-মজুর)।

লক্ষণীয় যে নজরুল ছিলেন, যাকে বলে, প্র্যাক্সিসের মানুষ—মানে নিতান্ত ভার্বালিস্ট কিংবা নিতান্ত অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন না, তিনি ছিলেন অ্যাক্টিভিস্ট-কাম-ভার্বালিস্ট। এজন্যে তাঁর সৃজনে এমন একক এক অথেন্টিসিটি বর্তাতো যা আর কারও রচনায় প্রত্যাশিতও ছিল না। নজরুল সংগ্রামী গান রচনা করতেন পরাধীনতার বিরুদ্ধে মাঠে-বাটে সংগ্রাম করতে করতে (যেমন করতেন আর কেবল মুকুন্দ দাস, তবে তাঁর স্বর নজরুলের কণ্ঠের সঙ্গে তুলনীয় ছিল না), ঘরের কোণে বসে কলম পিষতে পিষতে নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নজরুলের উদ্দীপনামূলক-দেশাত্মবোধক গানগুলিকে উচ্চতম মান এবং স্থায়ী মূল্য দান করেছে। তাঁর সভায়-মিছিলে অংশগ্রহণ এবং কারাবরণ ও অনশন পালন—সবই ছিল দেশবন্দনামূলক মহান সৃজনকর্মের সক্রিয় প্রস্তুতিস্বরূপ। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল-তনয় দিলীপকুমার রায়ের বয়ানে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৫ সালের দোসরা মে নেতাজী মান্দালয় থেকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—'We do not perhaps realise the magnitude of the debt owed by Kazi Nazrul Islam's verse to the living experience he had of jails' *[ড. করুণাময় গোস্বামী, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, পৃ. ১৩১]*। ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে আয়োজিত নজরুল-সংবর্ধনা সভাতেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন :

> 'তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হয়েছে। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না। নজরুলকে বিদ্রোহী বলা হয়—এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান পাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াই, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সংগীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির।' *[প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২]*

সংবর্ধন-সভাটির সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই, তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।' উপসংহারে আচার্য রায় আরো বলেন, 'আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করিব। নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতিমানুষে পরিণত হইবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে দেশাত্মবোধক গান রচনার এই কালটি ছিল নজরুলের গভীরভাবে সংগীতজগতে প্রবেশ করার পূর্বকাল। এ-পর্বের গানগুলির সুর ছিল সহজসরল ও উদ্দীপনাময়, বাণীও ছিল সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকারের—যে-সমূলবদলের সংগ্রামী সৈনিকরূপে তিনি তখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সত্যিকার অর্থে সংগীতক্ষেত্রে অবতরণ তাঁর এর পরে—১৯২৬ সাল থেকে, যার শুরু গজলপর্ব দিয়ে। ১৯২৬–২৮-এর কৃষ্ণনগরের জীবনে নজরুল শোষণমুক্তি ও সাম্যপ্রতিষ্ঠা-অভিলাষী নতুন ধারার সাম্যবাদী গান রচনার সমসময়েই শুরু করেন নতুন ছন্দের নতুন বর্ণের নতুন স্বাদের নতুন আবেগের প্রেমের গান রচনা। গজল-নামে অভিষিক্ত রক্তমাংসের এই নতুন প্রেমের বন্যা চোখের পলকে প্লাবিত করে দিল প্রেমের গানের ক্ষমতাসীন মহারাজ রবীন্দ্রনাথের রাজধানী শহরকলকাতাকেই।

লখ্‌নৌ প্রবাসী উর্দু-দাঁ অতুলপ্রসাদ সেন নজরুলের আগে কয়েকটি গজল রচনা করেছিলেন (যেমন 'কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে / এ পোড়া পরান তরে এত ভালবাসিলে', 'রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা / রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা')। দু একটি গজল তাঁর ভালোও হয়েছে (যেমন 'বলো গো সজনী, কেমনে ভুলিব তোমায় ? / যতন যাতনা বাড়ায়', 'কত গান তো হল গাওয়া / আর মিছে কেন গাওয়াও ? / যদি দেখা নাহি দিবে / তবে মিছে কেন চাওয়াও ?' তবে তাঁর শ্রেষ্ঠতম গজল 'জল বলে চল মোর সাথে ওলো / কখনো তোর আঁখিজল হবে না বিফল' এখানে উল্লেখ্য নয় যেহেতু এটির সৃষ্টি নজরুলের 'এত জল ও-কাজল-চোখে পাষাণী আন্‌লে বল কে। / টলমল জল্-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পালকে'-গজলটির প্রেরণায় (বলেছেন দিলীপকুমার রায়)। এখানে বিশেষভাবে বলার কথাটি হল অতুলপ্রসাদ গজলের তরঙ্গই সৃষ্টি করতে পারেননি, ধারা রচনা করা তো পরের কথা।

নজরুল শুধু ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৫ সালের মধ্যেই অতুলের মোট গজলের চেয়ে অনেক বেশি গজল সৃষ্টি করে গজলের জলোচ্ছ্বাস বইয়ে দিয়েছেন বাংলা গানের জগতে। ১৩৩৩ সালে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' দিয়ে শুরু করে তিনি একের পর এক লিখে গিয়েছেন 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়', 'দুরন্ত বায়ু বহে পুরবঁইয়া', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে', 'করুণ কেন অরুণ আঁখি', 'এত জল ও কাজল চোখে', 'কেন কাঁদে পরাণ', 'চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না', 'কে বিদেশী বন-উদাসী', 'নিশি ভোর হল জাগিয়া পরান পিয়া' ইত্যাদি একসে-এক মনোহরণ গজল। ১৩৩৫ সালেও সমানে চলল তাঁর গজলবর্ষণ। যেমন 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে', 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জল', 'কেন আন ফুল-ডোর আজি বিদায়-বেলা', 'কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া' ইত্যাদি। এসব গজল প্রকাশিত হত প্রায়শ স্বরলিপিসহ (যার বেশ কিছু কবিকৃতও) শীর্ষস্থানীয় সকল পত্রিকায় (যেমন কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বঙ্গবাণী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নওরোজ, সওগাতে)।

নজরুলের গজল-সংকলনরূপে বিখ্যাত 'বুলবুল' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে [পরপর প্রকাশিত 'চোখের চাতক'ও গজল-খ্যাত]। তবে এ-সময় তাঁর গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার ফলে রকমারি গানের চাহিদা গজলকে পেছনে ঠেলে দেয়। তবু এরই মধ্যে নজরুল গজলকে বাংলাগানের আসরে সম্মানিত একটি স্থায়ী আসন অর্জন করে দিতে পেরেছেন। পেরেছেন এ কারণে যে এর প্রস্তুতি তাঁর সম্পূর্ণ হয়েছিল অনেক আগেই, করাচি-বাসকালে—ফার্সি কাব্যপাঠ, বিশেষত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গজলিয়া পারশ্যের হাফিজের গজল পাঠ ও আবৃত্তি শোনা ও শেখার মাধ্যমে (সে-আবৃত্তি বাংলা কবিতা আবৃত্তির মতো নয়, সুরেলা আবৃত্তি—যাকে তাঁরা বলেন 'তারান্নুম'-যুক্ত পাঠ)। গজলের পথ বেয়েই নজরুল সংগীতের উপত্যকায় পৌছান। পৌছেই গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান তাঁর সাহিত্যরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁকে সংগীতনগরের নাগরিক করেই রেখে দেয়। সেখানেই নজরুল বহু সংগীতগুণীর সৃজনশীল সান্নিধ্য এবং তৎপ্রসূত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের মওকা পান। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ঠুংরীর ভাণ্ডারী জমিরুদ্দীন খাঁ, ঠুংরী-মুখড়ার খনি মঞ্জু সাহেব, মাস্তান গামা, ওস্তাদ কাদের বখশ, দবীর খাঁ, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ। সংগীতে পরিপক্ক করার মানসে নজরুল রাগসংগীতের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাসেও যেতেন—যেমন খলিফা বদল খাঁ বা আফতাবে মওসিকী ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সকাশে। তবে এঁদের জোগানের পরিমাণ তেমন বেশি ছিল না। বেশি ছিল, ঠুংরীসম্রাট মৌজুদ্দীনের মতো, নজরুলের বিধিদত্ত প্রতিভাপুষ্ট স্বশিক্ষা। সেজন্য কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলার সংগীতজগতের শ্রেষ্ঠতম 'আতায়ী' উস্তাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

AMARBOI.COM

৬

বস্তুতপক্ষে নজরুলের রাগসংগীতপ্রীতি জন্মগত বলেই সেই সংগীতে কৃতি তাঁর বিধিদত্ত। তাঁর প্রকাশিত প্রথম গানটিও ছিল বসন্ত-সোহিনী রাগে ও দাদরা তালে রচিত (বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও)। সম্ভবত তাই রাগসংগীতের ভুবনে এ-আগন্তুকের কাছে বাংলা গান যা পেয়েছে—রাগসংগীতের ঐতিহ্যে লালিত বাকি চার প্রধানের কাছে সম্মিলিতভাবেও তা পায়নি। স্মর্তব্য যে নজরুল ছাড়া সকলেই জন্মেছিলেন ঐতিহ্যবাহী সংগীতচর্চাকারী পরিবারে। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়ি ছিল অন্যতম দেশখ্যাত সংগীতকেন্দ্র, যেখানে বিখ্যাত শাস্ত্রীয় কলাবতগণ থাকতেন এবং পরিবারের নতুন প্রজন্মকে তাদের শিশুকাল থেকেই গান শেখাতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুনাথ ভট্টাচার্য, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মতো স্বনামধন্য ধ্রুপদিয়াদের আবাল্য সান্নিধ্যে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সংগীতসত্তা। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতজীবনের গোড়াপত্তন হয় খেয়ালিয়া ও গীতিরচয়িতা পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের তালিমে। অতুলপ্রসাদ সেন গায়ক পিতার মৃত্যুর পর প্রতিপালিত হন গায়ক ও গীতিরচয়িতা মাতামহের আশ্রয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মজীবনের সূত্রে লখনৌ শহরে সুর ও বাণীর আবহাওয়াতেই ছিল তাঁর বসবাস। তাই আজীবন সংগীত রচনা করেন তিনি শাস্ত্রীয়সংগীতের স্বভূমিতে, রাগসংগীতিক পরিবেশে বসে। পাবনার সংগীতজ্ঞ কবির পুত্র রজনীকান্ত সেনের শৈশব-কৈশোরও সংগীতসমৃদ্ধ এবং আইনজীবী হিসেবে রাজশাহীর জীবনও ছিল তাঁর উচ্চমানের সাংগীতিক পরিমণ্ডলে। প্রতিপক্ষে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামই জন্মেছিলেন দরিদ্রগৃহে এবং শিশুশ্রমিকের জীবনটিও কেটেছে তাঁর কঠোর সংগ্রামে আর কঠিন সঙ্কটে। অথচ ঐতিহ্য ব্যতিরেকেই এই স্বভাবশিল্পী সৃষ্টি করে গেছেন বাংলার সংগীতজগতে রাগসংগীতের কালজয়ী ধারাটি।

বাণীর বিচারে যে-শ্রেণিতেই জমা পড়ুক, সুরের বিন্যাসে রাগসাংগীতিক চারিত্র্য নজরুলের, কেবল গজলকেই নয়, সকল শ্রেণীর গানকেই শনাক্তযোগ্য পরিমাণে 'নজরুলিয়া'রূপ দিয়েছে। তবে এক কথায় বলতে গেলে 'রাগপ্রধান গান'-নামক বিশেষ শ্রেণীটিই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাগসাংগীতিক অবদান। এই গান হিন্দুস্থানী সংগীতরীতির প্রতিকৃতি-প্রতিধ্বনি নয়—এ এক রাগাশ্রয়ী সংগীতরীতিই বটে, তবে খাঁটি বাঙালী। এ-গানকে 'মৌলবাদী'ও বলা যায় এ-অর্থে যে এতে থাকে কেবল মৌলিক রাগরূপ-রাগভাবসহ রাগাঙ্গীণ অলঙ্কৃতি—থাকে না সুরপ্রস্তারের বহুলতা, নানান ফাঁদের তানকর্তবের কৃত্রিমতা, দুরূহতার কার্দানি, জটিলতার প্রদর্শনী প্রভৃতি। সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার এই সংগীত-সংরূপটির জন্ম হয় বিগত ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে, স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম এবং নামদাতা তাঁর সহযোগী কৃতীসংগীততাত্ত্বিক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

৭

ভক্তিসংগীতের দুটি ধারাতে নজরুলের কৃতি তুলনারহিত—হিন্দুধর্মসংগীতের আবহমান ধারা আর মুসলিমধর্মসংগীতের নতুন ধারা। হিন্দু ভক্তিসংগীতে তাঁর রচনার অসংখ্যতা ও বিষয়ের অজস্রতা এককথায় বিহ্বলকর। ঈশ্বরবন্দনামূলক গান যেমন—অন্তরে তুমি আছ চিরদিন, খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে, বিশ্বব্যাপিয়া আছ তুমি জেনে, মন বলে তুমি আছ ভগবান, যুগ যুগ ধরি লোকে লোকে প্রভৃতি। শ্যামাসংগীত যেমন—শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা, মহাকালের কোলে এসে, শ্মশানকালীর রূপ দেখে যা, আমার মা আছে রে সকল নামে, ওমা বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ, কে তোরে কি বলেছে মা, বল রে জবা বল, সংসারেরই দোলনাতে মা প্রভৃতি। দুর্গাসংগীত যেমন—জয় দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, এস আনন্দিতা ত্রিলোকবন্দিতা, মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রীদুর্গা, ভবাণী শিবাণী দশপ্রহরণধারিণী, কে জানে মা তব মায়া মহামায়া রূপিণী ইত্যাদি। আগমনী গান বা উমাসংগীত যেমন—ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, আমার উমা কই গিরিরাজ, তুই পাষাণগিরির মেয়ে হলি, বর্ষা গেল আশ্বিন এল উমা এল কই, মা হবি না মেয়ে হবি দে মা উমা বলে, কে সাজালে আমার মাকে বিসর্জনের বিদায় সাজে, ইত্যাদি। শিবসংগীত যেমন—গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু, সৃজনছন্দে আনন্দে, জাগো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরুণ ভৈরব, প্রভৃতি। কৃষ্ণসংগীত যেমন (নারায়ণরূপী কৃষ্ণ) জাগো শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, হে প্রবল প্রতাপ দর্পহারী, তিমিরবিদারী অলখবিহারী কৃষ্ণমুরারী আগত ঐ, প্রভৃতি। (গোপীবল্লভরূপী কৃষ্ণ) একি অপরূপ রূপের কুমার, আমি কেন হেরিলাম নবঘনশ্যাম, সখি যায়নি তো শ্যাম মথুরায়, ব্রজগোপী খেলে হোরী, ইত্যাদি। ব্রজলীলা যেমন (কীর্তন) মুরালীধ্বনি শুনি ব্রজনারী, রাখ রাখ রাঙা পায় হে শ্যমরায়, শ্যামসুন্দর গিরিধারী, দোলে বনতমালের ঝুলনাতে কিশোরী কিশোর, সখি আমিই না হয় মান করেছিনু, মন মোর ছুটে যায় দ্বাপর যুগে প্রভৃতি। (ভজন) চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়, প্রভু রাখ এ মিনতি, তোমার আমার এই বিরহ সইব কত আর, হে চিরসুন্দর বিশ্বচরাচর, হে মহামৌনী তব প্রশান্ত গম্ভীর বাণী শোনাবে কবে প্রভৃতি।

হিন্দুধর্মসংগীত বিভাগে নজরুলের গানে রচনার পরিমাণগত বিপুলতা, বিষয়বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা ও সুরৈশ্বর্যের উৎকৃষ্টতা তথা কাব্যসংগীতের সামগ্রিক উৎকর্ষের মাধ্যমে আবহমান বাংলার হিন্দুপ্রভাব পুনরুজ্জীবিত এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে শীর্ষস্পর্শী ব্রাহ্মপ্রভাব তিরোহিত হয়েছে। এর একটা সাধারণ প্রমাণ এই যে বাংলা ভাষায় জনপ্রিয়তম দুর্গাসংগীতটি নজরুলসংগীত যথা 'কে জানে মা তব মায়া মহামায়ারূপিণী'। আরেকটা বিশেষ প্রমাণ এই যে গাজন-গম্ভীরা ইত্যাদি লোকসংগীতের উপজীব্য শিবের গীতকে ধ্রুপদ-খেয়াল অঙ্গপ্রধান কাব্যসংগীতে উন্নীত করেছেন কাজী নজরুল ইসলামই এবং বাংলার স্বল্পসংখ্যক শিবসংগীতের শ্রেষ্ঠতমটিও তাঁরই, যথা—গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু। শ্যামাসংগীতে নজরুলের অবদান সম্পর্কে ডক্টর করুণাময় গোস্বামী লেখেন, 'বলতে কি শ্যামাসংগীত রচয়িতারূপে রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সাংগীতিক নান্দনিকতায় যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, নজরুল তদপেক্ষা উচ্চস্তরে পৌছেছিলেন। কেননা, কবি ও সুরস্রষ্টারূপে তিনি পূর্ববর্তী সংগীতরচয়িতাদের চেয়ে মহৎ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে পরিচয় তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে রেখেছেন তাঁর গানে।' *[পৃ. ২৫৩, নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী ১৯৯৬]*। তিনি আরও বলেন, 'হিন্দুধর্মসংগীত পর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের রচনা একদিকে যেমন বিপুল অপরদিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা এমনি বিস্ময়কর যে স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অপর কোন বাঙালি কবির রচনাকর্মে হিন্দুধর্ম-সম্পৃক্ত বিষয়ের এমন বহুমুখী রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করা যায়নি। বর্তমান শতকের ত্রিশের দশকের পরবর্তীকালে গেয় জনপ্রিয় হিন্দুধর্ম সংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই নজরুলের রচনা।' *[প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩]*। এই বৈপুল্যের উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে হরফ প্রকাশনীর অখণ্ড নজরুলগীতির ষষ্ঠ সংস্করণে এই শ্রেণীতে সংকলিত ৫৪২টি গানের সঙ্গে আরও অনেক গানই যুক্ত হচ্ছে নানাসূত্রে নিত্যপ্রাপ্ত নজরুলগীতির অশেষ ভাণ্ডার থেকে। আর বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে নজরুলের বেশুমার ভক্তিগীতিতে বন্দিত হয়েছেন কেবল শক্তিদেবী কালী নয়, বরং নানা রূপের নানা কালী—শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, নিত্যকালী, মহাকালী। তেমনি দুর্গাও গীত হয়েছেন চণ্ডী, কৌষিকী, শাকম্ভরী, সতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি রূপে। শাক্ত ও বৈষ্ণবীয় দেবীকাহিনীর হেন অনুষঙ্গ নেই যা নজরুলের গানে আসেনি। পৌরাণিক বিষয়াবলীর এমন জম্পেশ সমাবেশ অন্য কোনো সংগীতকারের রচনায় ঘটেনি।

৮

নজরুল-প্রবর্তিত ইসলামী গানের ধারাটিকে এখানে আমি বলব মুসলিমধর্মসংগীত যেহেতু এটি হিন্দুধর্মসংগীতের পরিপূরকরূপে বাংলার ভক্তিগীতির ধারাটিকে অভূতপূর্ব এক পরিপূর্ণতা দান করেছে। দুই শতের মতো গান দিয়ে মাত্র কয়েক বছরে তিনি বাংলা শীলিত সংগীতের ঐতিহ্যে ইসলামী ভক্তিসংগীতের ধারাটি সংযোজন করেন। সুদীর্ঘ কালের পরম্পরাগত চর্চার ফলে ভক্তিসংগীতের অন্যান্য শাখা যথা ব্রহ্মসংগীত, শ্যামাসংগীত, উমাসংগীত প্রভৃতি যে-উচ্চতায় উঠেছে—ইসলামী গানকে লোকসংগীতের পর্যায় থেকে রাগসংগীতের লেবাস পরিয়ে নজরুল এক হাতেই সেখানে উন্নীত করে দিয়ে ইসলামের নতুন এক সাংগীতিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। লোকসংগীত প্রভাবিত ইসলামী গানের উদাহরণ হচ্ছে—ওরে ও দরিয়ার মাঝি, পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া, এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি প্রভৃতি। রাগসংগীতের সুররঞ্জিত ইসলামী গানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—মোহররমের চাঁদ এল ঐ, ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে, সাহারাতে ফুটল রে ফুল, খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে, বক্ষে আমার কাবার ছবি, যাবি কে মদীনায়, ইসলামের ঐ সওদা লয়ে প্রভৃতি। আল্লা-রসুলের প্রশস্তি, ধর্মীয় বিধান, ইসলামের ইতিহাস, এবাদত, বন্দেগী, মাযার, মসজিদ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় অবলম্বন করে নজরুলের মুসলিমধর্মসংগীতমালা গ্রথিত। হামদ বা আল্লার জয়গানের উদাহরণ—তুমি অনেক দিলে খোদা দিলে অশেষ নিয়ামত, তুমি আশা পুরাও খোদা সবাই যখন নিরাশ করে, তোমারি মহিমা সব বিশ্বপালক করতার, রোজ হাশরে আল্লা আমার করো না বিচার ইত্যাদি। এর মধ্যে মোনাজাতরূপে উল্লেখিত গানগুলির সুরবাণীর আবেদন সর্বজনীন এবং সর্বকালীন, যেমন 'খোদা এই গরীবের শোনো শোনো মোনাজাত', 'শোনো শোনো ইয়া ইলাহী আমারি মোনাজাত' ইত্যাদি। আবির্ভাব ও তিরোভাবসহ নবীমহিমা-বিষয়ক নাত-শ্রেণীর সংগীতে ইসলামী গানের শীর্ষে আরোহণ করে নজরুল তাঁর সাংগীতিক উচ্চতার প্রতিনিধিত্বকারী ইসলামী গান উপহার দেন যেমন—মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ, এ কোন মধুর শরাব দিলে ইত্যাদি। রমজান এবং ঈদ ছাড়াও নজরুল অবিস্মরণীয় যত গান রচনা করেন কাবা ও হজ্ব বিষয়ে যেমন দুখের সাহারা পার হয়ে আমি চলেছি কাবার পানে, পূবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া প্রভৃতি। মসজিদ-আজান-নামাজ বিষয়ে যেমন—বাজল কি রে ভোরের শানাই, মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই, হে নামাজী আমার ঘরে নামাজ পড় আজ, আঁধার মনের মিনারে মোর হে মুয়াজ্জিন দাও আজান প্রভৃতি। মোহররম বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন—মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়, ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়, ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে প্রভৃতি। ফাতেমা, আরব, মক্কা, মদীনা বিষয়ে যেমন—খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী বিশ্বদুলালী নবীনন্দিনী, দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে, সুদূর মক্কা মদীনার পথে আমি রাহি মুসাফির, ভেসে যায় হৃদয় আমার মদীনা পানে ইত্যাদি। মোট কথা বাংলা কাব্যসংগীতের দীর্ঘকালের লালিত ধারায় রাতারাতি একই মানের ইসলামী গানের যোজনা কাজী নজরুল ইসলামের এক অবিশ্বাস্য কীর্তি। তার ওপর রেকর্ড রিলিজমাত্রই এ-গানের বিস্ফোরক জনাদৃতির সূত্রে বিস্ময়কর বিপণন সাফল্য এক অকল্পনীয় ইতিহাসেরই সৃষ্টি করেছে।

নজরুলের নতুন সুরের এই মধুর সুরধুনী, ধর্ম কর্তৃক নিরুৎসাহিত, মুসলমানদের এতোই সংগীতমনস্ক করে তোলে যে মুসলিমপ্রধান অবিভক্ত বঙ্গদেশে ইসলামী গানই হয়ে ওঠে রেকর্ড কোম্পানির বেস্টসেলার সিরিজ। ফলে নজরুলসৃষ্ট এই নবধারার গান রেকর্ড করার জন্য এতো শিল্পীর প্রয়োজন পড়ে যে বহু হিন্দু গায়ক-গায়িকাকে মুসলিম নাম ধারণ করতে হয় রেকর্ডের লেবেলে (খদ্দেরের রুচিসম্মত হওয়ার জন্য যেমন—মহম্মদ কাসেম মল্লিককে হতে হয়েছিল কে. মল্লিক এবং শঙ্কর মিশ্র)। এই প্রক্রিয়ায় রেকর্ডের লেবেলে ধীরেন দাস হয়ে যান 'গনি মিঞা' (তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা করো হজরত, তোমারি প্রকাশ মহান এ নিখিল দুনিয়া জাহান, ঈদের খুশির তুফানে আজ ভাসলো দো-জাহান, মেষ চারণে যায় নবী কিশোর রাখাল বেশে, মারহাবা সৈয়দ মক্কী মদনী আল-আরবী, ফুরিয়ে এলো রমজানের এই মোবারক মাস, এসেছি তব দ্বারে ভক্তিশূন্য প্রাণে)। ঊষারাণী হয়ে যান 'রওশন আরা বেগম' (আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত, নতুন চাঁদের তকবীর শোন কয় ডেকে ঐ মুয়াজ্জিন, হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে তুমি শুনিতে কি পাও, হে প্রিয় নবী রসূল আমার, তোমারি নূরের রওশনী মাখা নিখিল ভুবন, নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান)। সীতা দেবী হয়ে যান 'দুলি বিবি' (আমি বাণিজ্যেতে যাব এবার মদীনা শহর, ওগো মুরশীদ পীর বলো রসুল কোথায় থাকে)। হরিমতী দেবী হয়ে যান 'সাকিনা বেগম' (আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ, কেন তুমি কাঁদাও মোরে হে মদিনাওয়ালা, এলো এলো শবে বরাত তোরা জ্বাল রে বাতি, ভক্তিভরে পড় রে তোরা কলমা শাহাদাত, চীন আরব হিন্দুস্থান নিখিল ধরাধাম, নামাজ-রোজা হজ্জ-জাকাতের পসারিনী আমি, প্রিয় মোহ্‌রে নবুয়তধারী হে হজরত তরিতে উম্মতে এলে ধরায়, মসজিদে ঐ শোন রে আজান,)। গিরীণ চক্রবর্ত্তী হয়ে যান 'সোনা মিয়া' (ঈমান বাইন্ধা রাখ রে, মন রে মায়া জগতের মূল মায়া)। গিরীণবাবুই আবার আরেক গানের জন্য হয়ে যান গোলাম হায়দার এন্ড পার্টি (আল্লার নাম জপিও ভাই, ইয়া আল্লা তুমি রক্ষা কর)। তিনিই আরেক গানের জন্য হন সুজন মাঝি (আকাশের আর্শীতে ভাই পইরাছে মোর মনের ছায়া)। চিত্ত রায়কে হতে হয়েছে দেলওয়ার হোসেন (ক্ষমাসুন্দর আল্লা, মোদের ভয় দেখিও না আর, আল্লা রসূল তরু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ফুল প্রেমিক হৃদয় জানে)। এক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশি বিড়ম্বিত হতে হয় মহম্মদ কাসেমকে। তাঁকে 'কেন কাঁদে পরাণ', 'কেন দিলে এ কাঁটা' ইত্যাদি রেকর্ডের লেবেলে প্রথমে হতে হয়েছিল কে. মল্লিক, পরে আরেক রেকর্ডের জন্য হতে হয়েছিল শঙ্কর মিশ্র (অম্বরে মেঘে মৃদঙ্গ বাজে জলদ তালে, দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মেলা, ও কে মুঠি মুঠি আবির কাননে ছড়ায়)। এই কাসেম ওরফে শঙ্কর-মল্লিকবাবুকেই ইসলামী গানের লেবেলের জন্য হতে হয়েছিল 'মনু মিয়া' (ও রে ও মদীনা বলতে পারিস কোন সে পথে তোর, দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলাদেশের কুটির হতে, আমিনা দুলাল নাচে হালিমার কোলে, তোমার নামের এ কি নেশা হে প্রিয় হজরত)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইসলামী গান গাননি বলে তালাত মাহমুদ কেবল তপনকুমার নামেই নজরুলগীতি গেয়েছেন (আসলো যখন ফুলের ফাগুন, নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণ পিয়া)।

৯

১৯৩৩ থেকে শুরু হয় নজরুলের আধুনিক ও লোকসংগীত ধারার সংগীতসৃষ্টির পর্ব। বিগত শতকের ত্রিশের দশকে প্রবর্তিত আধুনিক বাংলা গানের যে-মেলডি কিংবা সুর-লহরী আজকের প্রজন্মকেও মাতায় বলে হালের গানের বাজারটি 'রিমেকিঙে'র বাজার হয়ে দাঁড়ায়—সুরমূর্ছনা প্লাস শব্দগ্রন্থনার সে-মাত্রাটির প্রতিষ্ঠাতা কাজী নজরুল ইসলাম। জনসাধারণের মনমাতানো সুর ও শব্দের এই সহজ সরল সাংগীতিক বিন্যাসটি তিনি সৃষ্টি করেন প্রধানত গ্রামোফোন-বেতার ও সবাক সিনেমার ত্রিমুখী চাহিদার দ্রুতবর্ধিষ্ণু তাগিদে। বাংলা গানের ভক্তদের চাহিদা কিংবা বাজারের ব্যাপারটি ১৯০৪ সালে এদেশে আসা গ্রামোফোন কোম্পানির নতুন সংযোজন। ১৯২৭ সালে যুক্ত হওয়া বেতারবাহিত গণসম্প্রচার মাধ্যমের দিবারাত্রির ক্ষুধা এবং ১৯৩১ সালে সবাক হওয়া চলচ্চিত্র মারফত বর্ধিত সংগীততৃষ্ণা নিবারণের কারণেও বহুগুণ বেড়েছে এই চাহিদা। এই তিনটি নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলার মহৎ সংগীতকারদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন কেবল নজরুলই।

(এ-কারণেই কি বাংলা গানের অন্যান্য শাখার বিখ্যাত শিল্পীদের রেকর্ডেও আমরা নজরুলগীতি শুনতে পাই ? যেমন সাহানা দেবীর কণ্ঠে মেগাফোন রেকর্ডে এলো ফুলের মহলে ভোমরা গুনগুনিয়ে, নাচে সুনীল দরিয়া আজি দিল-দরিয়া পূর্ণিমা চাঁদ পেয়ে। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কলম্বিয়ার রেকর্ডে চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়, কোথা তুই খুঁজিস ভগবান, মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর, আমি দ্বার খুলে আর রাখবো না পালিয়ে যাবো গো। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কলম্বিয়ার রেকর্ডে না মিটিতে মনোসাধ যেয়ো না হে শ্যামচাঁদ, বৃথা প্রবোধ দিস নে ললিতে। পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে কলম্বিয়ার রেকর্ডে আর লুকাবি কোথায় মা কালী, আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়। তালাত মাহমুদের কণ্ঠে এচএমভি'র রেকর্ডে নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণ পিয়া, আসলো যখন ফুলের ফাগুন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এচএমভি'র রেকর্ডে হে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধাতা দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে প্রভৃতি।)

কেবল নজরুলের গান গেয়েই খ্যাতি কুড়াচ্ছিলেন বলে তখনকার শ্রেষ্ঠ গায়কগায়িকাগণ নতুন নতুন গানের জন্য দিবারাত্র কেবল তাঁকেই ঘিরে থাকতেন। কারণ, পঞ্চপ্রধান সংগীতস্রষ্টার মধ্যে একমাত্র সমাজ ও জীবনঘনিষ্ঠ কাজী নজরুলই মানুষের কাছে যেতেন, মানুষের সঙ্গে মিশতেন, মানুষের মধ্যে থাকতেন, পরাধীনতাবিরোধী মানুষের মিছিলে ও জনসভায় নিজের লেখা গান গাইতেন এবং এইসব সূত্রে প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় যুগমানসকে জানতেন—জানতেন যুগের শ্রোতৃচিত্ত কী শুনতে চায়। আসল কথা, নজরুল গান লিখতেন পরের তরে এবং সেজন্যেই ছিলেন বহির্মুখী (তুলনায় রবীন্দ্রনাথ লিখতেন নিজের জন্য এবং এজন্যই ছিলেন অন্তর্মুখী)। নজরুলের প্রেমের গান রক্তমাংসের মানব-মানবীর এবং সে-কারণেই উদ্বেলিত আবেগপূর্ণ (তুলনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে নারীপ্রেম-প্রকৃতিপ্রেম-ঈশ্বরপ্রেম একাকার বলেই সেখানে আবেগ সমাহিত)।

উদ্ভূত পরিস্থিতির এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিশের দশককে তার প্রয়োজনীয় গানের জন্য একমাত্র নজরুলেরই দ্বারস্থ হতে হত। এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইতিহাস সৃষ্টিকারী দশকটির সংগীতক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামই একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন—যখন কিনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছয় দশকের সংগীতসৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম পর্বে সৃজনশীলতার শীর্ষে অবস্থান করছেন। বস্তুত রীবন্দ্রনাথের গানও জনগণের অঙ্গনে পৌছেছে নজরুলের গানের মোটা পালের হাওয়ার জোরে। (গুরুদেবের পাতলা পালের হাওয়া তাঁকে শান্তি নিকেতন এবং ঠাকুরবাড়ির আঙিনা থেকে বের করে বেশি দূর আনতে পারেনি—অন্য ভাষায় কথাটা বুদ্ধদেব বসু ঠিকই বলেছেন। কারণ রবিবাবুর গান প্রধানত মানসিক, তার আত্মপ্রকাশ মুখ্যত বুদ্ধিজৈবিক। প্রতিপক্ষে নজরুলের গান হার্দিক এবং তার স্বপ্রকাশ হৃদয়বৃত্তিক)। সারকথা, ত্রিশের দশকের সূচনায় সৃষ্ট সবিশেষ সাংগীতিক পরিস্থিতির নিজস্ব উত্তাপে গ্রামোফোন কোম্পানির সদ্য নিয়োজিত গীতিকার-সুরকার-প্রশিক্ষক কাজী নজরুল শব্দ ও সুরের যে-সুরমূর্ছনা বা সুতান সৃষ্টি করলেন তার নাম নিজেই কোথাও লিখলেন 'মডার্ণ' কোথাও লিখলেন 'আধুনিক' (আমার জানামতে পঞ্চপ্রধানের আর কেউ তাঁদের কোনো শ্রেণীর গানকে এই অভিধায় অভিহিত করেননি)। এই শিরোনামের মাধ্যমে নজরুল যেন বোঝাতে চাইলেন, এ-গান কোনো নির্দিষ্ট সুর-শব্দ কিংবা রূপবন্ধের কাছে দায়বদ্ধ নয়, এ-গান সাংগীতিক বিন্যাসে মুক্ত রীতির, এ-গান জনচিত্ত অভিমুখী, এ-গানের উৎসার হৃদয় থেকে অভিসারও হৃদয়ের দিকে। সংগীতরচয়িতা হিসাবে বস্তুত এই সমস্ত গুণই নজরুলের বৈশিষ্ট্য।

গানে তিনি সর্বদা উপস্থিত শ্রোতাকেই সম্বোধন করেন। জনচিত্তমুখিতাই নজরুলসৃষ্ট নব্যআধুনিকতার মূলকথা। সংগীতে এতকালের অন্তর্মুখিতার বদলে নজরুল-আনীত বহির্মুখিতা তাঁর গানের তাৎক্ষণিক জনাদৃতি এবং শ্রোতৃসমাজের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত সাড়া পাওয়ার একটা বড়ো কারণ। তাৎক্ষণিক সে-জনাদৃতি কালজয়ী হয়ে সমানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যমান আছে অদ্যাবধি। নজরুল-প্রবর্তিত সেই আধুনিক বাংলা গান তাই আজ বোদ্ধা মহলে 'ধ্রুপদী আধুনিক' বলে অভিহিত। হরফ প্রকাশনীর অখণ্ড নজরুল গীতি'র ষষ্ঠ সংস্করণে নজরুলের আধুনিক গান সংকলিত হয়েছে ৭৮১টি। তবে চলমান আহরণের প্রক্রিয়ায় সংখ্যাটা বিপুলতর হবার কথা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলা গান নজরুলের কাল যাবৎ ছিল মোটামুটি সর্বজ্ঞশাসিত অর্থাৎ কথাকার, সুরকার ও রূপকার একই ব্যক্তি যেমন—রামপ্রসাদ, রামনিধি, রবীন্দ্রনাথ। প্রতিপক্ষে নজরুল তাঁর গানকে বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা মারফত সমৃদ্ধতম হয়ে ওঠার পথ করে দিলেন। যেমন কথাকার নজরুল গানের দাবির বিচারে গানবিশেষকে সুরারোপ করতে দিলেন কমল দাশগুপ্তকে কিংবা শৈলেশ দত্তগুপ্তকে এবং গাইতে দিলেন উস্তাদ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে কিংবা অভিনেত্রী-গায়িকা কাননবালাকে। তবে স্মর্তব্য যে সংগীতের সামগ্রিক রূপবন্ধটির 'নজরুলিয়া' বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষিত থাকতো যেহেতু আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞগণ সকলেই ছিলেন—উদ্‌যাপিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী বাংলার অন্যতম প্রধান কাব্যসংগীতকার, কাজী নজরুল ইসলামের পরম ভক্ত পরিকর। নজরুল প্রযোজিত—বিশেষজ্ঞ গীতিকার বিশেষজ্ঞ সুরকার ও বিশেষজ্ঞ রূপকার—এই তিন রত্নের সম্মিলিত অবদানে আধুনিক বাংলা গান উৎপাদিত হচ্ছে আজও। তবে মান থাকছে না ম্যাসপ্রোডাকশনের কারণে, যেজন্যে সৃজিত না-বলে উৎপাদিত হচ্ছে বলতে হল। এদেশে যথা অর্থে আধুনিক গানের প্রথম মিউজিক কম্পোজার ও প্রডিউসার কাজী নজরুল ইসলাম। কথাটা বলেছেন সংগীতগুরু সুকুমার রায়। দিলীপকুমার রায়ও ঠিকই বলেছিলেন যে মিউজিক কম্পোজিশনের কোনো কনসেপ্টই ছিল না আমাদের এর আগে। তাই বলতে হয় সাবেক কালের শেষ প্রধান প্রতিনিধি নজরুলই আধুনিক কালের প্রথম প্রধান প্রতিনিধি।

AMARBOI.COM

নজরুলের কালজয়ী আধুনিক গানের কিছু উদাহরণ : অরুণ রাঙা গোলাপ কলি, আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া, আমায় নহে গো ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান, আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, আমি পূরব দেশের পুরনারী, আমি যার নূপুরের ছন্দ, কথা কও কও কথা থাকিও না চুপ করে, সবার কথা কইলে কবি, কেন মন বনে মালতী বল্লরী দোলে, গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, গানগুলি মোর আহত পাখির সম, চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়, জানি জানি প্রিয় এ জীবনে মিটিবে না সাধ, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের পরে, নাই চিনিলে আমায় তুমি রইব আধেক চেনা, বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে আমার তনুর তীরে, বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ এক জনমের নহে, বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ, মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে বিদায় সন্ধ্যা বেলা, মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম, যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায়, যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই, সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায় প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলসংগীত শব্দটা শুনেই অনুষঙ্গবাদীরা, লোকসংগীতের অঙ্গনটি টপকে, রাগসংগীতের ভাবানুষঙ্গে চলে যান এবং ভুলে বসেন যে লোকসুরই রাগসুরের মূলাধার। সেদিক থেকে আজন্ম রাগসংগীতপ্রেমী নজরুলের লোকসুরের সঙ্গে ছিল নাড়ির সম্পর্ক। সে-কারণে লোকসুরভিত্তিক বাংলা গানে তাঁর অবদান ছিল মৌলিক এবং উচ্চতম মানের। নজরুলের পূর্বে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে অতুলপ্রসাদ সেন পর্যন্ত লোকসংগীতের কেবল বাউল সুরাঙ্গ অবলম্বনে গান রচিত হয়। কিন্তু নজরুলের রচনায় বাউল ছাড়াও ঝুমুর, ঝাপান, সারিসহ ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া ইত্যাদি নানান সুরভঙ্গি এসে মিলে মিশে লোকসংগীতভিত্তিক আবহমান বাংলার গানের ধারাটিও অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তাঁর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান উপজাতীয় সুর ঝুমুরঢঙের নিবিড় এবং ব্যাপক ব্যবহার। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যের অন্যতম কারণ—ঝুমুর অঞ্চলের লোক হওয়ার সুবাদে তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত এই লোকসুরটির প্রয়োগ নজরুলের জন্যে হয়েছিল খুবই স্বতঃস্ফূর্ত। ফলে সৃষ্ট হয়েছে, এই বিশেষ লোকসুরমণ্ডিত অনেক কালজয়ী গান যেমন—এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন, কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে, ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো, তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি, হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল, নিমফুলের মউ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা, চুড়ির তালে নুড়ির মালা রিনি ঝিনি বাজে লো, ও ঝুমরো তীর-ধনুক নিয়ে বল না কোথায় যাস, এই রাঙামাটির পথে লো প্রভৃতি। তেমনি আজও সমান জনপ্রিয় নজরুলের ঝাপান সুরভিত্তিক গান যেমন—হলুদ গাঁদার ফুল, কথা কইবে না বউ, কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো শ্বশুর সওদাগর, ওঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে হবে, চিকন কালো বেদের কুমার যেন পাহাড়ে যাও প্রভৃতি। নজরুলের বেদে-বেদেনীর গানেও পাওয়া যায় সম্পূর্ণ নতুন ব্যঞ্জনা। মৌলিক সংগীতপ্রতিভা সাধারণ একটি লৌকিক সুরকে কেমন অলৌকিক সুরলোকে নিয়ে যেতে পারে—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নজরুলের 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ' গানটি।

ভাটিয়ালি ঢঙে অভিনব সুরযোগে নজরুলের মানের গান আর কেউ রচনা করেছেন বলে আমার মনে হয় না এবং এর প্রমাণ কেবল ইতিহাস সৃষ্টিকারী গান 'পদ্মার ঢেউ রে'-ই নয়। এক্ষেত্রে তাঁর অনেক গানই অদ্যাবধি অনতিক্রান্ত যেমন, এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে এই ত নদীর খেলা, আমার সাম্পান যাত্রী না লয়, আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা ঠেলে ইত্যাদি। আর ভাওয়াইয়া ঢঙেও অমর হয়ে আছে তাঁর 'নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা, 'পদ্মদীঘির ধারে ঐ সখি লো কমল দীঘির ধারে' ইত্যাদি। বিভিন্ন লোকসুরের বৈচিত্র্যবিলাসী নজরুল কিন্তু পূর্বসূরিদের ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বাউল সুর প্রয়োগেও বহু কালজয়ী গান সৃষ্টি করেছেন, যেমন—বাঁশি বাজায় কে কদমতলায় ওগো ললিতে, ভবের এই পাশা খেলায় খেলতে এলি হায় আনাড়ি, আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল আমার এই আপন দেহ, ওহে রাখাল রাজ! কি সাজে সাজালে আমায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ, অসীম আকাশ হাতড়ে ফিরে খুঁজিস রে তুই কাকে, তুমি দুঃখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি হরি প্রভৃতি। এ-পর্যন্ত সংকলিত নজরুলের লোকসুরঋদ্ধ গানের সংখ্যাও কম নয়, প্রায় ১৫০। লোকসুরের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নানারকম লাগসই সুর পুরে কালজয়ী গান রচনা করে লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও নজরুল পথিকৃৎ হিসেবে অবিস্মরণীয় থাকবেন।

নজরুল স্মরণীয় হয়ে আছেন প্রকৃতি পর্যায়ের বহু অমর গানের কারণেও—বিশেষত বর্ষা, বসন্ত ও শরৎ ঋতুবিষয়ক (শরতের জন্য প্রধানত উমাসংগীত স্মর্তব্য)। উদাহরণ : (বর্ষা) এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া, মেঘের হিন্দোলা দেয় পূব হাওয়াতে দোলা, এল বরষা শ্যাম সরসা প্রিয় দরশা, রুম্ ঝুম্ ঝুম বাদল নূপুর বোলে বোলে, (বসন্ত) আসে বসন্ত ফুলবনে, এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত, ফুল ফাগুনের এল মরশুম, আজি দোল ফাগুনের দোল লেগেছে, বসন্তমুখর আজি, (শরৎ) এস শারদপ্রাতের পথিক এস শিউলি বিছানো পথে প্রভৃতি।

হাস্য কমিক-রিলিফরূপী বিষ্কম্ভক কিংবা গর্ভনাটক ছাড়াও, সিনেমা-নাটকের শক্তিশালী অঙ্গবিশেষ। সংগীত এই রসের স্বভূমি নয়। তবু পঞ্চপ্রধানের দুজন তাঁদের গানেও এর শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যঙ্গগীতিতে ও রজনীকান্ত সেন রঙ্গগীতিতে। এই দুইজনের হাসির হাট জমজমাট থাকতেই অসাধারণ দক্ষতায় নজরুল তাঁর ব্যঙ্গগীতি ও রঙ্গগীতির—এককথায় হাস্যগীতির—পশরা সাজিয়ে মাতিয়েছিলেন সমগ্র বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতাকে। তবে এ-প্রসঙ্গে এও স্মর্তব্য যে গুরুগণের তুলনায় নজরুল উপকরণগত সুযোগ পেয়েছিলেন অনেক বেশি, যেমন গ্রামোফোন-বেতার-চলচ্চিত্র, আরও পেয়েছিলেন অনেক বেশি প্রতিভাবান গায়কের দল যেমন রঞ্জিত রায়, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিমল গুপ্ত (দাশগুপ্ত) প্রমুখ। এক্ষেত্রেও নজরুলের অনেক গানই কালজয়ী হয়েছে গানওলির উপজীব্য চিরন্তন বলে যেমন—টিকি আর টুপিতে লেগেছে দ্বন্দ্ব, বদনা গাড়ুতে মুখোমুখি বসে, দয়া করে দয়াময়ী ফাঁসিয়ে দে এই ভুঁড়ি, দে গরুর গা ধুইয়ে, আমার খোকার মাসী, প্রিয়ার চেয়ে শালী ভাল, ওহো আজকে হইব মোর বিয়া, আমার হরিনামে রুচি পরিণামে লুচি, ও তুই উল্টো বুঝলি রাম, দুপেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে প্রভৃতি।

নজরুল নিজেও তাঁর কাব্যের চেয়ে সংগীতের উপর বেশি আস্থা রাখতেন। মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর 'নজরুল স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন 'আমার মনে আছে, একদিন শ্রীভূপতি মজুমদার বলেছিলেন—"নজরুল, কী তুমি এত ভালো গান গাও যে গান পেলেই মেতে ওঠ।" সেদিন নজরুল খুব আহত হয়েছিল। সে বলেছিল, "ভূপতি-দা আমার কবিতার যত খুশি সমালোচনা করুন। কিন্তু আমার গানের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।" *[ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিতমানস, পৃ. ৩৪৯]*

তাঁর সংগীতের উৎকর্ষ সম্পর্কে নজরুল বরাবরই অবহিত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনসাহিত্য সংসদের ভাষণে নজরুল বলেছিলেন, 'সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই তবে এইটুকু মনে আছে, সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে তখন আমার কথা সবাই মনে করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।'

একই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিন্ন উক্তিগুলিও এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সংগীত-বিভাগের অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতা মেঘেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ নিজে আমায় বলিয়াছিলেন', "তোমরা কবি টবি যা বলো বলতে পারো, কিন্তু গানেই আমি বড়।"*[নজরুল-চরিতমানস, পৃ. ৩৫০]*। ৭ মার্চ ১৯৩৪ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আমার কাব্যের কোনোকালে অনাদর হতেও পারে কিন্তু বাংলাদেশের লোককে আমার গান গাইতেই হবে—সেই গানের সুরগুলি যদি বিকৃত বা লুপ্ত হয় তবে তাতে দেশের ক্ষতি এ আমি অহংকার করেই বলতে পারি।'

কথাগুলি যাঁরা বলেছেন তাঁরা-যে নির্ভুল ভবিষ্যতদ্রষ্টা তা আজ প্রায় সাত দশক পরে বিশ্বের পঁচিশ কোটি বাঙালি এক বাক্যেই বলতে পারে।

১১

বাংলার সংগীতজগতে কাজী নজরুল ইসলামের এতসব নবসংযোজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন না-হওয়া ছিল বিস্ময়কর। তার বদলে অবমূল্যায়ন হওয়া ছিল হতভম্বকর। কিন্তু কেন ? কারণ কি এটাই যে নজরুল মাত্র ষোল বছর সংগীত রচনা করার পরই সম্বিত হারান ১৯৪২ সালে ? না। ট্র্যাজিডিটি বরং তাঁর মহৎ কীর্তির প্রতি বর্ধিত দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ হওয়ার কথা। বাস্তবে হয়েছে বিপরীত। যে-নজরুল বিশের দশকে বাংলার কাব্যজগতে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে ত্রিশের দশকে বাংলার সংগীতজগতের নায়করূপে বরিত হয়েছিলেন, সম্বিতহারা হওয়ার পর থেকে বারোটি বছর সে-নজরুলের শিল্পকর্ম তাঁর কর্মক্ষেত্র কলকাতাতেই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে রইল।

নজরুল-বিষয়ে প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করেন আজহারউদ্দীন খান্ (১৯৩০—), ১৯৫৪ সালে তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' গ্রন্থটি প্রকাশ করে (প্রকাশক, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ডিমাই পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২)। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্রভাববিস্তারী আলোকপাত করার মতো গুণমানের গ্রন্থ ছিল না ওটি। বইটির ২০০৪ সালে প্রকাশিত, বহুগুণ পরিবর্ধিত, সপ্তম সংস্করণও কেবল বিপুল পরিমাণে বর্ধিত তথ্যসমৃদ্ধই হয়েছে—মনে দাগ কাটার মতো বিশ্লেষণসংবলিত গুণধারক কিছু হয়েছে বলে মনে হয়নি আমার (প্রকাশক, সুপ্রিম পাবলিশার্স, রয়েল পৃ. ৮০৮)। এর পর ১৯৬০ সালে প্রকাশিত ড. সুশীলকুমার গুপ্ত'র (১৯২৬–৯৭) 'নজরুল-চরিতমানস' গ্রন্থটি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বটে তবে বাঙালীর সংস্কৃতিতে নজরুলের যথাযথ অবস্থান নির্ণয় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠককে নজরুলপাঠে কিংবা গবেষককে নজরুল গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার মতো তেমন গভীরচারী বিশ্লেষণ অথবা অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ আমি এতেও পাইনি। (বর্তমানে বাজারে আছে কিছু নতুন তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজিত গ্রন্থটির তৃতীয় দে'জ সংস্করণ)। বইটি সংগীত-অংশে দীনতর। পড়লে মনে হয় ক্রিয়াসিদ্ধ সংগীতশিল্পের সঙ্গে অপরিচিত ড. গুপ্ত'র ধারণাগুলি ধার করা অথবা প্রত্যক্ষ নয় বলেই ভুলে ভরা। তবু বর্ণিত গ্রন্থদুটির একটা ভূমিকা ছিল অমূল্য, যথা সারবান আলোচনায় না-হোক, গভীরচারী বিশ্লেষণে না-হোক—ওই হন্তারক দুর্দিনে দুখু মিয়াকে অন্তত এজেন্ডায় রাখা এবং তাঁর সম্পর্কে দ্রুতবিস্মরণশীল কালটিতেই সার্বিক তথ্যাবলী যথাসম্ভব সংরক্ষণ করা।

সমসময়ে নজরুলের রচনাবলী সংরক্ষণের হাল ধরেছিলেন নজরুল গবেষণার পথিকৃৎ আবদুল কাদির। তাঁর উদ্যোগে প্রথমে পাকিস্তান পাবলিকেশন্স থেকে 'নজরুল-পরিচিতি' নামে প্রবন্ধসংকলন বের হয় ১৯৫৯ সালে এবং 'নজরুল রচনাসম্ভার' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে ঢাকা থেকে, তবে সম্পাদকের নাম ছাড়া। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ আবদুল কাদির সম্পাদিত বলে কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে, কিন্তু সেটিও সম্পাদকের সমঝদার প্রবেশক কিংবা রসগ্রাহী ভূমিকা ছাড়া।

চল্লিশের দশকের শেষ ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমাংশে সম্বিতহারা নজরুলের শিল্প-সম্পর্কিত চর্চা বিঘ্নিত হওয়ার বেশকিছু প্রসঙ্গবহির্ভূত কারণও ছিল যথা—মহাযুদ্ধ, মহাদুর্ভিক্ষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশভাগ, সংগীতশিল্পীসহ গুণীজনদের বিপুলহারে দেশান্তরী হওয়া ইত্যাদি। অনতিবিলম্বেই অবশ্য বিখ্যাত নজরুলসংগীতশিল্পী ফিরোজা বেগম ও তাঁর স্বামী নজরুলসংগীতের অন্যতম পুরোধাপুরুষ কমল দাশগুপ্ত কলকাতায় ফিরে গিয়ে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীদের দিয়ে নজরুলগীতির এলপি বের করার উদ্যোগ নেন। প্রথমদিককার খ্যাতনামা নজরুলসংগীতশিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'লাভ সঙ্‌স অব নজরুল' শীর্ষক প্রথম এলপি-টি সুপারহিট হতেই বলতে গেলে সেখানে নজরুলচর্চার পুনরভ্যুদয় হয় যথাযোগ্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে। ষাটের দশকের শুরুতে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় নজরুলের উদ্দীপনী সংগীতনিচয় কলকাতার বেতার ও মঞ্চ মারফত জনগণকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে এবং এই প্রক্রিয়ায় নজরুলচর্চাও পুনরুজ্জীবিত হয়। তবে নজরুলচর্চার দ্বিতীয় অধ্যায় ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত হয়ে যায় কলকাতা থেকে ঢাকায়, বলা যায় একরকম অলক্ষ্যেই। নজরুলসংগীতের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় এদেশের বেতার-টিভি ছাড়াও ঢাকার ঐতিহাসিক কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, পঞ্চাশের দশকের বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, ষাটের দশকের ছায়ানট, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, নজরুল একাডেমী, সত্তরের দশকের হিন্দোল, দোলনচাঁপা, সঙ্গীতভবন প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়বস্তুবিশেষজ্ঞ সংগীতপ্রতিষ্ঠান এবং—শেষ অথচ বিশেষ—বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশির দশকের নজরুল ইন্সটিটিউট।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সংগীত সম্পর্কে সত্যকার অর্থে গভীর ও ব্যাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণা শুরু হয় সত্তরের দশক থেকে এবং বাংলাদেশেই। আমার জানামতে এখনও পর্যন্ত নজরুলসাহিত্যে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (কাজী নজরুল ইসলাম/জীবন ও সৃষ্টি, নজরুল প্রসঙ্গে) ও আবদুল মান্নান সৈয়দ (অগ্রন্থিত প্রবন্ধাদি) এবং নজরুলসংগীতে ড. করুণাময় গোস্বামীর (নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান) কাজই শিখরস্পর্শী। এঁদের প্রকাশনার সঙ্গে পূর্ববর্ণিত কলকাতার পূর্বসূরিদের প্রকাশনাগুলিকে তুলনীয় মনে হয় না। নমুনাস্বরূপ ড. সুশীলকুমার গুপ্তের নজরুলসংগীত-বিষয়ক কিছু র‍্যান্ডম মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—

: সংগীতের সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। *[সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিতমানস, পৃ. ৩৩৫]*

: বস্তুতঃ রবীন্দ্রসংগীতের সুরবৈচিত্র্য আর কোন ভারতীয় সুরকারের রচনায় দেখা যায় না। *[প্রাগুক্ত, পৃ.৩২০]*

: রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেই নজরুল বাঙলা গানের জগতে এক নুতন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮]*

: রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের পথেই নজরুলের আবির্ভাব। ...। বিষয় ও সুরবৈচিত্র্যের গৌরবে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে খুব ন্যূন নন। *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩[illegible]]*

: আমার মনে হয় সবদিক বিচার করলে বীর্যব্যঞ্জক গানে নজরুল দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়েও বড় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী। *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬]*

: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি সংগীতকারের কাছে নজরুল কমবেশি ঋণী। ...। অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের সুর-বৈচিত্র্যও নজরুলকে প্রেরণা যুগিয়েছে সন্দেহ নেই। *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬]*

[সংগীতের হেভিওয়েট কাজী নজরুলকে লাইটওয়েট রজনীকান্তের কাছে ঋণী করার সুশীল গুপ্তের এই দাবি অন্তত বুদ্ধদেব বসুর সমর্থন পাবে না, যিনি কান্তকবির গান সম্পর্কে বলেন, 'ঐ নিরস্তসংগীত দেশে রজনীকান্তের দুই অর্থেই করুণ রচনাও গান বলে গণ্য।' *[বাংলার গান, চতুরঙ্গ ৪ মাঘ ১৩৫৫]*; 'when music was so sharply divided between the bawdy and the dull that even the pathetic ineptitudes of Rajanikanta Sen were a welcome relief.' *[বুদ্ধদেব বসু লিখিত প্রবন্ধ, Modern Bengali Music and Nazrul Islam]*

: তাঁর স্বদেশাত্মবোধক গীতি, মানবিক প্রেমগীতি, ভক্তিমূলক গীতি, প্রকৃতিগীতি ও হাসির গান বাঙলা গানের ঐতিহ্যের আশ্রয়েই রচিত। *[নজরুল-চরিতমানস, পৃ. ৩৩৭]*

: উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে নজরুল-যুগ পর্যন্ত বাঙলাদেশে অনেক দেশাত্মবোধক গীতি জন্ম লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ... অতুলপ্রসাদ সেনের ... 'বল, বল, বল সবে, শত-বীণা-বেণু রবে', ... 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর'; ... রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি', 'ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গ আমার, জননী আমার ধাত্রী, আমার দেশ' ... স্বাদেশিক গানের এই ঐতিহ্যের ধারাতেই নজরুল দেশাত্মবোধক গান প্রণয়ন করেছেন। *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭]*

: মানবিক প্রেমগীতির মধ্যে নজরুলের গজলগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। ... তাঁর অন্যান্য প্রেমগীতিতে রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭]*

: তাঁর শ্যামাসংগীত রামপ্রসাদের আদর্শে রচিত। কীর্তন, বাউল প্রভৃতি গানে নজরুলের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব খুবই বেশী। *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭]*

১২

আমার অনুমান : কাজী নজরুল ইসলামের সংগীতসৃষ্টি বিষয়ে বর্ণিত সত্যের এইসব লাগামছাড়া অপলাপ এবং অবমূল্যায়নধর্মী কথামালা সুশীল গুপ্ত নিজের সংগীতোপলব্ধি থেকে পাননি, পেয়েছেন উদ্‌যাপিত কিছু জ্ঞানীগুণীর লঘুচিত্ত আলোচনার দূষিত পরিবেশ থেকে। কিছু সংগীতগুণী ও সাহিত্যগুণী নজরুলের সংগীত সম্পর্কে এ-ধরনের রায় দিয়ে অনেক অপকৃষ্ট রচনা সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় ছাপিয়েছেন এবং দ্বিতীয়চিন্তামূলক সংশোধনী ব্যতিরেকে তাঁদের রচনাবলীতে স্থায়ীভাবে জায়গা দিয়েছেন। বঙ্গীয় সংস্কৃতির অঙ্গনে এঁরা এতোই প্রভাবশালী যে, এঁদের ছিটেফোঁটা মন্তব্যই অন্যদের চিন্তাভাবনার সীমা নির্ধারণ করে দেয়। নজরুলের এ-ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে স্থায়ীভাবে গ্রন্থিত আছেন এমন তিনজনকে নিয়ে এখানে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। এঁদের প্রথমজন যুগপৎ সাহিত্য ও সংগীতগুণী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয়জন সাহিত্যব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু এবং তৃতীয়জন সংগীতগুণী রাজ্যেশ্বর মিত্র।

ধূর্জটিপ্রসাদ ১৩৩৬ শ্রাবণ সংখ্যা 'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' পত্রিকায় 'আজকালকার গান' শিরোনামে সমকালীন গান সম্পর্কে তাঁর স্বভাবসুলভ কিছু তুচ্ছতাচ্ছিল্য ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, তখনকার নজরুলের সংগীতখ্যাতির প্রধান ভিত্তি কেবল বছর তিনেকের সৃষ্টি গজল হলেও—বাংলার গানে সেই অভিনব সংযোজন বাঙালীকে নতুন ঢঙের নতুন সুরের নতুন উন্মাদনে তদ্দণ্ডেই অভিভূত করে ফেলেছিল। তবে কাজীর মহত্তম গানগুলি চর্চাতেই এসেছে ধূর্জটিপ্রসাদের মৃত্যুর (১৯৬১) পরে। ১৯২৯ সালে, ধূর্জটিবাবুর আলোচ্য রচনার কালে, কাজীর গানের শতাংশও চর্চিত হয়নি, প্রস্ফুটিতও হয়নি তিন-চতুর্থাংশ। তাই ধূর্জটিবাবুর লেখাটির তীব্র প্রতিবাদ জানান নজরুলের গুণগ্রাহী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংগীতশিল্পী নলিনীকান্ত সরকার একই পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায়। প্রশ্নবিদ্ধ ধূর্জটিপ্রসাদ এর অক্ষম একটা উত্তরও দেন কার্তিক সংখ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর মূল রচনায় অনেক প্রগল্‌ভতা ও সস্তা কথামালার মধ্যে লেখেন :

> 'এ বৎসর কলকাতায় এসে দেখছি যে কাজী নজরুলের গান দেশ ছেয়ে ফেলেছে। তাঁর সুরও ঠুংরি গজল নয়। তাঁর দেওয়া অনেক সুর শুনতে ভাল লাগলেও সুর হিসাবে খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়। সুর-সৃষ্টি হিসাবেও তাঁর মূল্য খুব বেশি নয়। অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় তাঁর সুর বাজারের ঠুংরি গজলের অনুকরণ মাত্র। যেখানে তিনি অনুকরণ করেন নি, সেখানে তাঁর সুর রচনা অত্যন্ত flat সাদামাঠা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই হালকা সুরের জন্য তাঁর গলা এবং কবিতা প্রধানত দায়ী। তাঁর গলা মোড় খায় না, তাঁর গলায় তান নেই, মীড় নেই। এই অভাবের জন্য তাঁর রচনার ক্ষতি হয়েছে। গান রচনার বাহাদুরী অলংকার ফোটাবার অবকাশ দেওয়া—যেমন স্বরবর্ণের প্রাচুর্য। কাজীর কবিতা সব ঠাস্‌বোনা, (অতুলপ্রসাদের নয়) ব্যঞ্জনবর্ণ সেখানে প্রধান। কাজী মনে মনে জানেন যে তাঁর গলা নেই, সেইজন্য গলার দোষ ঢাকবার জন্য তাঁর কলম ব্যঞ্জনবর্ণই ব্যবহার করতে উৎসুক এবং তালপ্রধান ঠুংরি গজলের ছাঁচে গান লিখতে ব্যগ্র—দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করতে। অতুলপ্রসাদের গলায় চমৎকার ছোট ছোট তান আছে, তাঁর গান গাইতে হলে ছোট তানের দরকার। সেইজন্য সকলেই কাজীর গান গাইতে পারে এবং সকলে অতুলপ্রসাদের গান গাইতে পারে না। পূর্বোক্ত দোষের জন্য কাজীর কবিতাও দায়ী। কাজীর কবিতায় অনেক কথা টেনে বোনা হয়েছে। অনেক সময় তার মানে হয় না। অথচ কথাগুলির বাহ্যিক মিল আছে। মিল খোঁজবার জন্য কাজীকে অদ্ভুত কথার আমদানি করতে হয়। অপূর্ব কথাগুলি মনকে চমক লাগিয়ে দেয়—বৈঁচীর কাঁটার সঙ্গে পৈঁছির মিল, সত্যই অদ্ভুত—এই ফাঁকে সুর এবং ভালমন্দের বিচারশক্তি পালিয়ে যায়। বিচারশক্তির কথা 'সংগীতবিজ্ঞান পত্রিকা'র এক সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। সংগীত রচয়িতার মূল্য-জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। এই মূল্যজ্ঞান অতুলপ্রসাদের আছে কাজী নজরুলের কম—দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গানের উল্লেখ করলেই চলবে—'বাগিচায় বুলবুলি তুই' এই গানটির স্থায়ী চমৎকার কিন্তু পরের লাইনটি প্রথম লাইনের সঙ্গে একেবারে খাপ খায়নি। পাঠক শুনলেই বুঝতে পারবেন। এই ধরনের নিয়মভঙ্গ অতুলপ্রসাদের দ্বারা অসম্ভব।' *[ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮-৮৯]*

ধূর্জটিবাবুর এই মন্তব্যের প্রতিতুলনায় বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্যও স্মর্তব্য—'ঐতিহাসিক কারণে দু-জনের নাম (অতুল ও নজরুলের) একসঙ্গে করতে হলেও প্রবীণতর ব্যারিস্টার-গুণীর তুলনায় নজরুলের প্রাধান্য প্রথম থেকেই স্পষ্ট, এখন স্বতঃসিদ্ধ। একে-তো কবিত্বে কোন তুলনাই হয় না, তার উপর সংগীতেও নজরুলের ক্ষমতা বড়ো, প্রাচুর্য বেশি, বিচিত্র বহুমুখিতা—রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে—অনন্য। অতুলপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য, শেষ পর্যন্ত, এইখানে যে চিরাচরিত ভারতীয় ভক্তিরসে নিজস্ব একটি নিবিড়তা তিনি এনেছিলেন; কিন্তু নজরুলের মৌল উপকরণই অংশত অপূর্ব বলে বাংলা গানের সামগ্রিক গতিরই তিনি মোড় ফেরালেন। এটা লক্ষণীয় যে রচনার প্রবলতা এবং পরিমাণ, আর সেই সঙ্গে বিরল ব্যক্তিগত মনোহারিতা সত্ত্বেও, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী বা নামমাত্র; কিন্তু সংগীতে তিনি প্রবর্তক, প্রজনক;...'। *[বাংলার গান, চতুরঙ্গ সংখ্যা ৪ মাঘ ১৩৫৫]*

ধূর্জটিবাবু সঙ্গতিরচয়িতা হিসাবে নজরুলের মূল্যজ্ঞানহীনতার উদাহরণস্বরূপ কবির জীবনের প্রথম গজলটির উল্লেখ করেছেন। সে-গজলটি সম্পর্কেই সঙ্গীতগুণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলীপকুমার রায় তাঁর 'ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ'-শীর্ষক মূল্যবান স্মৃতিচারণী গ্রন্থে লেখেন :

> "... গানে ওর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছিল সবচেয়ে বেশি ওর বাংলা গজলেই বলব। আমার বিশেষ প্রিয় ছিল ওর একটি গজল যেটি ভ্রাম্যমান হয়ে সর্বত্র গেয়ে আমি বহু শ্রোতাকেই সচকিত করে তুলেছিলাম : 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল।' এ-গানটি একদা প্রায় আমার 'রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো'-র মতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই গানটির জন্যেই ও আমাকে পরে ওর গজল গীতিগুচ্ছ 'বুলবুল' উৎসর্গ করে।"

'আজকালকার গান' রচনাটি ধূর্জটিপ্রসাদ আরম্ভ করেছেন এভাবে :

> 'বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতায় গানের একটা সাড়া পড়েছে। ছেলেমেয়ের দল সকলেই না হয় গানে, না হয় বাজনায় মন দিয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতেই এক একটি, কোনো কোনো বাড়িতে আবার দুই তিনটি প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেছে। সকাল-সন্ধ্যায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং বড়লোকের বাড়িতে রেডিওতে গানবাজনা শোনবার জন্য ছেলেমেয়ে জড় হচ্ছে। তার ওপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে কনসার্ট পার্টি, থিয়েটারের দল গানের আখড়া দিচ্ছে। কলের বাজনা ত রয়েছে। আত্মহত্যা মহাপাপ নচেৎ বহুদিন পূর্বেই ও কাজ করতুম।' (উদ্ধৃতির এইটুকু শুধু শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বুদ্ধিজৈবিক সীমাবদ্ধতা দর্শানোর জন্য)।
>
> 'গত মাসে প্রায় দশ-বারোটি প্রতিভাশালী যুবক-যুবতীর গানবাজনা শুনলাম। তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন রবিবাবুর গান গাইলেন, বাকী সব কার গান গাইলেন বুঝতে পারলুম না। সন্দেহ হল অতুলপ্রসাদের কিন্তু তাঁর নয়—তিনি নিজে অস্বীকার করলেন। শুনলাম সেগুলি কাজী নজরুলের। সত্য মিথ্যা জানি না। তাতে ছন্দের কিছু বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু মানে নেই মনে হল। তাতে সুরের একটা গতি আছে কিন্তু সে গতি অত্যন্ত হালকা এবং নিতান্তই একঘেয়ে। তাতে গজল ঠুংরি, শাউনীর মাধুর্য আনবার প্রয়াস আছে, কিন্তু সে মাধুর্য একেবারে ঝুটা। ঢাকার মুসলমানের উর্দুর সঙ্গে লক্ষ্ণৌ নবাবের উর্দুর যা তফাত, ভাটপাড়ার ভটচায্যি মশাই-এর সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে এই বাংলাদেশের অভিনব ঠুংরির তফাত তাই। পশ্চিমাঞ্চলের ঠুংরি গজল শোনবার বিশেষত বাঈজীর মুখে শোনবার সৌভাগ্য যার ঘটেছে সেই বুঝবে এই তফাত কোথায় এবং কতখানি।' *[আজকালকার গান, পৃ. ১৮৬, ধূ.র. ৩য় খণ্ড]*

১৩

কাজী নজরুলের গান সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের উদ্ধৃত উক্তির প্রতিবাদে নলিনীকান্ত সরকার লেখেন :

> 'ধূর্জটিবাবু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তিনি প্রবন্ধটি লিখতে যে সময় নষ্ট করেছেন, তার চাইতে অল্প সময় খরচ করে যদি ভেবে দেখতেন যে "কাজী নজরুলের গান দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেয়ে ফেলেছে" কেন, তাহলে হয়তো তাঁর আর প্রবন্ধটি লিখবার প্রয়োজন হত না। বাঙালী "শুনতে ভাল লাগার" দিক দিয়েই মুখ্যত গানের বিচার করে থাকে। শ্রেণীর উচ্চতা পরিমাপের ভার তারা পরিমাপক শ্রেণীর ব্যক্তির উপরে ছেড়ে দিয়ে "খুব বেশি মূল্য" দিয়েই কবি নজরুলের গান নিয়েছে। দেশভরা আগ্রহ না থাকলে এ গান "দেশ ছেয়ে" ফেলতো না। এই আকুল আগ্রহই তাঁর গানের মূল্য।' *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭-৩৮]* ... ...

'কবি নজরুল ইসলামের কাছ থেকে সংগীতের দিক থেকে বাঙালী যা পেয়েছে—তাতে বাঙালীর কোন স্বত্বাধিকার ছিল না, যে সংগীতের "চালে" বাঙলার বাইরের অনেক কিছু আছে। তাতে হয়তো লক্ষ্ণৌয়ের ভিখারী-ভিখারিণীর জনসাধারণকে মুগ্ধ করা সুর-সৌন্দর্য আছে—হয়তো তাতে দিল্লীর দরবারের ওস্তাদজীদের চমক লাগানো সুর-বৈভব নাই—কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে, নজরুল ইসলামের গানের হিন্দুস্থানী সংগীত-সুধা বাঙালী সাদরে পান করেছে। হিন্দুস্থানী চালের বাংলা গান নিধুবাবুর পরে বোধ হয় এই দ্বিতীয়বার বাংলায় এতটা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে চলেছে। নিধুবাবুর রচনার সঙ্গে শোরী মিঞার সুরের মাল্য-বিনিময়ে কোনও পক্ষের কৌলীন্য যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়েছে, এমন তো মনে হয় না। শোরী মিঞার টপ্পা নিধুবাবু হুবহু গ্রহণ করেননি, তিনি তাঁর প্রয়োজন ও পছন্দ মতো যতটা সম্ভব নিয়ে নিজের রঙে তাকে রঙিয়ে নিয়েছেন। আজ শোরী মিঞার টপ্পা হিন্দুস্থান হতে লোপ পেতে চলেছে, পরন্তু নিধুবাবুর টপ্পা শুনে বাঙালী শ্রোতা এখনও উল্লসিত হয়ে উঠে। নিধুবাবুর টপ্পা বাংলা থেকে কখনও লোপ পাবে না একথা উচ্চকণ্ঠে বলা যায়। তার কারণ আছে।

আপন আপন অহং বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করে সংগীতকে উচ্চশ্রেণী বা নিম্নশ্রেণীর আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কীর্তন-বাউল থেকে আরম্ভ করে বর্তমানের গান পর্যন্ত বাঙালী যে-সংগীত বরণ করে নিয়েছে, উচ্চ নিম্ন অভিধায় তার কিছুমাত্র যায় আসে না। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। বাঙালী শুধু সুর ও তালের বিশ্লেষণকে মুখ্য করে কোনও সংগীতকে আজ পর্যন্ত নেয়নি। সুরলয়ের সঙ্গে বাঙালী চায় emotion-পূর্ণ কথা। আর চায় সেই কথার সঙ্গে সুর-লয়ের ভাব-সম্মিলন। কবি নজরুল ইসলামের গানকে বাঙালী এই হিসাবেই কণ্ঠাভরণ করে নিচ্ছে। তাঁর গজলে কোনও গোঁজামিল আছে কি না-আছে—বাঙালী তা দেখবার প্রয়োজন বোধ করে না। সংগীত অর্জন ও বর্জনের জন্য বাঙালী নিছক্ রস বিচার করে থাকে, এইখানেই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। তাই বলে বিজ্ঞান-সম্মত সংগীতকে বাঙালী তাচ্ছিল্য করে না বরং সে-সংগীতে হিসেবনিকেশের চাতুর্য দেখে তারিফও করে, বাহোবাও দেয়; কিন্তু সে বস্তুকে সে গ্রহণ করতে পারে না। তারিফ করে তার হিসেব নিকেশী বুদ্ধি আর গ্রহণ করে তার রস পিপাসু প্রাণ। এই প্রাণপুটেই নজরুল ইসলামের গানকে বুদ্ধিমান বাঙালী আগ্রহে গ্রহণ করেছে।' *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬-৩৭]*

'অতুলপ্রসাদের গানের সুর ও কথার বিশেষজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ যখন উক্ত আসরের গানগুলোকে অতুলপ্রসাদের গান বলে' সন্দেহ করেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই অতুলপ্রসাদের রচনার উক্ত গুণ ও বিশেষত্ব তিনি তাতে পেয়েছিলেন। ধূর্জটিবাবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> সেই গানগুলো সম্বন্ধে বলছেন, "সন্দেহ হল অতুলপ্রসাদের কিন্তু তাঁর নয়—তিনি নিজে অস্বীকার কোরলেন। শুনলাম সেগুলি কাজী নজরুলের।" যেই তিনি শুনলেন, গানগুলি অতুলপ্রসাদের নয় এবং কাজী নজরুলের, অমনি দেখলেন সেই গানগুলিতে "ছন্দের কিছু বৈচিত্র্য আছে বটে কিন্তু মানে নাই মনে হল। তাতে সুরের একটা গতি আছে কিন্তু সে গতি অত্যন্ত হালকা এবং নিতান্তই একঘেয়ে। তাতে গজল, ঠুংরি শাউনীর মাধুর্য আনবার প্রয়াস আছে কিন্তু সে মাধুর্য একেবারে ঝুটা" ইত্যাদি ইত্যাদি। নজরুল ইসলামের প্রতি এই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই ধূর্জটিবাবু প্রবন্ধটি আগাগোড়া রচনা করেছেন। আর এক জায়গায় ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন, "অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের জন্যই প্রধানত ঠুংরি গজলের বন্যা এসেছে।" এখানেও ধূর্জটিপ্রসাদ কি জানি কেন নজরুল ইসলামকে বাদ দিয়ে চলেছেন। দিলীপকুমার যে-সব গজল গান সাধারণত গাইতেন তার মধ্যে অতুলপ্রসাদের গান "প্রধানত" কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অতুলপ্রসাদের গজল তাঁর কণ্ঠে খুব কমই শোনা যেত বরং নজরুল ইসলামের গজলই দিলীপকুমার অপেক্ষাকৃত বেশি গাইতেন। ধূর্জটিপ্রসাদ যে সংগীতকে হয়তো গজলের পর্যায়ে ফেলতে রাজি হবেন না কিন্তু দিলীপকুমার সে গানগুলিকে গজল বলেই গাইতেন। খাঁটি গজল নয় বলে ধূর্জটিপ্রসাদ যদি এ গানগুলির গজলত্ব অস্বীকার করেন, তাহলেও অতুলপ্রসাদের গজলও অপাঙক্তেয় হয়ে পড়তে পারে।' *[প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮-৩৯]*

এই প্রতিবাদপত্রের উত্তর দিতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, 'সন্দেহ হল অতুলপ্রসাদের'—বাক্যাংশটির 'সন্দেহ'টি ছিল শুধু লিখনভঙ্গি। তাঁর এই ডিফেন্সটি প্রত্যয়জনক হয়নি। এছাড়া উত্তরে ধূর্জটিবাবুর মোদ্দা কথাটি ছিল—শ্রোতার 'গ্রহণ' করা ও 'বরণ' করা কাজীর গানে মূল্য জোগায় বলে ভাবাটা নলিনীবাবুর ভুল। কিন্তু সেই গ্রহণ ও বরণ সমগ্র বাংলার শ্রোতা এপর্যন্ত তিন প্রজন্মের বাঙালির মনে বহাল থাকা প্রমাণ করে ভুলটা সম্ভবত ধূর্জটিবাবুরই, নলিনীবাবুর নয়। কাজীর সেই গানগুলির পরে ধূর্জটিপ্রসাদ যে-তিনটি দশক লেখালেখি করে গিয়েছেন—সময়ের সেই পরিসরটিও যথেষ্টই ছিল তাঁর নিজের ভুল সংশোধন করার, যা তিনি করেননি। ('এই সব মতামত ধূর্জটিপ্রসাদ কোনোদিন পরিবর্তন করেছেন আমাদের জানা নেই, বরং এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে তিনি নলিনীকান্ত সরকারের সমালোচনার উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন' *[ভূমিকা, অনন্তকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৫, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড]*)। পরিবর্তন কিংবা সংশোধন করার মতো প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী ঢালাও মন্তব্য আরও ছিল ধূর্জটিপ্রসাদের আলোচ্য প্রবন্ধটিতে। যেমন সংগীতের অবনতির জন্য গ্রামোফোন কোম্পানি এবং ব্রডকাস্টিং কোম্পানি বিশেষ করে দায়ী ইত্যাদি। নিম্নমানের এই লেখাটি লেখক কর্তৃক বর্জিতও হয়নি। ফলে সেটি তাঁর রচনাবলীতে (পৃ. ১৮৬–১৯৪, তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭) গ্রন্থিত হয়ে নজরুলসংগীতের অবমূল্যায়নে স্থায়ী অবদান রেখে চলেছে, যেহেতু ধূর্জটিপ্রসাদ কেবল সুপণ্ডিত বলেই নয়, সংগীতগুণী হিসেবেও সুধীমহলে স্বীকৃত। সব পাঠক তো নাও জানতে পারেন যে ধূর্জটিবাবুর এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোড়লপনা তাঁর চেয়ে অধিক সৃজনশীলগণ গ্রহণ করেন না—যেটাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মুরব্বিয়ানা। ('ধূর্জটির লেখায় আমার একমাত্র বিরক্তির কারণ... তার ইস্কুল মাস্টারি মুরুব্বিয়ানা। ... কিন্তু রুচির ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা সহ্য করতেই হয়।') *[সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, পৃ. ২০৩, রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য]*। ধূর্জটিবাবুর এই মুরুব্বিয়ানাকে পণ্ডিত রবিশংকর বলেছেন Patronizing attitude। *[পৃ. ১৭৭, রাগ-অনুরাগ]*

১৪

নজরুলের গলা নেই, তান নেই, মীড় নেই, গলার দোষেই তাঁর গান নষ্ট—ধূর্জটিবাবুর এইসব দাবি তাঁর সমতুল্য মানের সাক্ষাতশ্রোতাদের সাক্ষ্যে ডাহা ভুল প্রমাণিত হয়। সে-সময়ে কলকাতায় লেখক-গায়কদের দুটি বিখ্যাত আড্ডা ছিল। একটি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতী-অফিসে, 'ভারতীর আড্ডা', যেখানে আসতেন—অতুলপ্রসাদ সেন, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির ভাদুড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ। অপরটি গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ির 'গজেনদার আড্ডা'। এখানে আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উস্তাদ কারামাতুল্লা খাঁ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ। দুটি আড্ডাতেই যাতায়াত ছিল নজরুলেরও। ওইসব আড্ডাতে নজরুলের তৎপরতা সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮–১৯৬৩) লিখেছেন :

> "নজরুল আসতে লাগলেন মাঝে মাঝে ... ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেই সবাইকে চমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে'! কোন দিকে দৃকপাত না করে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করেন টেবিল হারমোনিয়ামটাকে, তারপর মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গাইতে থাকেন গানের পর গান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে যায়, নজরুলের গান আর থামে না। ... কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে ঘর, রাস্তায় জ'মে যেত জনতা। অনেক বড় বড় গায়ক সে ঘরে এসে গান গেয়েছেন, তবু তাঁদের গান শোনবার জন্য অত লোক দাঁড়িয়ে যেত না। কিন্তু নজরুলের গানের ভিতরে নিশ্চয়ই ছিল কোন বিশেষ আকর্ষণী শক্তি। তিনি তখনও নিয়মিতভাবে গান রচনা করে নিজের সুর দিয়ে গাইতে শুরু করেন নি।" *[যাঁদের দেখেছি, দ্বিতীয় পর্ব]*

মহর্ষির প্রপৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১–৭৪) 'লাঙ্গল' অফিসে নজরুলের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (অভিযান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৫৭) এবং নজরুলের গলার সুর সম্পর্কে লিখেছেন :

> "...নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেলো। সে কবিতা পড়লো গান গেয়ে শোনালো। আমিও তাকে গান শোনালাম। কি ভালোই লেগেছিলো নজরুলকে সেই প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাপে। সবল শরীর; ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটি যেন পেয়ালা, কখনো পেয়ালা খালি নেই, প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর।...গলার সুরটি ছিলো খুব ভারী...কিন্তু সেই মোটা গলার সুরে ছিলো যাদু। ঢেউয়ের আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপটার মতো তার গান আছড়ে পড়তো শ্রোতার বুকে।...প্রাণ ছিল তার ঐ হাসির মতোই প্রবল ও দরাজ।...প্রবল হতে সে ভয় পেত না। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসেনি বাংলাদেশে। এমন সহজ গতি, আবেগের আগুন-ভরা কবিতা বাংলা সাহিত্যে বিরল।...'লাঙ্গলে' বের হলো নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। একদিনের মধ্যে 'লাঙ্গল' সব বিক্রি হয়ে গেলো, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপতে হলো। নজরুলের কবিতাই ছিলো 'লাঙ্গলে'র প্রধান আকর্ষণ।' *[রফিকুল ইসলাম রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম/ জীবন ও সৃষ্টি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]*

প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসু তাঁর ১৯৪৪ সালে রচিত ও 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সংকলিত 'নজরুল ইসলাম'-নামক প্রবন্ধে কাজীর গান গাওয়ার আকর্ষণ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে লেখেন :

"কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশি তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা এবং পান দিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা পাঁচসাত ঘণ্টা গান গাওয়ানো কিছুই নয়। গানে তাঁর আন্না নেই ; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হলেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা-ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি প্রেমের উষ্ণতা ছিলো যে আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে-সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে—হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে-বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যেসব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো।" *[লেখাটি ১৯৬৬ সালে ভারবি প্রকাশিত বুদ্ধদেবের 'প্রবন্ধ সংকলন'-এও অন্তর্ভুক্ত হয়]*

এক স্মৃতিচারণায় নজরুলের গলা এবং গাওয়ার আকর্ষণ সম্পর্কে অসাধারণ গায়ক ও বিরল সঙ্গীতগুণী দিলীপকুমার রায় বলেন "কত সভায় এবং চ্যারিটি কনসার্টেই না সে আমাদের গানের পরে এই ভাবের নানা গান গাইত ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ভাঙা গলায়। কিন্তু এমন গাইত যে, ভাঙা গলাকেও ভাঙা মনে হত না আগুন ছুটিয়ে দিত সে। এমন প্রাণোন্মাদী গায়ক কি আর দেখব এ-মনমরা যুগে? সত্যি আমাদের অবাক লাগত ভাবতে ভাঙা গলায়ও কোন জাদুতে কাজী এমন অসম্ভবকে সম্ভব করত দিনের পর দিন—ভাবের ঢলে পাথরের বুকে আলোর ঝর্না বইয়ে।" *[কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিচারণী তর্পণ, দিলীপকুমার রায়, ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রী অরবিন্দ, বাক্‌সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা]*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই স্মৃতিচারণায় দিলীপকুমার রায় সংগীতে নজরুলের অবদান প্রসঙ্গে বলেন : "ওর নানা কবিতা সুন্দর হলেও ওর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে ওর গানেই বলব। এ কথায় ওর অনুরাগীদের ক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথও কি বলেননি যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর গান ? কাজীর সম্বন্ধেও ঐ কথা। আর সেইজন্যেই আমার মনের সঙ্গে ওর মনের সুর পুরোপুরি মিলত এসে এই গানেরই অন্দরমহলে, কবিতার রঙমহলে নয়।"

এই সূত্রেই নজরুলের গানের প্রতি সমকালীন সংগীতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে দিলীপকুমার রায় এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর বেশ মনে ধরেছিল নজরুলের গজলের লঘু রাগসাংগীতিক চাল, যা তাঁর গলায় খেলতোও দারুণ। এই শাস্ত্রীয় সংগীতের রসের বশেই পরে তিনি নজরুলের প্রায় সকল ধরনের গানই গাইতেন। বাংলায় উর্দু গজলের মতো গজল গানের প্রচলন হওয়া ছিল তাঁর খুবই কাম্য একটি বস্তু। নানা প্রসঙ্গে দিলীপ রায় তাঁর এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনও করতেন। তাঁর কামনা ছিল শ্রেষ্ঠ ফার্সি কবিদের গজলের মানের বাংলা গজল। কেননা তাঁর মতে উর্দুতে উচ্চমানের কবি নেই (এ এক অপার বিস্ময়েরই ব্যাপার যে শ্রীরায়ের মতো দিল্লী-লখনৌ-ঘোরা একজন রসপণ্ডিত গালিব-মোমিন-জাওক-জাফরের মতো বিশ্বমানের কালজয়ী গজলিয়াদের রসাবধারণে বঞ্চিত ছিলেন)। যাহোক, নজরুল রচিত গজল এক বিশিষ্ট রূপবন্ধরূপে বাংলা কাব্যসংগীতের আসর মাত করামাত্রই দিলীপ রায় তা নিজের অলংকৃত কণ্ঠে তুলে নিয়ে স্বয়ং এই গানের প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কলকাতায় বহু আসরে তিনি এই নবসংগীত যেমন কণ্ঠকার হিসেবে গেয়ে শুনিয়েছেন, তেমনি এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন ভাষ্যকার হিসেবে। নজরুলের গজলের শুদ্ধরূপে প্রচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্বরলিপি প্রণয়ন এবং তা পত্রপত্রিকায় মুদ্রণের ব্যাপারেও তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন সংগীতপ্রেমী দিলীপকুমার রায়। বাংলা গজল সম্পর্কে তিনি এতোই উৎসাহী ছিলেন যে নিজেও নজরুলের কয়েকটি গজলের স্বরলিপি প্রস্তুত করেন। তাঁর উদ্যোগেই রবীন্দ্র-পরিকরদের মধ্যেও নজরুলসংগীতের চর্চা প্রবেশ পায়—এমনকী রবীন্দ্রনাথের নিজের গানের রূপকার হিসেবে তাঁর সবচেয়ে পছন্দসই শিল্পী সাহানা দেবীকেও নজরুলের গান গাইতে দেখা যায় (এলো ফুলের মহলে ভোমরা গুনগুনিয়ে, নাচে সুনীল দরিয়া আজি দিল-দরিয়া পূর্ণিমা চাঁদ পেয়ে *[মেগাফোন, জেএনজি ৭৬, ১৯৩৩]*)।

১৫

নজরুলসংগীতের সূচনাকালীন অন্যতমা সেনসেশন প্রতিভা সোমের স্বামী বুদ্ধদেব বসুও নজরুলসংগীতকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেননি। ফলে বঙ্গীয় সংস্কৃতির আজকের প্রজন্মেরও পরমপূজ্য এই গুরুর অনেক অর্ধমনস্ক মন্তব্য রদবদল ব্যতিরেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর রচনাবলীতে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নজরুলের গানের চিরন্তন অবমূল্যায়ন করে চলেছে। 'নজরুল ইসলাম'-নামের প্রবন্ধটি বুদ্ধদেব লিখেছিলেন ১৯৪৪ সালে, যেটি সংকলিত হয় তাঁর 'কালের পুতুল' গ্রন্থে এবং ১৯৬৬ সালে অন্তর্ভুক্ত হয় তাঁর ভারবি-প্রকাশিত 'প্রবন্ধ সংকলন'-এ। ধূর্জটিপ্রসাদের মতো সংগীত-লেখক বা সংগীত-চিন্তক না হলেও অতীব সংগীতসচেতন ছিলেন বুদ্ধদেব এবং বাংলা গানের বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাটি সম্পর্কেও ছিলেন যথেষ্ট অবহিত। কবিতার মতো না-হলেও তাঁর অধিকার সংগীতেও সাধারণভাবে সমীহ আদায় করে।

নজরুলসংগীত বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম মন্তব্য এই যে নজরুলের কবিতার চেয়ে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি গানের। এটা যেহেতু কমন-নলেজ বা সাধারণ জ্ঞান, সেহেতু আলোচনার যোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের পরিস্থিতিও অভিন্ন। কবিতার চেয়ে তাঁদের অবদান গানে বেশি বলে আত্মপ্রত্যয়ও তাঁরা দুজনেই ব্যক্ত করেন। শ্রীবসুর যে-মন্তব্য দুটি নিতান্তই ভ্রান্ত, তার একটি হলো 'বীর্যব্যঞ্জক গানে চলতি ভাষায় যাকে স্বদেশী গান বলে—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই তাঁর স্থান হতে পারে।' অর্থাৎ বর্ণিত ক্ষেত্রে ওই দুজনের পরের স্থানটিও নজরুলের হবে কি না তা নিয়েও সংশয় আছে বুদ্ধদেবের। প্রকৃত অবস্থাটি কিন্তু আজ বিপরীত বলেই বোদ্ধামহলে স্বীকৃত—বীররসাত্মক গানের সৌকর্যে, প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যে ও প্রতাপে নজরুলের স্থান নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালসহ সকলেরই আগে। একই রচনায় বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় ভ্রান্ত মন্তব্যটি হল—"বুলবুল ও 'চোখের চাতকে' কিছু কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশি বলা হয় না। আরো বেশি গান যে অনিন্দ্য হয়নি, তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ।" প্রকৃতপক্ষে অনিন্দ্য হয়েছে কেবল 'আরো বেশি গান' নয়, আরও অনেক-অনেক-অনেক বেশি গান। আরও সোজা কথায় বলা যায় যে নজরুলের যতসংখ্যক গান অনিন্দ্য হয়েছে ততসংখ্যক গান দ্বিজেন্দ্র, অতুল অথবা রজনী লেখেনইনি। রুচির দোষহেতু বর্জন করার জন্য নজরুলের একেবারে কম করেও হাজারখানেক গান বেশি আছে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও। একই রচনায় বুদ্ধদেবও বলেছেন, "শোনা যায়, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি—পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এত বেশি গান রচনা করেননি। কথাটা অসম্ভব নয়—শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কম্পানির ফরমাশে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন করে যাচ্ছিলেন—প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামি গান, হাসির গান—সব রকম। সেসব গান বোধ হয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা অনেকে জানি না।" বস্তুত সুবিপুল সংখ্যক গানেই নজরুল তাঁর রুচির দোষ অতিক্রম করতে পেরেছেন। অবশ্য বুদ্ধদেবও নজরুলের রুচির দোষকে 'অনতিক্রম্য' বলেননি, বলেছেন 'দুরতিক্রম্য'। একই রচনায় বুদ্ধদেবের তৃতীয় ভ্রান্ত মন্তব্যটি হল—কালের কণ্ঠে নজরুল গানের যে-মালা পরিয়েছেন সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়। বাস্তবিকপক্ষে, অক্ষয় সে-মালাটি ছোটো নয়—বিস্ময়কররকম বড়ো, বিপুলসংখ্যক বিচিত্র ফুল দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁথা। কথাটি বুদ্ধদেব তাঁর ইংরেজী রচনায়ও লিখেছেন—What if the garland is small, Time will wear it. বাংলা রচনাটি থেকে পূর্ণতর উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> 'নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই করে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনাপূর্ণ। সে-কবি শুধুই বীররসের নন, আদি রসের পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, এমন কি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর। 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা সর্বহারার কবি হিশেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানি না, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়।' *[প্রাগুক্ত]*

এ রকমের কথাবার্তায় স্ববিরোধিতার 'দোষ'ও লক্ষণীয়। রচনাটির প্রথম অংশ বলে, 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক' পুস্তকের গানগুলির বাইরে নজরুলের অনিন্দ্য রচনা নেই। একই রচনার শেষাংশ বলে নজরুলের অনিন্দ্য রচনা তাঁর সমগ্র গান থেকে বাছাই করা চলে। বাকচতুর ভাষায় বলা আগা-মাথার মিলহীন এই সব কথা থেকে মনে হয় নজরুলের গানকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেননি বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেব বসুর Modern Bengali Poetry and Nazrul Islam প্রবন্ধটির বিষয় নজরুলের কাব্যকৃতি হলেও লেখক তাঁর সংগীতকৃতি সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন—'Though only half-way to heaven, the songs of Nazrul, carefully selected, will serve, more than any other of his work, to convince us of his essential validity.' এ-প্রবন্ধেও বুদ্ধদেবের স্ববিরোধিতাসহ মন্তব্যসমূহ একই রকম। 'a small number of his songs is perfect' বলে স্বীকার করে নিয়ে নজরুলের সমগ্র সংগীতকর্মকেই half-way to heaven বলা অসঙ্গত।

'Modern Bengali Music and Nazrul Islam' বুদ্ধদেব বসুর আরেকটি নিবন্ধ। এটিতে তিনি লিখেছেন, 'his music has functioned germinally, for without him as a predecessor, the later departures of that brilliant talent, Himangshu Datta Sursagar, would have scarcely been possible.' বুদ্ধদেবের এ-বক্তব্যও সম্পূর্ণ সত্য বহন করে না বরং ভুল কথাও বলে। প্রথমত নজরুল থেকে শ্রীদত্তের ডিপার্চার সার্বভৌম নয়। দ্বিতীয়ত শুধু 'সুরসাগরে'রই নয়, পরবর্তীকালীন আধুনিক সংগীতসৃষ্টির সমগ্র পর্বটিই নজরুল কর্তৃক প্রভাবিত। তাঁরই সুরলহরীঋদ্ধ সমুচ্ছল সুরধারাতেই কিছু অমর সুর যোজনা করেন হিমাংশু দত্ত, সুধীরলাল চক্রবর্তী, শৈলেশ দত্তগুপ্ত প্রমুখ। বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনে সেই ধারাটিকেই সমৃদ্ধতর করেন চল্লিশের দশকে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ চক্রবর্তী ; পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; সত্তরের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশির দশকে অখিলবন্ধু ঘোষ ও জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সারকথা, নানামুখী রাগপ্রধান বাংলা গানের সার্থক সূত্রপাত কাজী নজরুল ইসলামের হাতেই ঘটে বলে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, উস্তাদ চিন্ময় লাহিড়ী ও পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ।

বস্তুতপক্ষে এইসব অন্যমনস্ক অর্ধসত্য কথাবার্তায় মনে হয়—বুদ্ধদেব বসু সংগীতস্রষ্টা কাজী নজরুলকে উপেক্ষণীয় জ্ঞান করেছেন তাঁর অনিন্দ্য গানের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর ধরে নিয়ে। অন্যথায় শ্রীবসু হয়তো বলতে চেয়েছেন যে নজরুলের সকল গান কালজয়ী হবে না। কিন্তু তাও তো সাধারণ জ্ঞানের কথামাত্র। কেননা কোনো কালজয়ী রচকেরই সকল রচনা কালজয়ী হয় না—সে-রচক রবীন্দ্রনাথের মানের হলেও না। মহাকালও সংরক্ষণ করে কেবল অত্যুৎকৃষ্টটুকুই। সেজন্যেই বলা হয়েছে 'The greatness of a man is the greatness of his greatest moments' *[দিলীপকুমার রায়, অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে, 'বাংলা সঙ্গীতের রূপ', সুকুমার রায়, পৃ.৬৩]*। অনধিক পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ী রচনার এন্তেজামে আর এন্তেজারেই জমে যায় অত্যধিক পরিমাণ হ্রস্বস্থায়ী রচনা।

নজরুলসংগীত বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মতো হেভিওয়েট লেখকের কালজয়ী রচনাবলীতে এ ধরনের আমতা-আমতা-করা কথাবার্তা মহাসংগীতকার কাজী নজরুলের অবমূল্যায়নে কালজয়ী অবদান রাখছে। তাই আমার মতো ফেদারওয়েট লেখককে খোলাকথায় এবং বড়গলায় বলতে হচ্ছে যে কালের কষ্টিপাথরে পরানো নজরুলের অক্ষয় গানের মালাটি উপেক্ষণীয় তো নয়ই, ছোটোও নয়, বরং এতো বড় এবং বৈচিত্র্যময় যে বহুমাত্রিক সে-মালাটি গাঁথার ছয় দশক পরে আজ তৃতীয় প্রজন্মের গানের আসরেও নজরুল বসে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই দিওয়ানে-খাসে; যখন কিনা বাংলা কাব্যগীতির অন্য প্রধানগণ পড়ে আছেন ফোকাসের বাইরে, দিওয়ানে-আমে। এ-কারণেই বাংলা গানের ভুবনে আজ নিত্যশ্রুত শব্দবন্ধ শুধু দুটি—রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলসংগীত। সংগীত-গবেষক করুণাময় গোস্বামী নজরুলের আলোচ্য গানের মালাটিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> 'বিচিত্রভাবের, বৈচিত্র্যময় বাণীগৌরবের, বৈচিত্র্যবহুল সাংগীতিকতার বহুসংখ্যক গানের পুষ্পে গড়া কালের কণ্ঠে দোলানো সেই মালা। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অপর কোন বাঙালি সংগীতরচয়িতা কালের কণ্ঠকে এমন উজ্জ্বল মালিকা দ্বারা সুশোভিত করতে পারেননি।' *[পৃ. ৫২০, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা অ্যাকাডেমী, ঢাকা]*

১৬

সবশেষে নজরুলসংগীত বিষয়ে সংগীতগুণী রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রসঙ্গ। স্বনামধন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগীতলেখক এবং শার্ঙ্গদেব-নামের 'দেশ' পত্রিকার সুবিদিত সংগীতসমালোচক শ্রীমিত্রের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। 'বাংলার গীতকার' প্রকাশ করে জনপ্রিয় 'মিত্রালয়' আর 'বাংলার গীতকার ও বাংলা গানের নানাদিক' প্রকাশ করে পণ্ডিতপ্রিয় 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনালয়। একটা কথা তিনি দুটি পুস্তকেই লিপিবদ্ধ করেছেন, সম্ভবত অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভেবেই—প্রথম বইটির ৯০ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় বইটির ১২৮-২৯ পৃষ্ঠায়। উদ্ধৃতির অযোগ্য বক্তব্যটি এখানে উদ্ধার করছি কেবল বক্তব্যটিকে 'পরিহার্য' ঘোষণা করার জন্য :

> (নজরুল ইসলাম শীর্ষক নিবন্ধের) 'পরিশেষে সত্যভাষণের খাতিরে একটি কথা বলতে হবে। নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুরাগী কোন লেখক সুরকার হিসাবে নজরুলকে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। এমনকি তাঁর মতে স্বদেশী গান রচনায় নজরুলের কৃতিত্ব কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথেরও ওপরে। নজরুলের অত্যন্ত অনুরাগী হয়েও এই ধরনের মন্তব্যকে গ্রহণ করতে আমার প্রবল আপত্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদ আমাদের বর্তমান কাব্যসঙ্গীতকে গড়ে তুলেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। সুরের বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা, গভীরত্ব কোন দিক দিয়েই নজরুলের প্রতিভা এঁদের সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। বস্তুত এঁদের গড়া সঙ্গীতেই নজরুল বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছিলেন। এই দিক থেকেই তাঁকে আমরা একজন বিচিত্র স্রষ্টা বলে অভিনন্দিত করি এবং তাঁর রচনার ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু স্তুতির আতিশয্যে একজনকে প্রাপ্য গৌরব থেকে বঞ্চিত করে অপরকে সমধিক গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়। সমালোচনার প্রকৃত মূল্যই অকুণ্ঠ সত্যভাষণে নতুবা তাকে সমালোচনা বলব না, তা স্তুতিবাদেরই নামান্তর।'

'ওরিয়েন্ট লংম্যান' কর্তৃক ১৯৭০ সালে প্রকাশিত, ১৪ বছরের পরিণততর, রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'উত্তরভারতীয় সঙ্গীত'-শীর্ষক গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে তাঁর বক্তব্য আরও হাস্যকর। বইটির শেষ অধ্যায়ের উপজীব্য কাব্যসংগীত ও দেশাত্মবোধক গান। রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে লেখক বলেন :

> 'এ বিষয়ে আর-একজন মহান সুরস্রষ্টা ছিলেন ***দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।*** তাঁর ভাবগম্ভীর উদ্দীপনাপূর্ণ গানগুলি আজও দৃষ্টান্তস্থল হয়ে বিরাজ করছে। আরও পরবর্তী কালে ***রজনীকান্ত সেন*** এবং ***অতুলপসাদ সেন*** বহুতর দেশাত্মবোধক এবং কাব্যসংগীত রচনা ক'রে বাংলার সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।' *[প্রাগুক্ত, পৃ.১০২]*

শেষ সেকশনটি শেষ হয়েছে বঙ্গের উদ্দীপনী সংগীতস্রষ্টাদের সম্বন্ধে এই বলে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীতের রীতি অবলম্বন ক'রে বহু স্বদেশ-সংগীত রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য রীতি প্রয়োগ ক'রে একটি নতুন ধরনের উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। রজনীকান্ত সেন তাঁর স্বকীয়তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শও অনুসরণ করেছিলেন। এইভাবে (কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মনোমোহন বসু, গোবিন্দচন্দ্র রায়, প্রমুখসহ) বহু কবি ও গীতিকারের রচনায় বাংলাদেশে স্বদেশ-সংগীত ব'লে একটি নূতন পর্যায় রচিত হয়েছে বলা যায়।' *[প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭]*

১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত একটি গ্রন্থে অখণ্ড বঙ্গের আন্দোলনজনিত স্বদেশ-সংগীতের কথা এলে তার টানে ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনজনিত স্বদেশ-সংগীতের উল্লেখ না-এসে পারে না, উপরিগত বা ভাসা-ভাসাভাবে হলেও—যে-উদ্দীপনী সংগীতের স্রষ্টা কাজী নজরুল, যাঁর সৃষ্টিতে বিংশ শতকের বিশের দশকের স্বদেশী যুগমানস এককভাবে প্রতিফলিত হয়ে বাংলার জনচিত্তকে অভূতপূর্বরূপে উদ্দীপিত করেছে। এ-দাবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এবং 'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু'কে কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছেন বঙ্গভূমে উদ্দীপনার 'বসন্ত' আনার জন্য, 'নতুন ঢেউ' আনার জন্য।

বক্ষ্যমাণ এই দীর্ঘ নিবন্ধের বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যেশ্বর মিত্রের প্রাগুক্ত গ্রন্থাবলীতে ভেবেচিন্তে-করা নজরুল-সম্পর্কিত অশ্রদ্ধেয় বক্তব্যসমূহের ওপর আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। দুঃখ শুধু এই যে এ-ধরনের গ্রন্থিত ফাঁদে পড়তে থাকবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের পাঠক আর ব্যথা পেতে থাকবেন চিরব্যথী 'দুখু মিয়া'। পত্রপত্রিকায় ব্যক্ত শ্রীমিত্রের পরবর্তীকালীন নজরুল-মূল্যায়নের কিছু ইতিধর্মী উদ্ধৃতি নজরুল-গবেষকগণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু ওসব অস্থায়ী পত্রিকার মূল্যায়ন—ভারততাত্ত্বিক বিশেষিত রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতো বহুল উদ্ধৃত সংগীতব্যক্তিত্বের স্থায়ী গ্রন্থের অবমূল্যায়নের প্রতিষেধক হতে পারে না।

আসলে বড়লোকের অবহেলা থেকে বাঁচাতে হলে জনগণের নজরুলকে বড়লোকের মেলা থেকে বের করে ফেলা প্রয়োজন। সংগীতশিল্পী নজরুল ছিলেনও জনতার মিছিলে—গান লিখতেন মজলিশে বসে, সুর করতেন রিহার্সেলরুমের কোলাহলে, গান গাইতেন জনগণের সভায়, আর বন্ধুমহলের জলসায়। তেমনি তাঁর নিজস্ব জলসাঘরে একক আসরই জমুক কাজী নজরুল ইসলামের। বাইশ বছরের সরব আর চৌত্রিশ বছরের নীরব কবির একান্ত আপনার সে-আসরে শীর্ষসংগীতস্বরূপ বাজুক—'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি ?'। দলে থাকলে অনর্থক তুলনা চলতেই থাকবে—আম ভাল না জাম ভাল, তালগাছ মহৎ না বটগাছ মহৎ। বাস্তবেও তিনি পাঁচের ভেতরে এক ছিলেন না, ছিলেন একের ভেতরে পাঁচ। সেদিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পঞ্চপ্রদীপের অন্যতম প্রদীপও নন—বরং লণ্ঠনই নন, তিনি ঝাড়লণ্ঠন। নজরুলসংগীত বহুশাখী, যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি শাখাকেই মহত্তম ভাবা যেতে পারে—জাগরণী, গজলধর্মী, হিন্দুয়ানী ভক্তিমূলক, মুসলমানী ভক্তিমূলক, ধ্রুপদী আধুনিক, রাগসুররঞ্জিত লোকসংগীত এবং 'অকৃত্রিম রাগপ্রধান' (অর্থাৎ কৃত্রিম তানবাজি-সংবলিত সুরপ্রস্তারবর্জিত রাগসংগীত)। ভাবের, শব্দের, সুরের, ছন্দের, মেজাজের, পরিবেশের বহুমাত্রিকতায় বাংলার সংগীতভুবনে নজরুল একাই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা সংগীতসভা। শ্রদ্ধেয় নজরুল-গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামও সম্ভবত এ-কথাই বলতে চেয়েছেন প্রকারান্তরে :

> 'আধুনিক বাংলা গানে বিষয় সুর ও আঙ্গিকের যে বৈচিত্র্য তা বাংলার ভেতর ও বাইরের উপাদানের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ আর নজরুল সঙ্গীত হচ্ছে বাংলা গানের অণুবিশ্ব, বাংলা সঙ্গীতের সমস্ত ধারা নজরুল সঙ্গীতে মিলিত হয়েছে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র ফি ক আ জা দ

মৌলবীর দৌড় ভালো লাগে

মৌলবী দৌড়ায় রোজ—মৌলবীও তো হাঁটে,
দৌড় ও হাঁটার মাঝামাঝি, দেখি, হাঁটে বা দৌড়ায়!
মৌলবী কেন বা হাঁটে—মৌলবী দৌড়ায়—
মৌলবীর মধুমেহ কিংবা হৃদরোগ?
কেন কেউ জানে না তা—কারু কি জানার কথা নয়!
মৌলবী নিঃসঙ্গ অতি, ব্যতিক্রমী—সংঘ নেই তার;
মৌলবী একাকী হাঁটে—সঙ্গীহীন, সামাজিক নয়!
প্রাতিস্বিক, উর্ধ্বমুখ—তিন কুলে কেউ নেই তার;
মৌলবী একাকী হাঁটে—হেঁটে বড় সুখ তার পথে—
মৌলবীর হাঁটাহাঁটি, মৌলবীর দৌড় ভালো লাগে,
হাঁটে সে প্রত্যেক দিন—হাঁটায়ও আছে এবাদত—
বস্তু আছে যথোচিত, চরিত্রেও বাড়াবাড়ি নেই—
নিঃসঙ্গ মৌলবী হাঁটে—উন নয় মেধায়-মননে।

০২.

হাঁটে তো এখানে সব
মধ্যবয়সীর দল—নারী বা পরুষ;
হাঁটা শুধু সুখানন্দে হাঁটা নয় মোটে,
তনু বা দেহের স্বেদ ঝরানোই মুখ্য—
ঝরে যায় ঘাম-নুন সুরভিত সব
নরনারীদের; জীবনে সফলকাম
আমলা বা ব্যবসায়ী ঝরাতে লেগেছে
স্বেদ; এই স্বেদ ঝরানোই মূল কথা!
মৌলবীর দোষ নেই—চায় স্বাস্থ্য মেধাবী মৌলবী;
কে না চায়, বলো?—সুখী গৃহকোণে-থাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্‌বাকুম গৃহবধু কিংবা কোনো অসুখী মানুষ
আরো ক'টা দিন যদি গুজরায় দৌড়ে কিংবা হেঁটে—
মেদে ও লাবণ্যে লীন ঋণখেলাপির
গর্বিত স্ত্রীরত্নধন বিহ্বল বিকেলে লেক্‌পাড়ে
ওয়াকওয়ে ধরে বিষণ্ন বদনে হাঁটে—
যদি আরো ক'টি দিন স্বামীল সোহাগে
বেঁচে থাকা যায়!—হায়, শ্রুতকীর্তি স্বামীর আদর
ক'দিনই বা ভাগ্যে আছে তার!
ঋণটি খেলাপ করে মন্ত্রিত্বের গদি
বাগানোতে ব্যস্ত স্বামীরত্নধন যদি
ব্যর্থ-মনস্কাম হন, তবে তো সকলই
গরলেই ভেল!—এই ভেবে আরো জোরে
হাঁটেন মোহিনী নারী;—কিন্তু আমাদের
মোলবী বিষণ্ন কেন, তবে কি মৌলবী
ঋণখেলাপীর দলে লিখেয়েছে নাম
ইতোমধ্যে?—তা কী করে হয়
আমাদের এই মৌলবীটি অন্যরকমের বটে—
মৌলবীর দৌড় ওয়াকওয়ে কোথে পায়
আলাদা মর্যাদা লোকারণ্য লেক্‌পাড়ে!
মৌলবীর হাঁটাহাঁটি, মৌলবীর দৌড় ভালো লাগে,
মৌলবী দৌড়ায়, হাঁটে—ভবিতব্যহীন
ইহজগতের সবে, বিহ্বল বিকেলে
অন্য সব সুখী-দুঃখী নগরবাসীর মতো, একা...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি র্ম লে ন্দু গু ণ

মাগরিবের নিঃসঙ্গ আজান

সাওয়ালের চাঁদ নবজাতকের মতো
ভূমিষ্ঠ হয়েছে কাল জননী-আকাশে।
কাল সন্ধ্যায় আমরা দু'চোখ মেলে
দেখেছি সে চন্দ্রধৌত পবিত্র আকাশ।

রমজান শেষে আজ ঈদুল ফিতর।
আজ গায়ে-গায়ে নববস্ত্র
চোখে-মুখে হাসি।
ঘরে-ঘরে ফিরনি-সেমাই, জর্দা;
আজ রেস্তোরার কালো পর্দা উধাও।
আজ প্রকাশ্যে, রাস্তায় ধুমপান ...।

আজ কিশোরীর হাতে-পায়ে-গায়ে
মেহেদির ট্যাটু, ঠোঁটে লিপস্টিক,
আনন্দে চঞ্চল আঁখিতারা।
দীর্ঘ অপেক্ষার শেষ আজ
বাহারি-বর্ণিল ঈদকার্ডে মোড়া
প্রেমিকের প্রেমপত্র প্রেমিকার হাতে।

AMARBOI.COM

পথ-মোড়ে, পাড়া-মহল্লায় আজ
আইয়ুব বাচ্চু ও মমতাজের গান।

আনন্দের উচ্চকণ্ঠরোলের ভিতরে
ইফতারহীন এই নির্জন সন্ধ্যায়,
হঠাৎ আমার কানে ভেসে আসে
মাগরিবের নিঃসঙ্গ আজান—
'আল্লাহ হুআকবর'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ন্যাসীরা গাজন থামা

কে যেন বলে : গান গাবো হে,
সন্ন্যাসীরা গাজন থামা!
তোদের সুরে মন ভরে না,
ফক্কা নাচে রঙিন জামা।

রাখ্ তো বাপু ভয়-দেখানো
তত্ত্বভরা এ-বুজরুকি!
নাচার শ্রোতা ঠকছে বড়ো—
দিতেই হবে সে-ভুর্তকি।

তুলছে খাঁটি গানের দাবি
আমির থেকে খঞ্জ-নুলো;
এবার তোরা সব খোয়াবি—
লোটার সাথে কমণ্ডলু।

লাভ কি টেকো বাড়বে না হে,
মলিন জটা, উটকো দাড়ি
তাই বলি কী : ছাঁটাই ভালো,
তার আগে তো উকুন ঝাড়ি!

লাফিয়ে শেষে ক্লান্ত দেহে
ফড়িং ভাবে পাতায় বসে :
ফল্গুধারা মাটিতে বয়,
বৃক্ষ বাঁচে মূলের রসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসির আহমেদ

শব্দভাষ্য

অক্ষরেরা পরস্পর চোখ ঠারে অর্থবহ আভাসে-ইঙ্গিতে
শব্দগুলো পরস্পর কথা কয় মানুষের মূর্খতা জানিয়ে দিতে
এবং দেখিয়ে দিতে কী রকম অন্ধরা শাসন করে আলোর জগৎ
কী রকম অবিশ্বাস্য মিশে যাচ্ছে অগম্য জঙ্গল-রাজপথ!

শব্দদের সন্তানেরা অথবা তাদেরও বংশধর
দৃশ্যত নীরবে আজ মুদ্রণশিল্পের সাজ-সজ্জার ভিতর
অশ্রুত ভাষায় কথা বলে মানুষের ব্যর্থ উদ্ভাবনা নিয়ে
তারা যে রচনা করে অন্ধকার দিয়ে
কত ইনিয়ে বিনিয়ে
স্বৈরশাসকের মতো সাফল্যের রকমারি আলো!
এই দৃশ্যে ক্লান্ত শব্দ হতাশায় বলে : চলো সেই ভাষায়
চলে যাই সরল শিশুর মতো নিপীড়িত নিসর্গের কাছে
এখন কবিতা ছেড়ে জল ঢালি চারাদের সেবা শুশ্রূষায়
নিসর্গেও মানবতা আছে
এখন যা নেই এই রাষ্ট্র-জনপদ লোকালয়ে

অক্ষর ও শব্দেরা তাই শব্দহীন কথা বলে খুব ভয়ে ভয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শি হা ব স র কা র

প্রহরচিত্র

ভোরের রৌদ্রে মুখ ধুয়েছি
পাহাড়চূড়ার উপাসনাঘরে দিনসূচনার শ্লোক
জল্লাদ ও ভিখিরি মন্ত্র পড়ে, মুখের ওপর
খেলা করে জ্যোতি
ভোরবেলা পৃথিবীর মৃত কুঁড়িরা পরিপূর্ণ ফুল
পাখির কলরব পবিত্র বাগানে।
শতাব্দীর খরা থেকে জেগে উঠে লুপ্ত নদী টলটল
ভোরের মানুষ দুপুরে ভস্ম, বালুঝড়ে পথিক দিশাহারা
দুপুরের কাকেরা যেন সব দিব্য পায়রা
চৈত্রের জানালায় বিষণ্ন নিঝুম কিশোরী দাঁড়ানো
তাই দেখে পিশাচ কেঁপে যায় গাছের আড়ালে,
কে বলে ভোর, শান্তির কোরাস শুরু থেকে দুপুরবেলা
যদিও এ প্রহরে ব্যস্ত মহল্লা পুড়ে যায়
রাস্তায় দমকল দেখে পাগল খুশিতে আটখানা।
ছুরি শানানো শুরু হয়ে গেছে দুপুরে চিলেকোঠায়
পরো শুভ্র জামা, সৌরভ মাখো
শহরে জমজমাট আনন্দমেলা, ছাদে তিন তরুণী
কী নিয়ে কানাকানি করে...
এমন বিকেলে সব ঘর কারাগার
হাতকড়া ভাঙো, ছিঁড়ে ফ্যালো শিকল
কিছু একটা ঘটে যাবে
আততায়ীর পিছুপিছু গোয়েন্দা ঢুকেছে পার্কে।
সন্ধ্যার পর পৃথিবীর সব নারী প্রহেলিকা
রহস্যভেদে ব্যর্থ, রক্তাক্ত পুরুষ ঢুকেছে পানশালায়
গুপ্ত কুঠুরির গুপ্ত সিঁড়ি বেয়ে কতদূর নামা যায়?
কেউ কেউ নামে, কেউ শুধু ভূতপ্রেত দ্যাখে
মধ্যরাতে বাড়ির দরজায় হঠাৎ কড়া নাড়া
জীবনের কাঁথায় আগুন দিয়ে মাতাল ঘোরে রাস্তায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা জ লে ন্দু দে

একটি নিঃসঙ্গ গাছ

Vladimir : we are no longer alone, waiting for the night,
waiting for Godot, waiting for ... waiting.
—'Waiting for Godot', Samuel Beckett.

একটি নিঃসঙ্গ গাছ মাথা নাড়ে তাপদগ্ধ শ্মশানের পাশে।
ছিন্নমূল মানুষেরা এখনো প্রতীক্ষারত গাছের ছায়ায়—
হয়তো-বা আজ তিনি আসবেন। মাঠেঘাটে, বিবর্ণ আকাশে
ধীরে-ধীরে রাত্রি নামে। পাতা ঝরে পুরনো রাস্তায়।

ওদের সংলাপ ফাঁপা, এলোমেলো আর অর্থহীন।
লাকি বোবা হয়ে গেছে—পোজো অন্ধ। আমরা সতত
ধ্বংসস্তূপে আলো খুঁজি—মাটি ও বৃক্ষের কাছে আমাদের ঋণ
ভুলে গিয়ে পরিচিত এই বৃত্তে বসে আছি অভ্যাসবশত।

দুই তস্করের গল্প সময় এখনো বলে যায়
আমাদের কানে কানে। অশরীরী পদচ্ছায়া ভাসে।
বিবর্ণ গাছের ডালে এখনো নতুন পাতা যেহেতু গজায়—
অতএব, অর্থহীন নয় সব। চৌদিকে মুখোশ হাসে—

ফিরে আসে গতকাল। আমরা কোথায় তবে যাব?
একটা বিরাট চাকা কেবলি ঘুরছে অবিরত
শন-শন-শন-শন। কূটচালে বিশ্বাস হারাব
অতটা নির্বোধ নই। যদিও বুকের মধ্যে কী বিশাল ক্ষত
রয়ে গেছে তোমরা জানো না। বালকই কথাটা বলে আর
প্রতীক্ষাজনিত ক্লান্তি দেহে-মনে—চারপাশে অস্তিত্বের তীব্র হাহাকার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই ক বা ল আ জি জ

মৃত্যু আর জীবনের কাব্য

মনে হয় মরে গেছি মনে হয় জেগে আছি আমি
গভীর বৃষ্টির জলে ভিজে শীতলক্ষা নদী থেকে
ধীরে ধীরে বুড়িগঙ্গা নদীর শরীরে।
ভেসে আছি ছিন্নভিন্ন দেহ সুগভীর ব্যথা নিয়ে—
অতি সূক্ষ্ম জেনেটিক বার্তা জলের গভীরে
মহাবিশ্বে ছড়িয়েছে প্রাণ থরে থরে;
মনে হয় ঘুমিয়েছি ঠিক গতকাল—
মনে হয় মরে গেছি মনে হয় জেগে আছি চিরকাল।

ধরো অনেকবছর এইভাবে মরে আছি আমি
আশ্চর্য অদৃশ্য কত মায়াজাল বুনে বুনে ছড়িয়েছি
জীবনের রহস্যআনন্দ
বুঝিনি কখনো তার কোনো আলোড়ন
ধরো অনেক বছর এইভাবে মরে আছি আমি
বেঁচে আছি সংসারে—কার সংসারে?
কত দায়িত্বের বোঝা সাহিত্যের তৃষ্ণা
দর্শন ও রাজনীতি শুধু আমারই ঘাড়ে।
আমি যাব কতদূরে?
অবশেষে ফিরে চলে বহুপথ ঘুরে
আত্রাই নদীর তীর ঘেঁষে সুদূর বকুলপুরে।
শিমুলের তুলো কত দল বেঁধে ওড়ে
বালুঝড় ঝিরিঝিরি হৃদয়ের নদী
দুঃখের কান্না যেন বয় নিরবধি।

অনেক বছর আগে মরে গেছি আমি সেই কবে
বঙ্গভঙ্গ মনে পড়ে...
বিভূতিভূষণ তার বনগাঁও ইছামতি আরো কত ঘরে
অনিশ্চিত দিনরাত্রি পড়েছিল ঝ'রে।
এই উপমহাদেশ কবে শান্তি আর সুখ নিয়ে
আশ্চর্য অভিন্ন এক স্বর্গরাজ্য হবে?
হিংসা ও শোষণের দিন কবে শেষ হবে?
আমি সেই স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি বহুকাল ধ'রে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এ চেতনার মেঘঝড় বেদনায়
সেইদিন কত ফুল পড়েছিল ঝ'রে।

জীবন ও মৃত্যু দুই ভাই চিরকাল খেলা করে
আমার জীবন নিয়ে—
মিন্টুরোড থেকে আমি এসেছি বেইলি রোডে বারবার;
ঘুমন্ত পঙ্গপালের মতো বহুতল বাড়িগুলি
আমার স্বপ্নের মধ্যে পুড়ে ছারখার।
কার যেন হাত ধ'রে বাড়িগুলি পুনরায় গ'ড়ে ওঠে—
আমিও বেইলি রোড থেকে ফিরে আসি আবার এ মিন্টুরোডে।
এইভাবে স্বপ্ন আর বাস্তবতা জীবনের গভীর বিবর্তনের
নীল গান গায়—
আমি যেন বহুকাল আগে মরে গেছি
আমার জীবন জেগে উঠে বয়ে যায়
ঝ'রে যায় বহুদূরে রক্তিম ঝর্নাধারায়।

এই মৌচাকবাজার মালিবাগ ও কমলাপুরে
কারা যেন অবিকল আমারই মতো
জেগে উঠে বারবার শুধু মরে যায়—
মরে গিয়ে গান গায়।
হয়তো বা ছিল একদিন বড় বেশি সুখ
হয়তো দুঃখ—
অথবা আমিই একা কেঁদে ভাসিয়েছি বুক।
নৈরাজ্যের কোনো এক আশ্চর্য দর্শন জেগে থাকে রাতে;
অবশেষে ফিরে যায় তারা শূন্য হাতে।
শুধু অন্ধকারে একা জেগে আছি আমি
জানি সবাই আমার বিপরীতগামী।

এই এক ভিন্নযাত্রা সেই কবে থেকে—
মনে হয় মরে গেছি আমি ঘোর তমসায়;
মনে হয় বেঁচে আছি আমি
আশ্চর্য জটিল কুয়াশায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রে জা উ দ্দি ন স্টা লি ন

মুসা ও ফেরাউনের গল্প

মুসা তাঁর সহচরদের নিয়ে
পালিয়ে যেতে চাইল অন্যত্র
আর বুড়িগঙ্গার তীরে গিয়ে
তার সেই বিখ্যাত লাঠি দিয়ে
পানিতে আঘাত করতেই
বুড়িগঙ্গা ভরাট হয়ে কংক্রিটের
রাস্তা হয়ে গেল এবং
আশেপাশে সুরম্য ঘরবাড়ি গাছপালা ইত্যাদি

ওদিকে ফেরাউন সংবাদমতে
তার লোকলস্কর নিয়ে রিকশা ছুটিয়ে এসে দেখল
মুসা সদলবলে পালিয়ে যাচ্ছে নগরের বাইরে
ফেরাউন বুদ্ধি করে ভরাট নদী ভেঙে আবার
পানির স্রোত বইয়ে দিল
মুসা যেনো আর না ফিরতে পারে

হা-হতোস্মি এত পরিশ্রমের পর ফেরাউনের
মনে পড়ল মুসার বিখ্যাত লাঠির কথা
মুসা লাঠি দিয়ে আঘাত করলেই আবার
নদী ভরাট হয়ে কংক্রিটের রাস্তা হয়ে যাবে
এবং সুরম্য ঘরবাড়ি গাছপালা ইত্যাদি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ হী দু ল জ হি র

কার্তিকের হিমে, জ্যোৎস্নায়

তবু এটা ফৈজুদ্দিনের গল্প। অথবা কার?

ফৈজুদ্দিন হচ্ছে ফজু, সুহাসিনী গ্রামের ছোট অথবা ভূমিহীন কৃষক, হয়তো ক্ষেতমজুরই; ফলে সে গরিব এবং স্বাস্থ্যহীন রোগা টিঙটিঙা, হয়তো সে কিঞ্চিৎ একজন 'পিপুফিশু', অর্থাৎ অলস—এবং সে-কারণেই সে হয়তো ছিল একজন দার্শনিক। তার স্ত্রীর নাম গুলনেহার; গরিব হলেও তার শ্বশুর, ব্যাঙনাই কিংবা চান্দাইকোনা কিংবা ধনকুন্তি গ্রামের ছোট কৃষক কিংবা ভূমিহীন আরেক ক্ষেতমজুর মহির সরকার, তার সঙ্গে গুলনেহারের বিয়া দেয়—ঘরে মেয়ে থাকলে বিয়া দেওয়াই লাগে। তখন বিয়ার ফান্দে আটকায়া-যাওয়া দার্শনিক ফজুকে অনেক কথা বলতে হয়, সে তার তরুণী স্ত্রী গুলনেহারকে বোঝায়, এত কাম হইর‍্যা কি আমি জমিদার হমানে, সে বলে। ফলে কোনো এক গরমকালে সে তার ভিটার সামনের দিকে বিচিকলা গাছের ঝোপের পাশে খোলা আকাশের তলায় একটা বাঁশের মাচান বানায় এবং তখন গ্রামের যারা দ্যাখে, তারা তাকে যদি প্রশ্ন করে, যদি বলে, কী করবা মাচান বানায়া, সে উত্তর দেয়, শুয়্যা থাকমু বাপু!

তারপর হয়তো গ্রীষ্ম এবং বর্ষা যায় এবং কার্তিকের শেষে প্রকৃতি শীতল ও শুকনা হয়া আসে, বাতাস দিক বদলায়া উত্তর থেকে এলোমেলো হয়া বইতে শুরু করে, উঠানের ধুলা সন্ধ্যার কুয়াশার সঙ্গে গাঢ় হয়া থাকে—তখন সুহাসিনীর মিঞাবাড়ির আব্দুল কাদের মিঞা তার ভিটায় কাচারিঘরের বারান্দায় যায়া বসে এবং দ্যাখে যে, ফজু দূরে বাঁশের মাচানের উপর শুয়ে ঘুম পাড়ে। তখন কার্তিকের এই দিনে বুড়া আব্দুল কাদের মিঞার মাথায় অনেক চিন্তা ফালাফালি করে, হয়তো স্মৃতিও, কারণ বার্ধক্য হচ্ছে একটা বান্ডিল, স্মৃতির। তখন মিঞাবাড়ির সামনে চকনুরের দিগন্তজোড়া মাঠে সবুজ রোপা আমনের খেলা, অথবা, হয়তো তারও পর, অগ্রহায়ণের কালে শীত আরো কাছে এসে গেলে মাঠের ধানেরা যখন পেকে ওঠে, সোনালি রং ধরে কাত হয়া থাকে, তখন মাঠের ভিতর থেকে ফজুর বৌ গুলনেহার শাড়ির কোঁচড়ে জংলাশাক তুলে আনে; আব্দুল কাদের দ্যাখে এবং তার মনে হয়, এইটা কে, ফজুর বৌ না? হয়তো হেলেঞ্চা, থানকুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা খুইরা ডাঁটাশাক দিয়া ভাত খায়া ফজুর এই বৌ, গুলনেহার, তার স্তন এবং নিতম্ব এবং জঙ্ঘা ফুলায়া ফালায়, এবং কার্তিকের কিংবা হেমন্তের মরা বিকালে আব্দুল কাদের মিঞা তার দিকে তাকায়া বিষণ্ন হয়া থাকে। তখন আব্দুল কাদের মিঞা হয়তো গুলনেহারকে ডাকে, কাচারিঘরের বারান্দায় কাঠের হাতলঅলা চেয়ারে বসে ফলের ভারে নুয়ে পড়া সোনার শলার মতো ধানগাছের দিকে সে তাকায়া থাকে, একটা পা উঁচা করে চেয়ারের উপর তুলে পায়ের পাতার বিখাউজ চুলকায়া রক্ত বের করে ফালায়—এইসকল ধান, এই মাঠ এবং জমি, মাঠের উপরকার দিগন্তছোঁয়া ঘোলাটে আকাশ তারই। সে শাদা পাঞ্জাবির ভিতর থেকে তার ডাইন হাত বের করে গুলনেহারের দিকে বিস্তৃত করে দেয়, মনে হয় পুরানো জামরুল গাছের একটা ছাতা-পড়া ডাল সে উঁচা করে ধরে।

কিন্তু তখন ফৈজুদ্দিনকে দেখা যায়। আইজ্জল প্রামাণিকের ভিটার এক মাথায় সে তার বৌ নিয়া একটা ভাঙাচোরা খড়ের কুঁড়েঘরের মধ্যে বাস করে, তাদের ঘরের চালের ছন অথবা খড় গলে পচে ঝরে যায়, পাটখড়ির বেড়া হাঁ হয়া থাকে; তার জমি নাই, কাজ নাই, প্যাটে ভাত নাই, তবু গুলনেহারের শরীর নিয়ম মানে না। আব্দুল কাদের মিঞা হয়তো তার কাচারিঘরের বারান্দায় বসে ফজুকে ভিটা থেকে নেমে যেতে দ্যাখে, হয়তো ফজু এমনি হাঁটতে বের হয়, বাঁশের মাচানের উপর একটা ঘুম দিয়া উঠে হয়তো সে বলে, ইকটু ঘুইর‍্যা আসি, এবং শরীরের হাতাঅলা ময়লা গেঞ্জির উপরে ছেঁড়া গামছা জড়ায়া রাস্তায় নামে, সে হয়তো ভাবে, ধানক্ষেতের মইদ্দে দিয়্যা ইকটু হাঁটি, অথবা হয়তো সেদিন ধানঘড়ার হাটবার ছিল, তার মনে হয়, হাটেই যাই; এবং তখন দূর থেকে আব্দুল কাদের মিঞা তাকে হয়তো দেখে ফালায়। আব্দুল কাদের মিঞা তাকে ডাকে, সে পা-খাউজানি বাদ দিয়া তার ডানহাত তুলে পতাকার মতো দোলায়, দেখে মনে হয় যে, সে রেললাইনের কোনো লেভেলক্রসিঙের গেটম্যান, ছোট লাঠির সঙ্গে বান্ধা একটুকরা শাদা কাপড় উড়ায়া অদেখা কোনো ট্রেন থামানোর চেষ্টা করে, এবং ফৈজুদ্দিন তাকে দেখতে পায়। ফলে ফৈজুদ্দিনের ধানঘড়া যাওয়া হয় না, লম্বা ঢ্যাংগা টিংটিঙ্গা ফজুর রং-জ্বলে-যাওয়া লুঙ্গির নিচে দিয়া খড়ির মতো কালা ঠ্যাং বের হয়া থাকে, সে রাস্তার ধুলা বাঁচায়া বকের মতো পাও ফালায়া মিঞাবাড়ির ভিটার কাছে এসে খাড়ায়া জিজ্ঞাস করে, দাদামিঞ্যা, ডাইকছেন?

আব্দুল কাদের মিঞা হয়তো তাকে হাত নেড়ে ডেকেছিল, ফলে সে বলে, ফজু, কৈইন থেইক্যা আইলি?

ফজু কাচারিঘরের বারান্দায় উঠে আব্দুল কাদেরের পায়ের কাছ মাটির মেঝেতে পায়ের পাতার উপরে কুত্তার মতো বসে, তখন আব্দুল কাদের মিঞা তাকে বলে যে, এইসকল ধানক্ষেত তার, অথচ এর আইলের উপর দিয়া হাঁটে ফৈজুদ্দিন, এটা ঠিক না, তুই বাপু আমার ধানক্ষেতের আইলের উপুর দিয়্যা হাঁটিস ন্যা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফৈজুদ্দিন তখন আর কী বলবে? তার মনে হয় যে, তা হলে সে হাঁটবে কোথায়? আব্দুল কাদের মিঞা বিষয়টা বিবেচনা করে দ্যাখে, একজন পিপুফিশু হাঁটতে চায় হালটের উপর দিয়া এবং তখন, তারপর, সে হয়তো বলে, আয়, তুই আমার নগে হাঁট!

আব্দুল কাদের মিঞার বড়ছেলে নূরুল হকের বৌ জাহানারা, অথবা মেজোছেলে শাজাহান আলির বৌ আঙ্গুরা কিংবা ছোটছেলে আব্দুল ওহাবের বৌ মনোয়ারা ওরফে মনো বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়া আসে এবং দ্যাখে যে, তার বা তাদের বুড়াশ্বশুর চকনুরের মাঠে পাকা ধানের ভিতর দিয়া ফৈজুদ্দিনের নগে হাঁটে। ফলে, তখন আব্দুল কাদেরের দিকে তাকায়া গুলনেহার খাড়ায়, সে তার কোঁচড়ের ভিতর শাক-পাতা নিয়া শাড়ির খাটো আঁচল দাঁতে কামড়ায়া ধরে ভিটায় ফিরতে যায়া দ্যাখে যে, বুড়া মিঞাসাব তার কাকলাসের মতো শুঁটকা হাত তুলে নাড়ায়, এবং তখন গুলনেহার আগায়া যায়, মিঞাবাড়ির ভিটার নামায় মাথাভাঙা আমগাছের নিচে খাড়ায়া যখন জিজ্ঞাস করে, দাদামিঞ্যা আমাক ডাইকছেন? তখন আব্দুল কাদের মিঞার পাকা দাড়ির ভিতরে দুমড়ায়া-যাওয়া তার মুখ এবং মাথার খুলির ভিতরে ঢুকে-যাওয়া চোখে মনে হয় অস্পষ্ট একটু আলো এসে পড়ে, অথবা হয়তো তা ঠিক না, হয়তো এমন কিছু ঘটে না; তবু তখন তার কাঠের চেয়ারের কাছেই একটা ছোট জলচৌকির উপর পিতলের গুড়গুড়া হুঁক্কা খামিরা তামাক দিয়া সাজায়া দেওয়া ছিল, হয়তো তার ছেলের বৌরা সাজায়া দিয়া গেছিল, কিংবা দিয়া গেছিল তার চাকরেরা, হয়তো সাহেবালি। সে হয়তো এক হাতে হুঁক্কার লম্বা রাবারের নল নিয়া টানে, অন্য হাতে বিখাউজ চুলকায়; ফলে তখন সন্ধ্যার অস্পষ্টতার ভিতর সে গুলনেহারকে দ্যাখে এবং তাকে ডাকে, তার বাম হাত বিখাউজটা চুলকানো বাদ দিয়া দমকা হাওয়ায় এলোমেলোভাবে দুলে ওঠে। সে যখন গুলনেহারকে ভিটার নিচে খাড়ানো দ্যাখে তার মনে হয় যে, সে হয়তো তাকে ডাকে নাই, অথবা ডাকলেও এমনি ডেকেছিল, তবু সে বলে, দ্যাখ তো আমার হুঁক্কার টিক্কাডো নিব্যা গেছে নাহি?

গুলনেহার তখন তার তরুণ শরীর নিয়া বারান্দার উপরে উঠে আসে; তার কোমর, হাঁটু এবং পায়ের অস্থিসন্ধিসমূহ তেল-দেওয়া যন্ত্রের মতো নীরব সাবলীলতায় সঞ্চালিত হয়, ভাঁজ হয় সোজা হয়, মনে হয় একটা বিলাই বুঝি হেঁটে গেল ঘাসের ভিতর দিয়া কোনো ইন্দুরের পিছনে অথবা পানির ভিতর দিয়া কেমন চলে গেল কাঁচা গাব ফল দিয়া মাজা কালা একখান নাউ; গুলনেহার জলচৌকির সামনে যায়া উপুড় হয়া মাটির কলকিটা উঠায়, মুখের কাছে এনে ফুঁ দিয়া টিক্কার আগুন উস্কায়া তোলে, আব্দুল কাদের মিঞা ঘাড় ঘুরায়া তাকায় তার চোখের সামনে আঠারো বছরের মেয়ে অথবা নারী গুলনেহার বিকশিত হয়া থাকে, তখন বুড়াশরীরের ভিতরে আব্দুল কাদের মিঞার জীবন কান্দে, সে বলে, শাগ আর লতাপাতা খায়া দিন কাটাইস?

ফৈজুদ্দিন তখন ক্লান্ত আব্দুল কাদের মিঞাকে ধরে বোকসাবাড়ির পতিত ভিটার কোনায় ধানক্ষেতের পাশে বসায় এবং সে নিজে নিকটে পাকা ধানের ভিতরে যায়া শুয়ে পড়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলসতার ভিতর তার কি ধানের গন্ধে পুনরায় ঘুম এসে যায়? যেতে পারে, কারণ, তখন আব্দুল কাদের মিঞা তাকে যখন ডাকে, তার সাড়া পাওয়া যায় না; আব্দুল কাদের মিঞা তাকে ক্রমাগত ডাকে, ফজু, ফৈজুদ্দি, ডেকে ডেকে সারা হয়, কিন্তু ফৈজুদ্দিন দুই হাত দূরে মড়ার মতো হয়া থাকে, তখন আব্দুল কাদের মিঞা তার পায়ের প্লাস্টিক কিংবা রাবারের একপাটি পামশু খুলে ছুড়ে মারে, বলে, এই হারামযাদা কথা কইস না ক্যা? তুই আমার পাকা ধান নষ্ট করবু!

জুতার বাড়ি খাওয়ার পরও ফৈজুদ্দিন চুপ করে থাকে, তবে সে হাত পা নাড়াচাড়া করে জানায় যে, সে ঘুমায় নাই, তখন আব্দুল কাদের মিঞা সন্ধ্যার আলোয় ধানগাছের ভিতর গাছের গুঁড়ির মতো পড়ে-থাকা বাইশ বছরের টিঙটিঙা ভূমিহীন এবং ফকির ফজুর কালো দেহের দিকে তাকায়া বলে, নু ফিরা যাই।

কিন্তু ফজুর তো কোনো তাড়া নাই, সে পুনরায় কাত হয়া থাকে, তখন আব্দুল কাদের মিঞা তার জুতার ২য় পাটিটা ছোড়ে, হয়তো জুতাটা যায়া ফজুর গায়ে লাগে, কিংবা লাগে না; হয়তো উত্তেজনার কারণে আব্দুল কাদের মিঞা বেশি জোর দিয়া ফালায় এবং জুতাটা উড়ে যায়া কোথায় পড়ে বোঝা যায় না। ফজু দেখে আব্দুল কাদের মিঞার কালা জুতা উড়ে যায়, সে বলে, দাদামিঞ্যা, আপনে যানগা, আইত হৈক, আমি পরে যামানি!

তা হলে ফজু অন্যলোকের ধানক্ষেতের মধ্যে শুয়া গড়াবে, ফলে আব্দুল কাদের মিঞাকে একাই ফিরা যাওয়ার কথা ভাবতে হয়, কিন্তু তখন সে দ্যাখে যে, আগে তার জুতা ফেরত পাওয়া দরকার, তাই সে ফজুকে আবার পাকাধানের ভিতর গড়াগড়ি দিয়া ধান নষ্ট করার জন্য বকে, তারপর তার জুতা ফিরায়া দিতে বলে। তখন ফৈজুদ্দিনের আরাম নষ্ট হয়, তাকে একটু উঁচা হয়া প্রথম ছুড়ে দেওয়া জুতাটা খুঁজে বের করে আগায়া দিতে হয়; কিন্তু অবশ্যই এতে আব্দুল কাদের মিঞার সমস্যার সমাধান হয় না, সে বলে, আর একখান কোনে গেল, বাইর কর।

ফৈজুদ্দিন বের করতে পারে না, এই জুতাটার কোনো হদিস নাই, সে বলে, আপনে একপাটি নিয়্যা যান গা, আরেকখান কাইল বেইন্যা আপনের কামলাগোরে দিয়্যা তালাশ হইর‍্যা বাইর কইরেন!

বুড়া আব্দুল কাদেরের তাতে খুব রাগ হয়, হতেই পারে, সে ফজুকে বলে যে, তার এইসব নবাবি ভালো না একদম, সে কামকাজ না করে বাঁশের মাচান বানায়া শুয়ে থাকে, ঠ্যাঙের উপরে ঠ্যাং তুলে দিয়া নাচায়, এগুলা খুব খারাপ; ফলে তখন তার মাথা গরম হয়া ওঠে, সে ফৈজুদ্দিনের ফিরায়া দেওয়া জুতার পাটিটা পুনরায় ছুড়ে মারে, সেটা কাছেই পড়লে ফজু কুড়ায়া নিয়া আবার আগায়া দেয় এবং বলে, জুতা চেঙ্গাচেঙ্গি হইরেন না বাপু, আবার চেঙ্গা দিলে ফিরায়া দিমুনি না কৈল!

ফৈজুদ্দিন কি তাকে হুমকি দেয়? হয়তো এটা হুমকি না, সেটা সম্ভব না; তবু আব্দুল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাদের মিঞার রাগ আরো বাড়ে, সে তৎক্ষণাৎ জুতাটা ছুড়ে মারে এবং সেটা যায়া আবার ফজুর গায়ে লাগে। তখন ফৈজুদ্দিন আবার চুপ করে থাকে, সে নড়ে না চড়ে না, আব্দুল কাদের মিঞার জুতাও ফিরায়া দেয় না, কাদের মিঞাকেই আবার কথা বলতে হয়, কিরে ফজু জুতা বাইর কইর‍্যা দে!

ফজু চুপ করে থাকে, তারপর আব্দুল কাদের মিঞা আবার গাল পাড়তে শুরু করে, হারামযাদা শুয়ারের বাচ্চা, তোমার গোয়াত ম্যালা ত্যাল জুইমছে, তুমি আমার পাকা ধানের মইদ্দে গড়াগড়ি দিয়্যা ধান নষ্ট কর—উইঠা আয় হারামযাদা!

কিন্তু কেউ উঠে আসে না, তখন কুয়াশার ভিতর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়া আসে, এবং তখন ফৈজুদ্দিন জুতা ফিরায়া দিয়া বলে, এই নেন জুতা, আবার যুদি মারেন, তাইলে ফিরায়া দিমু না, ফিরায়া চাইলে পয়সা দেওয়া নাইগবোনি!

পয়সার ব্যাপারে ফজুর আগ্রহের বিষয়টা আব্দুল কাদের মিঞা খেয়াল করে, ফলে রাগ না করে সে বলে, চ্যাঙ্গা দিয়া ফালাইলে জুতা ফিরায়া দিবি ন্যা, কইস যে, পয়সা দেওয়া নাইগব, কত দেওয়া নাইগব, কয় পয়সা নিবি?

ফৈজুদ্দিন হয়তো ভাবে, অথবা হয়তো কিছু ভাবে না, সে হয়তো কথাটা এমনি বলেছিল, কিন্তু তার পরও আব্দুল কাদের মিঞা জিজ্ঞাস করলে সে বলে, একবার ফিরায়া দিলে পাঁচ ট্যাহা দিবেন।

আব্দুল কাদের বলে, দুই ট্যাহা পাবু, এবং জুতাটা ছুড়ে মারে।

ফলে ফৈজুদ্দিনকে আরাম ত্যাগ করে ফিরায় একটু উঁচা হয়া জুতাটা কুড়ায়া নিয়া ফিরায়া দিতে হয়; তখন আব্দুল কাদের মিঞাকে বুড়া কিন্তু চালাক একটা শিয়ালের মতো লাগে, সে ফেরত-পাওয়া জুতা আবার ফৈজুদ্দিনের গা লক্ষ্য করে ছুড়ে দেয় এবং বলে, দুই বার হইল!

আব্দুল কাদেরের জুতা কুড়ায়া ফৈজুদ্দিন ফিরায়া দিতে থাকে; সেদিন কুয়াশায় শরীর ভিজা যেতে থাকলে আব্দুল কাদের থামে এবং ফজুকে বলে যে, সতেরো বার জুতা কুড়ায়া দেওয়ার জন্য ফজু প্রতিবারের জন্য দুই টাকা করে পাবে, অন্য জুতাটা খুঁজে বের করতে পারলে সে পাবে আরো পাঁচ টাকা। তারপর এক হাতে একপাটি জুতা নিয়া আব্দুল কাদের মিঞা হাঁটা ধরে এবং ধানক্ষেতের মধ্যে তখনো কাত-হয়া-থাকা ফৈজুদ্দিনকে বলে, কত ট্যাহা হয় হিসাব কইর‍্যা কাইল বিয়ানে যায়া ট্যাহা নিয়া আসিস।

কারণ গুলনেহার তখন বারান্দায় উঠে দেখে যে, আব্দুল কাদেরের কাঠের চেয়ারটা পিছনের করোগেটেড টিনের বেড়ার সামনে এমনভাবে পাতা যে, এই চিপার ভিতর দিয়া হুঁক্কা রাখা জলচৌকির কাছে যাওয়া মুশকিল, জায়গা খুব কম; তবু সামনে দিয়া না যায়া সে এখান দিয়াই পার হয়, ফলে তার শাড়ির একটা অংশ আব্দুল কাদের মিঞার ঘাড়ের পিছন দিকটা ছুঁয়ে যায়। তারপর গুলনেহার জলচৌকির সামনে বসে কল্কির আগুনে ফুঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়ে, আব্দুল কাদের মিঞা ঘাড় কাত করে তার দিকে তাকায়, কিন্তু বুড়া ক্লান্ত চোখে মনে হয় বিকালের আবছা আলোয় সে ভালো দ্যাখে না, তখন সে পুনরায় যখন বলে যে, তারা, অর্থাৎ ফৈজুদ্দিন এবং গুলনেহার এইসব লতাপাতা খায়া কীভাবে থাকে, তখন গুলনেহার বলে, থাইকলে থাকা যায়!

আব্দুল কাদের মিঞার মন তখন শূন্যতার এক গর্তের ভিতর যায়া পড়ে, সে তাল ঠিক করতে পারে না, ফলে তার বুকের ভিতর থেকে ঘরঘর শব্দ বের হয় এবং গুলনেহার হুঁক্কার মাথায় কল্কিটা লাগায়া দিয়া তার দিকে তাকায়; তার মনে হয় যে, বুড়া ম্যাসাব কিছু হয়তো বলে, কিন্তু আব্দুল কাদের তো আসলে কিছু বলে না, তার চোখের মণি দুইটা হয়তো কেবল খাঁচায়-আটকা-পড়া শাদা ইন্দুরের মতো নড়াচড়া করে, ছটফটায়—কী কারণে হয়তো তা বোঝা যায় না। কিন্তু গুলনেহারের কল্কির আগুন ঠিক করে দেয়ার এইসব কাজকর্মের বিষয়ে কি বাড়ির অন্য লোকেরা খেয়াল করে না? অবশ্যই করে, এসব বিষয় খেয়াল করাই নিয়ম; তারা হয়তো একদিন/দুইদিন/তিনদিন দ্যাখে, তারপর আর না-দেখার জন্য সাবধান হয়, ফজুর বৌকে আগায়া আসতে দেখলে ছেলের বৌরা হুড়াহুড়ি করে ঘরে যায়া ঢোকে, চাকর কামলারা উধাও হয়া যায়। তখন গুলনেহার জলচৌকির সামনে হাঁটুভাঙা অবস্থা থেকে খাড়া হয়া ফিরতি পথ ধরে, চেয়ারের পিছন দিয়া পার হয়া আসার সময় পুনরায় একই কাণ্ড ঘটে এবং আব্দুল কাদের হাতের মধ্যে গুড়গুড়ার নল নিয়া মনে হয় কেমন হয়া থাকে। তবু গুলনেহার বারান্দার প্রান্তের কাছে যায়া পৌছে, নেমে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়, তখন আব্দুল কাদেরের বুকের ভিতরটা আবার ঘরঘর করে ওঠে, এবার মনে হয় যে, সে সত্যি হয়তো কিছু বলে, কিন্তু তা হয়তো এত দুর্বল ছিল যে, গুলনেহারের কানে তা যায়া পৌছায় না, হয়তো হুঁক্কার নলটা মাটিতে ফালায়া দিয়া সে তার ডান হাতটা গুলনেহারের দিকে প্রসারিত করে দেয়, কিন্তু গুলনেহার তাও দ্যাখে না, কারণ, গুলনেহারের তখন সংসারের জন্য প্রবল ব্যস্ততা, জীবনে তার আছে একটা সংসার : তাড়াতাড়ি ভাঙাঘরে ফিরা যায়া ভাঙা চুলায় ভাঙা মাটির হাঁড়িতে কচুঘেঁচু রান্না করে অন্ধকারের মধ্যে সে ভাঙা ফৈজুদ্দিনের জন্য বসে থাকবে, অথবা ফৈজুদ্দিন হয়তো ঘরেই থাকে গুলনেহারের ফেরার প্রতীক্ষায়; তারপর তারা দুইজনে হয়তো বোতল-কাটা ল্যাম্পুর সামনে যায়া বসে, ফৈজুদ্দিন খায় এবং গুলনেহার দ্যাখে, তারও পর তারা ল্যাম্পু নিবায়া দেয়, তখন তারা কী করে, কী করে গুলনেহার কুঁইড়ার বাদশা ফজুর সঙ্গে? তবে সন্ধ্যা হয়া গেলে হয়তো মিঞাবাড়ির চাকর সাহেবালি খুব সাবধানে এসে বলে, চাচামিঞ্যা, ওটেন বাপু, নন বাড়ির মইদ্দে যাই, অথবা হয়তো নূরুল হকের বৌ চিনির সঙ্গে লবণ মিশায়া সুজি বানায়া এসে আল্লাদি গলায় ডাকে, আব্বা, বাড়ির মইদ্দে আসেন, কিছু খান, এবং তখন মাঠের ভিতর দিয়া একটা গোল চান ওঠে, এবং এই চান্দের আলোয় আব্দুল কাদের হয়তো দ্যাখে যে, দূরে আইজ্জল প্রামাণিকের ভিটার কোনায় বাঁশের মাচানের কাছে কলাগাছের পাতার সঙ্গে মিশা গুলনেহার খাড়ায়া আছে, অথবা হয়তো এটা তার কল্পনা, কারণ, তার বুড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোলাচোখে কি অতদূরে দেখা সম্ভব? ফলে তখন সে হয়তো নূরুল হকের স্ত্রীর সুজি বানায়া আল্লাদ করার বিষয়টা বোঝে না, সে বলে, তুমি যাও, আমি পরে আইসত্যাছি; এবং তখন শ্বশুরের জন্য জাহানারার বানানো সুজি জুড়ায়া ঠাণ্ডা হয়া যায়।

তবে তার প্রাণে হয়তো অস্থিরতা দেখা দেয়, ছেলের বৌয়ের বানানো সুজি সে খায় নাই, কেমন করে সে পারল? তখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আব্দুল কাদের জুমাঘরের দিকে যায়, আজান দেয়, হাই আলাল ফালাহ, হাই আলাল ফালাহ, কল্যাণের জন্য আসো, কল্যাণের জন্য আসো, এবং তারপর মহসিন আলি ইমামের পিছনে খাড়ায়া ফজরের নামাজ পড়ার পর ফিরা আসে; তার মনের চঞ্চলতা দূর হয় এবং উঠানে তার বৈলঅলা খড়মের বলবান খটখট শব্দ সঞ্চারমান হয়। তখন তার মনে হয় যে, ফৈজুদ্দিন তার কাছে টাকার জন্য আসবে, আসা উচিত; সে তার চাকরদের জিজ্ঞাস করে, ছেলে এবং ছেলের বৌদের জিজ্ঞাস করে, কিন্তু ফজুর দেখা নাই—হয়তো ফজু তখন তার জীবনের সবচাইতে বড় সমস্যা নিয়া ব্যস্ত হয়া থাকে। কারণ, অলস লোকদের এই-ই সমস্যা, তারা কিছু করে না, কিছু করতে হলে অস্থির হয়া পড়ে; ফলে ফজুর সামনে পাটীগণিতের এই অঙ্ক সমস্যা হয়া দেখা দেয়—দুই টাকা করে সতেরো বার এবং তার সঙ্গে পাঁচ টাকা যোগ করলে কত টাকা হয়? গুলনেহার শোনে, আব্দুল কাদের মিঞা ফজুর দিকে জুতা ছুড়ে মেরে বলেছে টাকা দেবে, তার মনে হয় যে, বুড়াটা বদমাইশ, কারণ টিঙটিঙা স্বামীর জন্য তার হৃদয়ে মমতার পানি কুলকুল করে, কিন্তু তারপর তার উৎসাহেই ফৈজুদ্দিন হিসাব করতে বসে, তার রাতের ঘুম প্রায় নষ্ট হয়া যায়, অঙ্ক সে মিলাতে পারে না, তার মনে হয় যে, এইগুলা খামাখা ইয়ার্কি! কিন্তু গুলনেহার লেগে থাকে, ফলে ফজু সকালে বোকসাবাড়ির মাঠে যায়া আব্দুল কাদেরের অন্য একপাটি জুতা খুঁজে বের করে আনে। তাতে অনেক পরিশ্রম হয়, রাবারের এই একটা কালা জুতা হাতে নিয়া সে যখন বাড়ি ফিরে তখন রোইদ উঠে গেছে, সে আব্দুল কাদের মিঞার সামনে যায়া জুতাটা ফালায়া দিয়া বলে, ট্যাহা দেন!

কিন্তু ট্যাহা কেউ সহজে দেয় না, আব্দুল কাদের তো নয়ই, সে ফৈজুদ্দিনকে দ্যাখে, তার মুখে ঘাড়ে বগলে ঘাম দেখা যায়, তবে তার মনে হয় ফজুর আরো খাটা উচিত; ফলে সে তাকে বলে যে, টাকা সে পাবে, কিন্তু তাকে বলতে হবে সে কত পাবে। ফৈজুদ্দিন বলতে পারে না, সে বলে, সতর বার দুই ট্যাহা কইর‍্যা দেন, আর দেন পাঁচ ট্যাহা!

আব্দুল কাদের মিঞা দেয় না, সে পুনরায় বলে যে, ফৈজুদ্দিনের বলা লাগবে তার মোট কত পাওনা হয়েছে, কিন্তু ফজুর তা বলতে পারার প্রশ্ন ওঠে না; তখন সে বাড়িতে যায়া মাচানের উপরে শুয়ে থাকে, ফলে তখন গুলনেহার আসে এবং সে তাকে বলে যে, ফৈজুদ্দিন স্কুলে পড়ুয়া কোনো চ্যাংড়াপেংড়াকে যায়া জিজ্ঞাস করলেই তো পারে। তখন ফৈজুদ্দিন স্কুলপড়ুয়া কোনো বালক/বালিকার তালাশে বের হয়, সে প্রথমে তার চাচাতো ভাই, আইজ্জল প্রামাণিকের ছেলে আমির হোসেনকে খোঁজে, সে বাড়ি নাই, জ্যোতিকে খোঁজে, জ্যোতিও নাই; দৌড়াদৌড়ি করে ফজু পুনরায় ঘেমে যায়, কিন্তু ততক্ষণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো তার মনে হয় যে, আব্দুল কাদের মিঞাকে এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না, শালার ব্যাটা শালা তুমি আমার নগে হারামিপনা করো, মনে কইরছো যে, ফজু তো আরাম কইরব্যার চায়, ট্যাহা চায় না, তোমার চালাকি আমি বুজি ন্যা? ফলে ফজু কোনাইবাড়ির কাছে প্রাইমারি স্কুলে যায়া লেবু মাস্টারকে ধরে, এবং লেবু মাস্টার তাকে বলে দেয় যে, সে মোট উনচল্লিশ টাকা পাবে। তখন ফজু পুনরায় আব্দুল কাদের মিঞার সামনে যায়া খাড়ায়, এবং সে বাড়ির ভিতর যায়া উনচল্লিশ টাকা এনে ফজুকে দেয়; ফজু ধানঘড়া হাটে কিংবা বাঁশরিয়ার বাজারে যায়া মাছ তরকারি কিনা আনে, তখন গুলনেহার তেল ছাড়া ট্যালট্যালা পানির মতো হলুদ রঙের ঝোলঅলা তরকারি রান্ধার পর তারা দুইজনে তাই দিয়া হাপুসহুপুস করে ভাত খায়া পেট ফুলায়া রাখে। তখন গুলনেহার আব্দুল কাদের মিঞার বারান্দায় উঠে আসে এবং তার মনে হয় যে, আব্দুল কাদেরের বসার কাঠের চেয়ারটা নিশ্চয়ই বদমাইশ চাকরেরা পাতে—টিনের বেড়া এবং চেয়ারের মাঝখানের ফাঁকটা আরো কমে আসায় গুলনেহার চ্যাপটা হয়া এই চিপা পার হওয়ার চেষ্টা করে। তার সামনে তখন দুইটা পথ খোলা থাকে, হয়তো তিনটা, সে বলতে পারে, দাদা মিঞ্যা ইকটু আগায়া বসেন, কিন্তু সে তা বলে না, তার লজ্জা লাগে, গরিবের বৌয়ের এত কথা মানায় না, হয়তো সে আব্দুল কাদেরের সামনে দিয়াও জলচৌকির কাছে যেতে পারে, কিন্তু পিছন দিয়া যেতে পারলেই ভালো, কারণ গরিবের বৌয়ের জন্য সামনে দিয়া যাওয়াও ভালো দেখায় না, ফলে পিছনের চিপা দিয়া পার হওয়ার জন্য তার হাতে থাকে দুইটা উপায়, হয় সে চ্যাপটাভাবে আব্দুল কাদেরের দিকে বুক রেখে পার হতে পারে কিংবা পিঠ রেখে; এবং হয়তো নারী বলেই প্রায় কোনো চিন্তা না করেই সে টিনের বেড়ার দিকে ফিরা এই চিপা পার হওয়ার চেষ্টা করে—নারী হয়া জন্মালে এবং উপায় না থাকলে, বুক না, পথের নিতম্ব আগায়া দেও! তখন কাঠের চেয়ারের পিছনদিকটার সঙ্গে গুলনেহারের নিতম্ব ঘষা দিয়া বের হয়া যায়, হয়তো আব্দুল কাদের টের পায়, কিন্তু দেখে মনে হয় যে, সে তখন চোখ বন্ধ করে ঘুমায়া আছে। গুলনেহার পুনরায় টিক্কায় ফুঁ দেয়, তারপর আব্দুল কাদেরের দিকে তাকায়া বলে, দাদামিঞ্যা আপনে ঘুমান? আপনের টিক্কা জ্বালায়া দিছি।

আব্দুল কাদেরের তখন পূর্ণিমার রাতের কথা মনে পড়ে এবং সে যখন বলে, কাইল কৈল পুন্নিমা আছিল, দেইখছিলি ন্যা? তখন গুলনেহার মনে করতে পারে না, পূর্ণিমা দেখে কী লাভ সেটাও হয়তো তার কাছে পরিষ্কার হয় না; তবু সে হয়তো মিছা কথা বলে, হে দেইখছি তো, গোল থালির নাহাল চান, তারপর হয়তো সরল মিথ্যার সঙ্গে কল্পনা মিশায়, এবং সে যখন বলে, পুন্নিমা দেইখলে আমার ক্যাবা জানি কান্দা আসে দাদামিঞ্যা, তখন আব্দুল কাদেরের মনে হয় এমন কথা সে কোনোদিন শোনে নাই এবং সে বিহ্বল হয়া পড়ে, এই বিহ্বলতার ভিতর থেকে একসময় জেগে উঠে সে বলে, দ্যাখ ক্যাবা বুড়া হয়া গেছি, এইসব জমিন, সব ধান আমার, দ্যাখ আমি ক্যাবা বুড়া ঝুজ্‌ঝুরা হয়া গেলাম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো গ্রাম্য সরলতার ভিতরেও গুলনেহার ভয় পায়, আঠারো বছরের নারী পঁচাত্তর বছর বয়সের পুরুষের সামনে ভ্যাবাচ্যাকা খায়া থাকে, তার সামনে তখন পুলসিরাত পার হওয়ার মতো সমস্যা, তাকে চেয়ারের পিছন দিয়া যেতে হবে, এবং সে যায়; তবে তারও হয়তো বিহ্বলতা দেখা দেয়, ফলে তার আচরণ উলটাপালটা হয়া যায়, নারীর সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগের পার্থক্যের বিষয়ে তার খেয়াল থাকে না, সে টিনের বেড়া পিছনে রেখে কাত হয়া চিপাটা পার হওয়ার চেষ্টা করে এবং তার অপরিণামদর্শীর মতো স্ফীত-হয়া-ওঠা স্তন পিছন থেকে ধাক্কা দিয়া আব্দুল কাদের মিঞার বুড়া মাথা নড়বড়ে করে দেয়। ফলে যা ঘটার তা-ই ঘটে, আব্দুল কাদের মিঞা বিকালবেলা ফৈজুদ্দিনকে নিয়া লক্ষ্মীকোলার মাঠে বিছায়া থাকা ফসলের ভিতর দিয়া হাঁটে; কিন্তু ফজুর হয়তো মনে হয় যে, ধানঘড়ার হাট থেকে ইকটু ঘুরে আসতে পারলে খারাপ হয় না, সে বলে, চলেন দাদামিঞ্যা ধানগড়া থেইক্যা ঘুইর‍্যা আসি গা, আপনে হাঁইট্যা যাইব্যার পাইরবেন ন্যা?

আব্দুল কাদের মিঞা তখন সতর্ক হয়, সে রাজি হয় না, তার মনে হয় যে, এই লোকটা উলটা তাকেই ভবঘুরে বানায়া ফালানোর চেষ্টা করছে, আশ্চর্য, বদমাইশটা ভেবেছে যে, ম্যাসাব তো খামাখা মাঠের ভিতর ঘুরে বেড়ায়, তারে হাটে নিয়া যাই; কিন্তু আব্দুল কাদের তো মোটেও বিনা কারণে এইসব হাঁটাহাঁটি করে না, ক্ষেতের ভিতরে সে তার ধানের খোঁজখবর করে মাত্র, দ্যাখে ক্ষেতের কী অবস্থা, ধানের দুধের ভিতর থেকে দানা কেমন হচ্ছে, গাছ হলুদ হয়া উঠতে শুরু করেছে কি না, আইলের উপরে দেখা যায় কি না ইন্দুরের গাথা, ইত্যাদি। আব্দুল কাদের মিঞা তখন ফৈজুদ্দিনের দিকে নজর দেয়, এই লোকটা বিনা কারণে তার পিছনে ঘোরে, তার ধান ভালো হওয়ার আনন্দ নাই, ক্ষেতে ইন্দুর লাগার দুশ্চিন্তা নাই, নির্ভার সে—সে ফৈজুদ্দিন ওরফে ফজু—পরের সোনালি ক্ষেতের ভিতর দিয়া বৈরাগীর মতো হাঁটে। ফলে আব্দুল কাদের মিঞা তাকে আবার তার বান্ধা কামলা বানানোর প্রস্তাব দেয়, বছরে দুই/পাঁচ মণ ধান এবং কাপড়চোপড় পাবে, সে বলে, ভাইবা দ্যাখ, রাজি হয়া যা—কিন্তু ফজুর রাজি হওয়ার নাম নাই। তবে তখন তারা বোকসাবাড়ির মাঠে আসে, আব্দুল কাদের যায়া পড়োভিটার পাশে ঘাসের উপরে বসে এবং ফৈজুদ্দিন পাকা ধানগাছের উপরে গড়ায়, পাকা ধানের গন্ধে তার পুনরায় ঘুম আসে; আব্দুল কাদের দেখে, উনচল্লিশ টাকার—কমও হতে পারে—ভাত/মাছ খায়াও ফৈজুদ্দিনের পেট কেমন মরা নদীর মতো শুকনা, সে বলে, তুই আমার ধান নষ্ট করিস ন্যা বাপু, তর ঘুমান লাগে, ঘরে যায়া ঘুমা!

ফৈজুদ্দিনের কিছু বলার থাকে না, ফলে আব্দুল কাদের মিঞা যখন, কীরে কথা কইস ন্যা, বলে তার পায়ের রাবারের একপাটি পামশু ছুড়ে মারে, তখন ফৈজুদ্দিন এক আশ্চর্যজনক প্রস্তাব দেয়, সে বলে যে, আব্দুল কাদের মিঞা গুলনেহারকে বান্ধা বান্দি করে রাখে না কেন? গুলনেহারেক আপনে রাখেন, সে বলে, এবং তার কথা শুনে আব্দুল কাদের মিঞা হয়তো চমকায়া যায়, হয়তো চমকায় না, তবু সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর বলে, আমার জুতা দে।

কিন্তু ফৈজুদ্দিনের জুতা ছুড়ে মারার এই ব্যাপারটা ভালো লাগে না, সে বলে, আপনে বাপু জুতা চেঙ্গাচেঙ্গি কইরেন না, এবং তারপর জুতা ফিরায়া দিয়া ধানক্ষেত থেকে উঠে এসে আব্দুল কাদেরের কাছে বসে। তারপর তাদের কিছু করার থাকে না, তারা দুইজন হিম এবং শিশিরের মধ্যে বসে থেকে হাত পা চুলকায়, গলাখাঁকারি দিয়া শিয়াল কিংবা খাটাশ তাড়ায়, তখন একটা ইন্দুর ক্ষেতের ভিতর থেকে বের হয়া তাদের পায়ের একদম কাছ দিয়া ভিটার জঙ্গলের দিকে যায়, অথবা ভিটার ভিতর থেকে যায় ধানক্ষেতের দিকে। আব্দুল কাদের মিঞা দ্যাখে, সে বোঝে তার ধানক্ষেতে ইন্দুর লাগছে, সে ফজুকে বলে, ইন্দুরটা মার, কিন্তু ফজু নড়ে না। তখন ২য় একটা ইন্দুর আসে এবং আব্দুল কাদের মিঞা যখন ইন্দুর মারতে বলে, তখন ফজু জানতে চায় যে, এ-কাজ করলে সে পয়সা দেবে কি না; আব্দুল কাদের মিঞা রাজি হয়, কারণ তার মনে হয় যে, ঠিক আছে ফকিরটাকে দিয়া ইন্দুর-ই মারানো যাক, খাটুক! তখন ৩য় ইন্দুরটা মাটি শুঁকে আগায়া আসে, আব্দুল কাদের মিঞা বলে, মার, ইন্দুরডো মার, এবং ফজু দ্রুত উঠে মাটির একটা ঢেলা তুলে নিয়া ছুড়ে মারে; ইন্দুরটা একটুও শব্দ না করে কাত হয়া পড়ে যায়। ফজু ইন্দুরটার লেজ ধরে তুলে এনে মাটির উপর তিন/চারটা বাড়ি দিলে ইন্দুরটার জান বের হয়া যায়, তখন সে মরা ইন্দুরটা আব্দুল কাদের মিঞার পায়ের কাছে ফালায়া দিয়া বলে, দশ ট্যাহা দিবেন।

আব্দুল কাদের মিঞা পাঁচ টাকায় রফা করে, ফৈজুদ্দিন প্রতি মরা ইন্দুরের জন্য পাঁচ টাকা এবং প্রতি দুইটা মরা ইন্দুরের জন্য আরো দুই টাকা বোনাস পাবে; এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, আব্দুল কাদের বোনাসের ব্যাবস্থাটা রাখে টাকার হিসাব কঠিন করে ফেলার জন্য। তখন ফৈজুদ্দিন বাকসাবাড়ির ভিটার উপর থেকে গাছের একটা লম্বা এবং মোটা ডাল সংগ্রহ করে আনে, তারপর আব্দুল কাদেরের কাছেই বসে ইন্দুরের অপেক্ষা করে, কিন্ত ৪র্থ ইন্দুরের দেখা পাওয়া যায় না। তারা অনেকক্ষণ বসে থাকার পর কোনো একদিক থেকে মোটাসোটা ইন্দুরটা আসে এবং ফৈজুদ্দিন সেটার পিছনে লাঠি-হাতে দৌড়ায়, পরিশ্রমে তার হৃৎপিণ্ড বুকের পাঁজরের সঙ্গে বাড়ি খায়, কাহিল হয়া সে সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার যায়া ধানক্ষেতের মধ্যে শুয়ে পড়ে; সেদিন ফজু সাতটা ইন্দুর মারে এবং শিশিরে যখন তাদের কাপড় ভিজা যেতে থাকে এবং অন্ধকার গাঢ়তর হয়া আসে তখন তারা বাড়ির দিকে রওনা হয়।

তবে ফজু যতই গুলনেহারকে বান্দি করে রাখার জন্য আব্দুল কাদের মিঞাকে বলুক, তার আগ্রহ দেখা যায় না, হয়তো গুলনেহারকে একদম বাড়ির ভিতরে নিয়া যায়া ঢোকাতে তার ইচ্ছা হয় না; সেখানে বারো ভূতের কারবার, ছেলে সকল এবং নাতিদের আস্তানা, আছে কামলা চাকর বাকর! ফজু এই কথা হয়তো গুলনেহারকে বলে, সন্ধ্যার পর পূর্ণিমার চান দেখা গেলে, চরাচরের উপর দিয়া যখন জোছনা ঝরে পড়ে এবং বাতাসের ধুলার সঙ্গে জোছনা মিশা রেশমের পরদার মতো কাঁপে, বাড়ির ভিটার

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একপাশে বিচিকলার ঝোপের কাছে হয়তো ফজু এবং গুলনেহার যায়া খাড়ায়, তখন ফজু তাকে এই কথা বলে—তার যখন একটা ছেলে হবে তখন হেমন্তের শেষে রৌহার পানি শুকায়া আসতে থাকবে এবং সে তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়া যাবে পলো দিয়া মাছ ধরার জন্য—তখন তারা দ্যাখে যে, সন্ধ্যা নেমে আসার পরেও আব্দুল কাদের মিঞা তার কাচারিঘরের বারান্দায় কাঠের চেয়ারে বসে থাকে এবং গুলনেহার হয়তো চপল বালিকার মতো চান্দের আলো নিয়া মেতে ওঠে, কারণ তার বয়স তো ছিল আঠারোই। তখন হয়তো দূরে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোর মধ্যে বারান্দায় বসে-থাকা আব্দুল কাদের মিঞার দিকে তাকায়া ফৈজুদ্দিন বলে, দ্যাখো বইসা অইছে তো অইছেই!

হয়তো মনে হয় যে, গুলনেহার আব্দুল কাদেরকে বানায়া বলে নাই, কারণ জোছনার ভিতরে তার মৃত্যুর কথাই মনে আসে; তার মনে হয় যে, ধুলা-মাখানো জোছনা মার্কিন কাপড়ের কাফনের মতো, ঘিয়া রঙের এবং উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়, অথবা সে হয়তো এতকিছু বোঝে নাই, তার হয়তো শুধু কাফনের কাপড়ের কথা মনে পড়ে, ফলে তার মন খারাপ হয়া যায়, বুড়াটা হয়তো মরবে, দেরি নাই! কিন্তু ফজু খুবই খ্যাপে, সে যখন বলে, হারামযাদা কীরহম, হুঁক্কার আগুন ঠিক করার মানুষ পায় না, বাড়ি ভরতি মানুষ, চাকর চাকরানি, ব্যাটার বৌ, আর তার হুঁক্কার আগুন ঠিক করার নেইগা গুলনেহারেক নাগে, তখন গুলনেহার বলে, বুড়া তো, বুড়া না!

ফলে, তাই ফৈজুদ্দিনকে সকালবেলা ইন্দুর মারার পয়সার হিসাব করার জন্য প্রাইমারি স্কুলে যেতে হয়, আব্দুল কাদের টাকার হিসাব জটিল করে তাকে খাটায়, সে স্কুলের কোনো ছাত্রকে ধরে টাকার হিসাব বের করে, অথবা হয়তো লেবু মাস্টারই আবার তাকে হিসাব করে দেয়; তারপর সেদিন আব্দুল কাদের মিঞা সাতটা ইন্দুর মারার জন্য তাকে একচল্লিশ টাকা বুঝায়া দেয়। তখন তারা আবার মাঠে যায়, কিন্তু ইন্দুরের দেখা পাওয়া যায় না, অথবা তারা ইন্দুরের দেখা পায় কিন্তু ফজু তাদের ধাওয়া করে মারতে পারে না, ফজু দৌড়াদৌড়ি করে, হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাসেও তার শরীরে ঘাম ছুটে যায়। আব্দুল কাদের মিঞা হয়তো ভাবে যে, ঠিক আছে খাটুক; কিন্তু এজন্য আব্দুল কাদেরকেও অনেকক্ষণ ধরে মাঠের মধ্যে বসে থাকতে হয়, ইন্দুর আসে না, ফলে ফজু তাকে রাতের অন্ধকারে দীর্ঘ সময় ধরে কুয়াশা এবং হিমের ভিতরে বসায়া রাখার সুযোগ পায়। তথাপি সেদিন চারটার বেশি ইন্দুর মারা পড়ে না, শেষে আব্দুল কাদের অস্থির হয়া পড়ে বাড়ি ফেরার জন্য এবং ফজু যখন বলে, ক্যা, এহন ক্যাবা নাগে, তখন অবশ্য আব্দুল কাদের মিঞা বিকালের আলোয় কাচারিঘরের বারান্দায় যায়া বসে, এবং গুলনেহারকে তার ভিটা থেকে কোনো কাজ উপলক্ষে বের হয়া আসতে হয়।

গুলনেহার হয়তো এমনিতেই আসে, তার পেটের ভিতরে হয়তো তখন ফৈজুদ্দিনকে দেওয়া টাকায় কেনা চালের ভাত, মাছ এবং আলুর টুকরা হজম হওয়ার অপেক্ষায় ছিল, ফলে সে বারান্দায় উঠে আব্দুল কাদের মিঞার চেয়ার এবং পিছনের টিনের বেড়ার মাঝখানের ফাঁকের দিকে তাকায়, সে দ্যাখে যে, ফাঁকটা আগের দিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই—ছোটও না, বড়ও না—বাড়ির চাকরগুলা বদমাইশ তাতে সন্দেহ থাকে না, তারা এইভাবে চেয়ারটা পাতে, তবে তার আগের মতোই মনে হয় যে, হয়তো সামনের দিকে নিতম্ব রেখে সে চেয়ারের পিছন দিকটা ঘেঁষটায়া ভিতরে চলে যেতে পারবে। কিন্তু পেটের ভিতরে এইসব খাবার রেখেও গুলনেহারের মনে হয়তো অবশেষে নারীর অহঙ্কার জাগে, অথবা হয়তো তার সাহসই বেড়ে যায়, সে তাই তার নিতম্ব এবং বক্ষদেশকে, এটা কিংবা ওটা, এই হিসাব থেকে রেহাই দেয়। সে আব্দুল কাদের মিঞার চেয়ারের সামনে পড়ে-থাকা বারান্দার ফাঁকা অংশ দিয়া ওপাশ থেকে এপাশে আসে এবং জলচৌকির কাছে যায়া নিচা হয়া দুই গাল ফুলায়া কল্কির আগুনে ফুঁ দেয়, কিন্তু পরে সে তার এই সিদ্ধান্তের জন্য পস্তায়! তবু টিক্কার মরা আগুন যখন বাতাস খায়া উজ্জ্বল হয়া ওঠে তখন গুলনেহার মাথার আঁচল টেনে ফেরার জন্য খাড়া হয় এবং তখন আব্দুল কাদের মিঞা ডান হাতটা প্রলম্বিত করে দিয়া তার একটা বাহু খুব হাল্কাভাবে ধরে, মনে হয় আম কিংবা জাম গাছে বায়া ওঠা একটা লতা বুঝি বাতাসে সরে এসে বিচ্ছিন্ন একটা শাখাকে ছুঁয়ে থাকে; সে গুলনেহারের মুখের দিকে তাকায়, তার চোখের নিষ্প্রভ আলোর ভিতর ঘোলাটে বিষণ্নতা জেগে থাকে, এবং সে যখন বলে, আমার মাথাডো টিপ্যা দিবি, তখন গুলনেহার পস্তায়—চেয়ারের পিছনে একটা ঘষা দিয়া চলে গেলেই হয়তো ভালো ছিল! ফজু তখন চকনুর লক্ষ্মীকোলা কিংবা বোকসাবাড়ির মাঠে কার্তিক কিংবা অগ্রহায়ণের হিমের ভিতর আব্দুল কাদের মিঞাকে নিয়া বিকালবেলা চক্কর দেয়, কিন্তু তারপর বোকসাবাড়ি ভিটায় এসে তাদের ইন্দুরের জন্য আবার বসে থাকতে হয়—ইন্দুর কি সব শেষ হয়া গেল—ভাবে, আব্দুল কাদের মিঞার গায়ের কাপড় শিশিরে ভিজা যেতে থাকে, এবং তার পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়া পড়ে। গুলনেহারও যখন ফজুকে বলে, ক্ষেতের ভিতর এই ঠাণ্ডায় এতক্ষণ ধইর‍্যা বইস্যা থাক কী কামে? তখন ফজু তাকে বলে যে, বুড়াটা ভেজে ভিজুক, ভিজা ফসফুসা হয়া মরে মরুক—কাম নাই কোনো, তাকে দিয়া ইন্দুর মারায়! তারপর ফজু গুলনেহারকে গাল পাড়ে, আর তুমি মাগি কোনো কাম পাও না, যাও এই শালার মাথা টিপ্যা দেওয়ার নেইগা, তখন গুলনেহার বলে, বুড়া না, বুড়া তো!

তখন হয়তো রৌহার বিল থেকে একটা কানি বক অথবা একঝাঁক কানি বক উড়ে আসে, এসে বোকসাবাড়ির ভিটায় আব্দুল কাদের যে কড়ুই কিংবা রিঠাগাছের তলায় বসে থাকে সেই গাছেরই কোনো ডালে বাসা বান্ধে—কিংবা হয়তো বকগুলা আগে থেকেই এখানে ছিল। তখন, আব্দুল কাদের এবং ফৈজুদ্দিন ইন্দুরের প্রতীক্ষা করার সময় একটা কানি বক আকাম করে, সে পুচ করে আব্দুল কাদেরের মাথার উপর হেগে দেয়, মাথার চান্দির চুল কম থাকায় আব্দুল কাদের টের পায় কিছু একটা এসে পড়ল, তারপর সে হাত দিয়া বোঝে কী পড়ছে; কিন্তু সে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে এবং পাখির গু মাথায় করে বাড়িতে বয়া আনে। সেদিন হয়তো শেষপর্যন্ত পাঁচ/ছয়/ কিংবা সাত/আটটা ইন্দুর মারা পড়ে, তারপর তারা হালটের উপর দিয়া ফিরা আসে, আব্দুল কাদের আগে দিয়া হাঁটে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজু পিছনে; তখন ফজু বলে যে, মিঞাবাড়ির ভিটার নামায় মাথাভাঙা আমগাছের কাছে ফজুর ভিটার সঙ্গে লাগানো এক-শতাংশ জমির পালানটা আব্দুল কাদের মিঞা কেন তাকে দিয়া দেয় না, পালানের জায়গাটা তো আসলে তারই! এই জায়গাটুকু পেলে গুলনেহার সবজির চাষ করতে পারে, তাদের রাস্তার কিনারার কিংবা রৌহার বিলের লতাপাতা কুড়ায়া খাওয়া লাগে না, কিন্তু আব্দুল কাদের মিঞার হঠাৎ মাঠের মাঝখানে কাশি শুরু হয়, সে বলে, পালান তর না, তুই নিব্যার চাইস কিন্যা নে, তক কম দামে দিমুনি যা!

হয়তো তখন ফৈজুদ্দিনের কানে আব্দুল কাদের মিঞার কথা ঢোকে না, সে বরং তার কাশির দিকে মনোযোগ দিয়া রাখে; তারপর সকালে হিসাব করার পর সে টাকা আনার জন্য আব্দুল কাদের মিঞার কাছে যায়, তখন কাদের মিঞা তাকে বলে যে, আরো কাজকাম করে টাকা জমায়া সে চাইলে তো ভিটার নামার পালানটা কিনা নিতেই পারে! কিন্তু ফৈজুদ্দিনের মনে হয় যে, পালানটা তারই, আব্দুল কাদের মিঞা অবশ্য সেটা মানে না, কারণ জমিটা তার কেনা, হয় সে ফজুর বাপের কাছ থেকে কিনেছিল, নয়তো তার চাচা আইজ্জল প্রামাণিকের কাছ থেকে; কিন্তু তার বাপ এবং চাচা উভয়েই মৃত হওয়ায় সমস্যাটার সুরাহা করা যায় না। তখন ফজুর সামনে জমিটা কিনা নেওয়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না—কিন্তু টাকা কোথায় পাবে ফজু? আব্দুল কাদের মিঞা তাকে বলে যে, ঠিক আছে নগদ টাকা হয়তো নাই, কিন্তু ফজু কেন তার বাড়িতে বান্ধা কামলা হয়া পাঁচ বছর থাকে না? পাঁচ বছর পেট-খোরাকি দিলে সে বান্ধা কামলা হয়া থাকুক—হয়তো প্রতিবছর গামছা এবং লুঙ্গিটুঙ্গিও পাবে, তখন পাঁচ বছর পর পালানটা সে তাকে বিনা-পয়সায় দিয়া দেবে। কিন্তু ফজু তো নির্বোধ, কিংবা সে হয়তো জীবনের হিসাব কম জানে না, ফলে পণ্ডশ্রমের চক্করের মধ্যে নিজেকে পড়তে চায় না সে, বরং সে পুনরায় গুলনেহারকে বান্দি করে রাখতে বলে, পাঁচ-দশ বছর রাখেন, পালানডো আমাক দেন দাদামিঞ্যা; এবং তখন টিক্কার আগুনে ফুঁ পাড়ার সময় গুলনেহার জলচৌকির সামনে বেঁকা হয়া আব্দুল কাদেরের হাতের কাছে যখন নিতম্বের দুইটা গোলক উঁচা করে রাখে, সে তার মাথার চুলের ভিতর কানা বগির বিষ্ঠা নিয়া কাঠের চেয়ারে বসে থাকে। তারপর টিক্কার আগুন জ্বলে উঠলে গুলনেহার যখন চলে যেতে শুরু করে, সে তাকে ডাকে, দ্যাখ তো আমার মাথার চুলে কী লাইগলো!

আব্দুল কাদের মিঞার মাথার মধ্যে গুলনেহার কানা বকের পায়খানা আবিষ্কার করে, সে বলে, এইগুলান কী, গু না? তারপর, তখন, সে ব্যস্ত হয়া পড়ে, তবে কাচারিঘরের ভিতর থেকে অজু করার বদনা নিয়া যায়া পুকুর থেকে পানি এনে মাথা পরিষ্কার করার পর ঝামেলা দেখা দেয়; কারণ, গুলনেহার বুড়া আব্দুল কাদেরের ভিজা মাথা মোছানোর জন্য একটা কাপড় খুঁজে পায় না, ফলে সে মিঞাবাড়ির ভিতরের দিকে রওনা হলে কাদের মিঞা তাকে থামায় এবং বলে যে, তার মাথা মোছা লাগবে না—তখন গুলনেহারকে এই কাজে তার ময়লা জীর্ণ শাড়ির আঁচল ব্যবহার করতে হয়। তারপর গুলনেহার মাথা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙা আমগাছতলা দিয়া যখন তাকায় তার নজর যায়া পড়ে নিচে লালশাক লাগানো পালানের উপর, তখন সে বলে, দাদামিঞ্যা এই পালানডো আমাগোরে দেন, আপনের নাতি কয় যে, পালানডো আমাগোরই!

আব্দুল কাদের মিঞার হয়তো রাগ হয়, কিংবা হয় না, তবে সে আবার কাশে এবং সে গায়ের পাঞ্জাবির উপরে একটা সুতি আলোয়ান জড়ায়া রাখে, ফজু এটা লক্ষ করে, সে অন্তত চারটা ইন্দুর না মারা পর্যন্ত আব্দুল কাদেরকে মাঠে বসায়া রাখার জন্য উলটা জোরাজুরি করে, কারণ, ফজু বলে যে এর কম হলে ইন্দুর মেরে পোষায় না, কিন্তু বোকসাবাড়ির ভিটায় কানা বগির আবির্ভাবের পর মনে হয় যেন ফজুর কাজ সহজ হয়া যায়। শিশিরে ফজুর সারাশরীর যখন ভিজা যায়, আব্দুল কাদের মিঞার আলোয়ান ভিজা পাঞ্জাবিও ভিজা যেতে থাকে, সন্ধ্যা গড়ায়া রাত আসে এবং ফজু অন্ধকারের ভিতর ইন্দুর মেরে জড়ো করতে থাকে, কিন্তু আব্দুল কাদের মিঞা ওঠার নাম করে না, তারপর কানা বগির ছাও যখন তার কাজ সমাপন করে তখন সে ফজুকে বলে, নু যাই।

গুলনেহার আবার পাখির গু পরিষ্কার করে, বাড়ির বৌয়েরা তখন বাড়ির ভিতরে যায়া ঘরে খিল দিয়া বসে থাকে এবং চাকর/চাকরানিরা বাড়ির পিছনে পুকুরের আশপাশে কাজ নিয়া ব্যস্ত হয়া পড়ে, অথবা তারা বেড়াতে যাওয়ার নাম করে দূরে চলে যায়, ফলে তারা কিছু দ্যাখে না। তখন হয়তো গুলনেহারের মনে হয় যে, কীরে, প্রত্যেকদিন মাথার মধ্যে করে কাকের গু বকের গু বয়া নিয়া আসে, অথবা হয়তো সে অবাক হয় না, কারণ মাথার উপরে কাক-পক্ষী হাগতেই পারে, প্রত্যেক দিন হাগলেই-বা কী, ফলে সে আব্দুল কাদেরের মাথার চুল পানিতে ভিজা ধোয়ানোর পর আঁচল দিয়া মোছে, সে হয়তো একপাশে খাড়ায়া একটা হাত লম্বা করে দিয়া কাজটা করে। এই সময় হয়তো আব্দুল কাদের মিঞা পুনরায় চোখ বুজে চুপ করে থাকে, গুলনেহারের হাতের ভিতরে তার মাথা দোল খায়, এবং তখন সে বলে, ভালো কইর‍্যা মোছ, এবং গুলনেহার অবাক হয়, তার মনে হয় যে, বুড়া তো আজব, একবার বলে মাথা মোছানো লাগবে না, আবার বলে, ভালো করে মোছ! গুলনেহার তখন চেয়ারের পিছনের চিপায় যায়া খাড়ায় এবং দুই হাতের মধ্যে পাকাচুলে ভরা মাথাটা নিয়া ঘষে ঘষে পানি তোলে, তখন আব্দুল কাদের মিঞার কাশিটা ফিরা আসে। তার এই কাশি বাড়ে, ফৈজুদ্দিনের পর্যাপ্তসংখ্যক ইন্দুর খুঁজে পেতে দেরি হতে থাকায়, মাঠের মধ্যে শিশিরের পানির ভিতর বসে থাকা এমনিতেই প্রলম্বিত হয়, এর সঙ্গে কানা বকের প্রাকৃতিক কর্ম সমাপনের জন্য প্রতীক্ষার বিষয়টি যোগ হলে আব্দুল কাদের মিঞা মনে হয় যেন দ্রুত বিপর্যয়ের দিকে আগায়া যায়। সে কাশে, হুক্কুর হুক্কুর করে, তার নাক মুখ দিয়া পানি ঝরতে থাকে এবং ফজু সকালে টাকা গুনে নিয়া আসার সময় দ্যাখে যে, মিঞাসাবের নাকমুখ ফোলাফোলা, কেমন ঝুলে পড়তে চায়, তার বুকের ভিতর সাঁইসুঁই করে এবং মাথা থেকে বকের গুয়ের গন্ধ আসে। ফৈজুদ্দিনের হয়তো মনে হয় যে, আব্দুল কাদের হয়তো এবার থামবে, কারণ, তার বাড়ির লোকেরা চিন্তিত হয়া পড়ে এবং তারা ফৈজুদ্দিনকে এই অবস্থার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোষারোপ করতে থাকে; কিন্তু ফজু দোষ মেনে নেয় না, কারণ এই ব্যাপারটা—যদি এটা আদৌ কোনো ব্যাপার হয়া থাকে—সে শুরু করে নাই। তখন আব্দুল কাদের মিঞার দেওয়া টাকা দিয়া ফজু ধানঘড়া হাটে যায়া আবার মাছ/গোস/তরকারি কিনা আনে, হয়তো কাচের বোতলে করে সরিষার তেলও আনে, গুলনেহার মজা করে রান্দে, কিন্তু গুলনেহারের রান্ধা মাছের তরকারি থেকে তবু আঁশটে গন্ধ যায় না, গোস কাঁচা লাগে, তবু তারা পুনরায় হাপুসহুপুস করে খায়। তারপর তারা ঘর থেকে বের হয়া দ্যাখে যে, আরেক পূর্ণিমা তাদের উঠানে কলাগাছের ঝোপের ভিতর এসে লুটায়া পড়ে আছে, তখন ফৈজুদ্দিন তার বৌকে আব্দুল কাদের মিঞার মাথার বকের বিষ্ঠা পরিষ্কার করার জন্য গালমন্দ করে এবং তখন জোছনার দিকে তাকায়া গুলনেহারের বিষণ্নতা হয়, সে বলে যে, আব্দুল কাদের হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবে না। ফজুর তাতে কোনো দুঃখ হয় না, না বাঁচে, না বাঁচুক, তখন তারা দ্যাখে যে, মিঞাবাড়ির ভিটায় কাচারিঘরের বারান্দায় ম্যাসাবের কাঠের চেয়ার খালি পড়ে আছে এবং ফৈজুদ্দিনের মনে হয় যে, আব্দুল কাদের মিঞার হয়তো সর্দিকাশি বেড়েছে, হয়তো পড়ে গেছে বিছনায়ই, সে বলে, মরে না কী কামে! কিন্তু তখন গুলনেহার রাস্তার কিনার থেকে গোরু আনতে যায় এবং দ্যাখে যে বুড়া ম্যাসাব কাঠের চেয়ারে বসে ঝিমন ঢোলে, গুলনেহারের মনে হয় যে, সে তাকে ডাকে, ফলে সে যখন মিঞাবাড়ির ভিটায় কাচারিঘরের বারান্দায় উঠে আসে, সে দ্যাখে যে, চেয়ারের দুই হাতলের উপরে দুই রগওঠা হাত ছড়ায়া দিয়া আব্দুল কাদের মিঞা গোড়াকাটা একটা গাছের মতো বসে আছে, সে মুখ আকাশের দিকে উঠায়া হাঁ করে শ্বাস টানে, তার বুকের খাঁচা হাপরের মতো পিটাপিটি করে। গুলনেহার দ্যাখে যে, আব্দুল কাদের মিঞার জলচৌকির উপরে সাজায়া দেওয়া হুঁক্কা নীরব হয়া আছে, টিক্কার আগুন পুরু ছাইয়ের তলায় ঢাকা পড়ে আছে এবং রাবারের নল পড়ে আছে মাটিতে; তখন গুলনেহার যখন বলে, দাদামিঞ্যা টিক্কার আগুন জ্বালায়া দিমু? আব্দুল কাদের তার ক্লান্ত চোখ খুলে তাকায়, এবং তখন গুলনেহারের মনে হয় যে, আব্দুল কাদের মিঞা তার একটা হাত গুলনেহারের দিকে বাড়ায়া দিতে চায়। গুলনেহার তখন আগায়া আসে, এবং সে চেয়ারের কাছে আগায়া গেলে বুড়া আব্দুল কাদের গুলনেহারের ডাইন হাতটা আঁকড়ায়া ধরে; তখন সে শোনে আব্দুল কাদেরের বুকের ভিতর ঝড়ের রাতের বাতাসের কান্দার শব্দের মতো সাঁইসাঁই করে। গুলনেহারের ভয় লাগে, সে দ্যাখে যে, পূর্ণিমার চান্দের আলো মাঠের উপর ধুলার সঙ্গে মিশা ঝুলে আছে এবং তার ডাইন হাত আঁকড়ায়া ধরে রাখা আব্দুল কাদেরের হাতটা তিরতির করে কাঁপে; তখন গুলনেহারের মনে হয় যে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে গেছে বুড়াটা, ডুবে যাচ্ছে সে, অথবা হয়তো গুলনেহার এতকিছু ভাবে না। ফলে সে তখন চেয়ারের সামনে এসে আব্দুল কাদেরের হাঁটু ঘেঁষে তেরছা হয়া এমনভাবে খাড়ায় যে, বাইরের মাঠ কিংবা মিঞাবাড়ির উঠান থেকে দেখলে কেবল তার পিছনটা দেখা যায়, এবং সে তার বামহাতে ব্লাউজের টিপবোতাম খুলে বক্ষ অনাবৃত করে আব্দুল কাদরের মুখের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগায়া নিয়া বলে, ধরেন; তখন আব্দুল কাদের মিঞার জ্বরতপ্ত, খসখসে এবং ক্ষয়িত দুই করতলের মধ্যে গুলনেহারের দুইটা তরুণ স্তন কোমল, উষ্ণ এবং কম্পমান দুইটা ঘুঘু পাখির মতো ধরা পড়ে। তখন আব্দুল কাদের হয়তো মাঠের ভিতরে ফৈজুদ্দিনের সঙ্গে বোকসাবাড়ি ভিটার পাশে যায়া বসে, আব্দুল কাদের মিঞা সোয়েটার/জাম্পার পরে তার উপরে মোটা আলোয়ান জড়ায়া রাখে, কিন্তু তবু তার ফুসফুসের বাতাস সাঁইসুঁই করে, জ্বরে হয়তো তার শরীরও পুড়ে যায়; ফজু হয়তো একটা ইন্দুর মারে, অথবা হয়তো কোনো ইন্দুর আর আসে না, তখন ফজু হয়তো বলে, দাদামিঞ্যা আপনের শরীল তো খুবই খারাপ!

তারপর হয়তো একটা ইন্দুর আসে, ঘাস কিংবা মরা পাতার ভিতর দিয়া ইন্দুরটা সতর্কতার সঙ্গে আগায়া আসে; হেমন্তের ঠাণ্ডায় হয়তো গেঞ্জির উপরে গামছা জড়ায়া রেখেও ফজুর শীত লাগে, ফলে সে ইন্দুরটার পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে শরীর গরম করে। ফজুর মনে হয় যে, আব্দুল কাদের মিঞার সময় বেশি নাই, সে বলে, দাদামিঞ্যা, আপনে আমাক পালানের জায়গাটা দেন, আইজ আছেন কাইল মইর‍্যা যাইবেন, পালানটা আমাগোরে দেন, দাদামিঞ্যা!

আব্দুল কাদের মিঞার তখন খুব শ্বাসকষ্ট হয়, ফজু যায়া ধানক্ষেতের শিশিরের মধ্যে শোয়, পাকা ধানের গন্ধে তার আবার ঘুম আসে, তখন হয়তো রিঠা কিংবা কড়ুইগাছের কানিবকেরা দুই-একবার পাখা ঝাপটায়, দুই একবার অন্ধকারের ভিতরে ডাকে, এবং তখন ফৈজুদ্দিনের যে কী হয়, সে আব্দুল কাদের মিঞাকে বলে, দাদামিঞ্যা মনে হরেন আমি যুদি এহন আপনেক গলা টিপ্যা মাইর‍্যা থুয়্যা যাই, তাইলে ক্যাবা হবিনি?

আব্দুল কাদেরের হয়তো জ্বরে মাথা চক্কর দেয়, সে ফজুর কথা শোনে এবং তার কাশি প্রবল হয়া ওঠে, তারপর কাশি থেমে এলে সে বলে, তক পুলিশে ধইর‍্যা নিয়া যায়া ফাঁসি দিবনি!

তখন ফৈজুদ্দিন হয়তো আরো দুই/চাইরটা ইন্দুর মারে এবং আব্দুল কাদের মিঞা বলে, তার থেইক্যা তুই মরিস না ক্যা?

তারপর সেদিন আব্দুল কাদের অজ্ঞান হয়া পড়ে, তখন চাকর সাহেবালি যায়া রব্বেল ডাক্তারকে ডেকে আনে এবং রব্বেল ডাক্তারের পরামর্শে রিকশাভ্যানে তুলে তাকে জেলা-শহর সিরাজগঞ্জ কিংবা বগুড়ায় নিয়া যায়া সদর হাসপাতালে ভরতি করা হয়। ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে দেখে বলে, ডবল নিউমোনিয়া, ফুসফুস ফুইলা গেছে, ডাইন এবং বাম দুই দিকের লোবেই ইনফেকশন হয়া গেছে, মনে হয় ইনফেকশন হয়তো প্লুরায় যায়া ঠেকছে; তখন নূরুল হক কিংবা শাজাহান আলি কিংবা আব্দুল ওহাব ডাক্তারদের মুখের দিকে ভ্যাবাচ্যাকা খায়া তাকায়া থেকে যখন বলে, বাঁইচপো তো ডাক্তার সাহেব? ডাক্তার বলে, আল্লাহ আল্লাহ করেন! তখন ডাক্তাররা তার গলার ভিতরে নল ঢুকায়া ফুসফুসে জমা তরল সাকশন দিয়া টেনে বের করে, তারপর হাই ডোজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন পুশ করে দিয়া, নাকের ভিতর অক্সিজেনের নল এবং হাতের শিরায় স্যালাইনের সুই ঢুকায়া দিয়া রাখে—আব্দুল কাদের মিঞা মরে না।

কিন্তু ফজু মরে যায়, সকালে বোকসাবাড়ির মাঠে ফৈজুদ্দিনকে পাওয়া যায়, সোনালি ধানক্ষেতের ভিতর শিশিরের পানিতে ভিজা তার গেঞ্জি আর গামছা জড়ানো দেহ ঠাণ্ডায় সিটকা মেরে আছে এবং তিনটা খয়েরি রঙের ধাড়ি ইন্দুর তার পায়ের একটা বুড়া আঙুল কামড়ায়া খায়; তখন রব্বেল ডাক্তারকে ডাকা হলে, সে বলে যে, ফৈজুদ্দিন মারা গেছে অতিঠাণ্ডায়, হাইপোথার্মিয়ায়। তখন হেমন্তের মাঝামাঝি কিংবা শেষে ধানকাটার ধুম লাগে, মাড়াইয়ের ঘ্রাণে গ্রাম উতলা হয় এবং আব্দুল কাদের মিঞা ডবল নিউমোনিয়া থেকে বেঁচে উঠে সুহাসিনীতে ফিরা আসে, দুর্বল শরীর নিয়া সে বাড়ির ভিতরে চৌচালা বড় টিনের ঘরে খাটের উপর শুয়ে বিশ্রাম করে; তখন নূরুল হকের বৌ লবণের সুজি বানায়া এনে বলে, আব্বা ইকটু সুজি খান, এবং খাটের পাশে বসে শ্বশুরকে চামচ দিয়া তুলে সুজি খাওয়ায়।

তখন গুলনেহার কোথায়? আমরা জানি না, আমরা গুলনেহারকে দেখি না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোঃ আনিসুর রহমান*

'দারিদ্র্য' চিন্তার মানবিকীকরণ*

মানুষের মৌলিক চাহিদা

সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন-চিন্তা, গবেষণা ও কর্মোদ্যোগের প্রাঙ্গণে দারিদ্র্যবিমোচন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয় হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসীন মহল—দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে—বিভিন্ন পেশাগত মহল—যাদের কাছে দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা একটা অত্যন্ত লাভজনক পেশাই হয়ে গিয়েছে, এবং মাঠপর্যায়ে দারিদ্র্যবিমোচনে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থাসমূহ যারা পেশাগতভাবেই এই কাজ করে যাচ্ছে; তাদের দারিদ্র্য প্রত্যয় একটা বিশেষ ধারণাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই ধারণাটি অভীষ্ট জনগণের জীবনের বাইরে থেকে তৈরি একটি 'দারিদ্র্য-রেখা'কে ঘিরে। এই রেখাটি মানুষের বর্তমানে বেঁচে থাকবার জন্য ন্যূনতম কয়েকটি উপকরণের মূল্য হিসাব করে টানা হয়। উপকরণগুলি সাধারণত মানুষের তথাকথিত 'মৌলিক চাহিদা' বলে করে ভাত-কাপড়-বাসস্থান-স্বাস্থ্য ও (প্রাতিষ্ঠানিক) শিক্ষা বলে মনে করা হয়, কিন্তু আসল হিসাব করবার সময় মানুষ তার দেহধারণের জন্য যথেষ্ট পুষ্টি ('ক্যালোরি') পাচ্ছে কি না এইরকম বিবেচনাকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়; অন্যান্য তথাকথিত 'মৌলিক চাহিদা'গুলি মিটছে কি না এই প্রশ্নটা একরকম দায়সারাভাবেই অনুসন্ধান করা হয়। কোনো কোনো মহল মানুষের এইভাবে ধারণা করা 'মৌলিক চাহিদা'কে "দিনে এক ডলার" বলে ধরে নিয়ে দারিদ্র্য বাড়ছে না কমছে এর অনুসন্ধান করে যাচ্ছে।

আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি[১] যে, এরকম একটা দারিদ্র্য প্রত্যয় মূলত সাধারণ জনগণের দৈহিক শ্রমক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখবার উদ্বেগই প্রকাশ করে। এবং তাও করে শুধু বর্তমানকালের জন্য, কারণ এখানে তার আয়ের স্থিতিশীলতা বা বৃদ্ধবয়সের জন্য

* এই বিষয়ে লেখকের পূর্ববর্তী রচনা রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ্স্ বাংলাদেশ (রিইব)-এর *ধারণাপত্র ও গবেষণা চিন্তা* পুস্তিকায় (রিইব, ঢাকা, মে ২০০৩) প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান রচনায় রিইবের একটি কর্মশালা ও মাঠপর্যায়ের একটি প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

১ আনিসুর রহমান, 'গ্লোবালাইজেশন : দি ইমার্জিং আইডিওলজি অব্ দি পপুলার প্রোটেস্টস্ অ্যান্ড গ্রাসরুট্স অ্যাকশন রিসার্চ'. *অ্যাকশন রিসার্চ*, ২ : ১, মার্চ ২০০৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরাদ্দের প্রশ্ন করা হয় না যখন তার আয়ক্ষমতা আর নাও থাকতে পারে। সব মিলিয়ে এই ধরনের দারিদ্র্য প্রত্যয় ও দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য উদ্বেগ সাধারণ মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্যই করে না, গবাদি পশুর মতোই গণ্য করে যে পশু থেকে অপরে দুধ, মাঠ-শ্রম, মাংস ইত্যাদি আদায় করতে পারবে যতদিন তাদের এগুলি দেবার ক্ষমতা থাকবে, তারপর তাদের ফেলে দিলেই চলবে। বলা বাহুল্য দারিদ্র্য-গবেষকদের এবং দারিদ্র্য-'বিমোচনেচ্ছু'দের এই মানসিকতা অত্যন্ত বিস্ময়কর, অমানবিক ও দুঃখজনক। আমার বর্তমান আলোচনা মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য করে তার দারিদ্র্যের সংজ্ঞা এবং এই আলোকে দারিদ্র্যবিমোচনের অর্থ ও উদ্দেশ্য আনুসন্ধান করা।

মানুষের সঙ্গে পশুর কিছু-কিছু মিল অবশ্যই আছে। কিন্তু মানুষ তো তবু পশু নয়, পশুর সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এবং এই পার্থক্য রয়েছে বলেই মানুষ মানুষ এবং তার ভেতরকার 'পশু'র চাহিদার ওপরে মানুষ হিসাবে তার অত্যন্ত মৌলিকভাবে ভিন্ন কিছু চাহিদা আছে। এই চাহিদাগুলির পূরণ না হলে সে মানুষ হিসাবে দরিদ্র থেকেই যায়। এই চাহিদাগুলি কী?

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ আজকের দিনের মানুষের তুলনায় দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী অত্যন্ত 'দরিদ্র' ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু তারা জীবনধারণের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করার সাথে সাথেই শিল্পকলার কয়েকটি শাখায় উৎকর্ষ ও পারদর্শিতার পরিচয় রেখে গেছে (গুহাপ্রাচীরে এবং পর্বতগাত্রে তাদের অঙ্কনশৈলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজও রয়েছে)। গুহাজীবন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ আধুনিক জীবনের দিকে অগ্রসর হবার প্রক্রিয়ায় কেবল বেঁচে থাকবার চাহিদাই মেটাতে চায়নি, একই সাথে তাদের সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যস্পৃহা চরিতার্থ করবারও প্রয়াস করে গেছে এবং এদিকে নতুন নতুন অভিনব অবদান রেখে গেছে। একই সঙ্গে মানুষ *জ্ঞান* অর্জনের জন্য—জানবার জন্য, "আমি কে, এই মহাবিশ্বে আমার স্থান কী"—এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে, এবং সৃজনশীল কাজে তার জ্ঞান প্রয়োগের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। মানবপ্রজাতির (হোমো সেপিয়েন) এই বৈশিষ্ট্যই তাকে অন্য সকল জীবজন্তু থেকে আলাদা করে। একথা বলাই বাহুল্য যে, মানুষের দেহধারণের জন্য যেমন ক্যালোরি প্রয়োজন তেমনি জ্ঞান, সৌন্দর্য ও সৃজনশীলতা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির চর্চার জন্য তার মস্তিষ্কেরও পুষ্টি (অনুশীলন) প্রয়োজন।

আর আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষরা এও দেখিয়েছে যে, মানুষ বেঁচে থাকবার—দেহধারণের প্রচেষ্টা ও নান্দনিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনো অগ্রপশ্চাৎ বিচার করেনি। যুগে যুগে মানুষ একই সঙ্গে শারীরিক ও নান্দনিক চাহিদা পূরণ করবার প্রয়াস করে চলেছে উভয় প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে, কখনো স্বেচ্ছায় শারীরিক প্রয়োজনের চেয়ে নান্দনিক প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্বও দিয়ে। যেমন, কখনো কখনো মানুষ দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি সংগ্রহ, বা দেহরক্ষার জন্য চিকিৎসার চাইতে বেশি সময়, মেধা ও শ্রম দিয়েছে জীবনের শৈল্পিক চাহিদাগুলো মেটানোর জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও আমরা যারা বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ বা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেদের দাবি করি, তারা কীভাবে বলতে পারি যে মানুষকে তার ***'মৌলিক মানবিক চাহিদা'*** অগ্রাহ্য করে শুধু তার ***'মৌলিক দেহধারণের চাহিদা'***কেই পূরণ করতে হবে? অথবা মানুষের 'মৌলিক মানবিক চাহিদা'গুলো 'দেহধারণের চাহিদা' পূরণের পরে হবে? 'দরিদ্র' জনগোষ্ঠী তাদের 'দেহধারণের চাহিদা' পূরণ করতে পারলেই আমরা অনেকেই মনে করি তারা 'দারিদ্র্য-রেখার' ওপরে উঠে এসেছে এবং এ কারণে সন্তোষ প্রকাশ করি, এবং তারপর সোচ্চার হয়ে প্রচার করি—দেশে লক্ষণীয় 'উন্নয়ন' হয়েছে!

দারিদ্র্য সম্বন্ধে 'রবিদর্শন'

মানুষের মানবিক চাহিদা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিছু উক্তি অনুধাবনীয় :

> কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্য তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। *[রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী, ১৯০৮ : ১]*
>
> রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। *[রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ২, আনন্দবাজার পত্রিকা, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৪১ : ২৭৭]*
>
> কাছের কোন গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোন একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন এ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তাহলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, এ আমি বিক্রী করব না। এই যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ যার দাম সকল দামের চেয়ে বেশি তাকে অকেজো বলে উপেক্ষা করব না কি? *[ঐ : ২৭৭]*

রবীন্দ্রনাথ আর এক জায়গায় বলেছিলেন : "দারিদ্র্য সমস্যাটি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। সুখের অভাবই বড়ো সমস্যা। ... সুখ সৃষ্টিশীল, তাই এর নিজের ভিতরেই ধন রয়েছে।[২]

অর্থাৎ তিনি মানুষের অভাব (যাকে প্রচলিত চিন্তায় 'দারিদ্র্য' বলা হয়) বলতে তার জীবন থেকে আনন্দের অভাব বুঝেছেন, এবং এই আনন্দের উৎস দেখেছেন তার সৃষ্টিশীলতার অনুশীলনে যার মধ্যে, বলা বাহুল্য, তার সুকুমার বৃত্তিসমূহের চর্চা অন্যতম। এই প্রসঙ্গে তাঁর মানুষের নানাবিধ নতুন নতুন সৃষ্টির তৃষ্ণা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উক্তিও অনুধাবনীয় :

> সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা-পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্তঃকরণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে সর্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্বল করে এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে বলে উঠল—আমি অসাধ্য সাধন করব। অর্থাৎ যা চিরদিন হয়ে আসছে তাই যে চিরদিন হতে থাকবে সে আমি সইব না, যা হয় নাই তাও হবে। ...

২ উদ্ধৃতিটি লেখকের ব্যক্তিগত সংকলন থেকে নেওয়া, যদিও এর সূত্রটি হারিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা হয় নি তার দিকে সে এগোবে; তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে নয়, অন্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে। *["সত্যের আহ্বান", কালান্তর, রচনাবলী ২৪, ১৮৮০,৩২০-২]*

অর্থাৎ যা নেই তা সৃষ্টি করবার স্পৃহা মানুষের একটা বড় স্পৃহা, এবং এই লক্ষ্যে চলতে না-পারাটাও তার জন্য মানুষ হিসাবে বড় দারিদ্র্য। সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগের জন্য মানুষের অবশ্যই বেঁচে থাকবার ন্যূনতম উপকরণসমূহ প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো পাওয়া মানুষের জীবনের লক্ষ নয়; এতে তার দারিদ্র্য ঘোচে না যদি সৃষ্টিশীল মানুষ হিসাবে সে নিজেকে চরিতার্থ করবার সুযোগ না পায়।

দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত দারিদ্র্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের অত্যন্ত মৌলিক চিন্তা আমাদের মূলধারার দারিদ্র্য-চিন্তাবিদদের কাছে কোনো স্বীকৃতি পায়নি। দারিদ্র্য-চিন্তাবিদ্‌গণ, যারা নিজেরাও এই মানুষদেরই স্বজাতি, তাদের কাছ থেকে দারিদ্র্য চিন্তায় ও সংলাপে মানুষকে পশুবৎ গণ্য করা প্রত্যাশা করা যায় না, যে অবস্থান প্রজাতিগতভাবে তাদের নিজেদেরকেই পশুর সমতুল্য গণ্য করে ফেলে![৩]

রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য অসাধারণ সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যসন্ধানী ছিলেন, এবং মানুষ সম্বন্ধে তাঁর সুব্যক্ত দর্শন স্বভাবতই এই দিকেই ঝুঁকেছিল। মানুষের মানুষ হিসাবে মৌলিক চাহিদা আরো কিছু আছে, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের দারিদ্র্য সম্বন্ধে লেখায় তেমনভাবে উপস্থাপিত না হলেও তাঁর মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বঞ্চনা সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অজস্র গল্প-উপন্যাস-কবিতায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন তাঁর 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনের দারিদ্র্য তো শুধু তার ভাত-কাপড়-বাসস্থানের প্রশ্নে

৩ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল—অনুকম্পাশীল নয়—যে-কোনো বড় চিন্তাবিদ্-দার্শনিকই রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকে সৃষ্টিশীল হিসাবে দেখেছেন এবং তার এই সৃষ্টিশীলতার বিকাশ দেখতে চেয়েছেন। কার্ল মার্কস শ্রমিকশ্রেণীকে—যাদের অনেক বিপ্লবী মহলে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে 'সর্বহারা' বলে অভিহিত করা হয়—কখনো 'দরিদ্র' বলেননি, এবং বিপ্লবের উদ্দেশ্য তাদের 'দারিদ্র্য বিমোচন' নয়, শ্রমিকশ্রেণী তাদের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে তাদের নিজেদের ইতিহাস নিজেরা রচনা করবে এই কথাই বলেছিলেন; মাও-জে-দংও চীনা-বিপ্লবের আগে বা পরে কখনোই দারিদ্র্য বিমোচনকে বিপ্লবের লক্ষ্য বলেননি, বিপ্লবের পর বলেছিলেন চীনাজাতি এখন উঠে দাঁড়িয়েছে, বিশ্বকে সে দেখাবে সে কী করতে পারে, এবং চীনের কৃষকদের চিন্তা-বুদ্ধিকে সবার চিন্তা-বুদ্ধি থেকে অগ্রসর ঘোষণা করে তাদের এইভাবে শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাদের প্রেরণা দিয়েছিলেন তাদের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে। এই সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় চীনের মানুষের ভাত-কাপড়ের দারিদ্র্য আপনা থেকেই বিমোচিত হতে থাকে, যেখানে 'দারিদ্র্য বিমোচন'কে জাতির উন্নয়নের লক্ষ্য ঘোষণা করে আজ পর্যন্ত কোনো জাতি তার ভাত-কাপড়ের দারিদ্র্য বিমোচনের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে পারেনি, বরঞ্চ দারিদ্র্য-বিমোচনের ব্যবসা প্রসারিত করে সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি করে আপেক্ষিক দারিদ্র্য ও মানুষের বঞ্চনাবোধ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। দুঃখের বিষয় অর্থনীতিবিদদের মহলে—বিশ্বমঞ্চে যারা পুরোভাগে তাদের মধ্যেও—মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ এবং তাদেরই নিজেদের যোগযুক্ত করে তাদের নিজেদের 'দারিদ্র্য' মোচনের পথে এগিয়ে যাবার জন্য নিজেদের সৃষ্টিশীল আর্থসামাজিক উদ্যোগ নিতে আহ্বান করতে দেখা যাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়—তার গভীরতম অভাব ছিল তার মানসিক আশ্রয়বোধের অভাব যেজন্য সে আকুলভাবে পোস্টমাস্টারকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, মানুষের জীবনের ওপর অন্যান্য বহু প্রথম সারির সাহিত্যে এ ধরনের অভাববোধের চিত্রণ রয়েছে। যেমন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী*র অপুর মা যখন অপুকে বলেছিলেন সে যেন কলকাতায় কলেজে পড়বার জন্য না যায়, এই গ্রামেই তার কাছে থাকে পুরোহিতের চাকরি নিয়ে—অপুর মায়েরও তো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের তেমন সমস্যা ছিল না, তিনি একটি দরদী ঘরেই ঠাঁই পেয়েছিলন, তবু তিনি সন্তানের কলেজ-শিক্ষা (আর একটি তথাকথিত 'মৌলিক চাহিদা'!)-র চাইতে তার কাছে থাকাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন একই ধরনের একটা 'আশ্রয়বোধের' অভাব থেকেই। এই অভাব অত্যন্ত গভীর হলেও বিজ্ঞজনের 'দারিদ্র্য'-প্রত্যয়ের মধ্যে গণ্য হচ্ছে না, এবং মানুষের এরকম আশ্রয়বোধের অভাব দূর করে এই গভীর দারিদ্র্য বিমোচনের কোনো চিন্তা বা প্রচেষ্টা একেবারেই করা হচ্ছে না!

দেশের চিন্তাশীল তরুণদের মানবিক দারিদ্র্য-চিন্তা

মানুষের এই গভীর 'আশ্রয়বোধের' অভাব বিমোচনের কথা আমি পরে ফিরে আসব। বর্তমানে মানুষের বিভিন্ন মানবিক চাহিদা ও অভাববোধ সম্বন্ধে এদেশের সাম্প্রতিককালের কয়েকজন তরুণের কিছু চিন্তার উল্লেখ করছি যে চিন্তা তার গভীরতায় এদেশের তথা সমস্ত বিশ্বের দারিদ্র্য চিন্তার মূলধারাকে চ্যালেঞ্জ করে। ২০০২ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় দারিদ্র্য-গবেষণা ও অধ্যয়ন সংস্থা 'রিইব'-এর উদ্যোগে কয়েকজন তরুণ সাংবাদিকতার ছাত্র-ছাত্রী এবং সাংবাদিকদের 'পার্টিসিপেটরি রিসার্চের' ওপর একটি কর্মশালা হয় যেখানে এই তরুণদের কাছ থেকে মানুষের মানুষ হিসাবে মৌলিক চাহিদা চিহ্নিত করতে আহ্বান করা হয়। এর উত্তরে এই তরুণদের মতামত আসে এরকম[৪] :

মানুষ কীসে 'মানুষ'

কোন্ কোন্ চাহিদা বা বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষ 'মানুষ' হয়?

খালেদা ইয়াসমিন : মানুষ আত্মসম্মান নিয়ে, অন্যের ওপরে নির্ভর না করে স্বনির্ভর হয়ে বাঁচতে চায়।

দিলরুবা আক্তার : মানুষ সভ্য ও সুন্দরভাবে বাঁচতে চায়, সৌন্দর্যের চাহিদা তৃপ্ত করে।

৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষ (সম্মান)-এর ছাত্রছাত্রীদের সাথে অংশগ্রহণভিত্তিক কর্মমুখী গবেষণা বিষয়ে রিইব-ওয়ার্কশপ ২৫শে জুন—১৮ই জুলাই ২০০২। রিপোর্ট প্রস্তুতকারী : কুর্‌রাতুল-আইন-তাহমিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাঙ্গীর : মানুষ মানুষের কাছে সামাজিক দায়দায়িত্ব আশা করে।

শুক্লা সরকার : মানুষের বুদ্ধি বিকাশেরও দরকার আছে।

জান্নাতুল : মত প্রকাশের অধিকার চাই।

আসমা : মানুষ অন্যের করুণা নিয়ে বাঁচতে চায় না, আপন বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেকের বলে বাঁচতে চায়।

শামীম : মানুষের জানার আগ্রহ আছে।

দিদার : মানুষের সৃষ্টিশীলতার তাগিদ আছে।

সেকান্দর : মানুষ পরিবর্তন চায়। সবসময়ই উন্নয়ন খোঁজে।

মনিরুজ্জামান : অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি প্রাথমিক চাহিদা মেটার পরে মানুষ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে। আজকের প্রয়োজন মিটলেই তার চলে না। মানুষ লোভীও বটে।

রিটন : মানুষ পশুর আচরণ করতে পারে (আনিসুর রহমান বললেন পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করতে পারে) কিন্তু পশু মানুষের আচরণ করতে পারে না।

আলোচনা এই খাতে এলে সাব্যস্ত হয় যে মানুষ সৃষ্টিশীলভাবে ধ্বংসাত্মকও হতে পারে।

...

এই পর্যায়ে ইতিবাচক মানবিক চাহিদা তথা গুণাবলির তালিকা করেন অংশগ্রহণকারীরা :

> অতিথিপরায়ণতা, পরার্থপরতা, শিল্পকলার রুচি, সংস্কৃতির তাগিদ, ন্যায়বিচারের চেষ্টা/চাহিদা, খাপ খাওয়ানোর ও অন্যের চাহিদাকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা, পরস্পরের জন্য মায়া-সহানুভূতি-প্রীতি, শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা, পরস্পরের সাথে একাত্মবোধ এবং সৌভ্রাতৃত্ব।
>
> ...

এই প্রসঙ্গে কথা ওঠে মানুষের বেছে নেবার ক্ষমতা এবং অসহায়ত্বের ব্যাপারে। যেমন, কোনো মা যখন দেখেন তাঁর শিশু না-খেতে পেয়ে মরতে বসেছে তখন তাঁর নিজস্ব অন্য প্রয়োজন গৌণ হয়ে যেতে পারে। এক অর্থে চাহিদার বাছাই তিনি করছেন কিন্তু সত্য বিচার করতে গেলে বলতে হবে এই বাধ্যবাধকতা দারিদ্র্যেরই আরেক প্রকাশ।

আলোচনায় আরও বলা হয় আজকের দিনে সামাজিক যে অবক্ষয় আর নিরাপত্তাহীনতা তা মানুষের অনেক চাহিদাকে দমিয়ে রাখে। নিজের ইতিবাচক চাহিদা প্রকাশ করতে এবং বঞ্চনার প্রতিবাদ করতে মানুষ এখন ভয় পায়। রাজনৈতিক স্বার্থও চাহিদাকে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটা ভাত-কাপড়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

মানুষের মৌলিক চাহিদা সম্বন্ধে এদেশের চিন্তাশীল তরুণদের যে এ-ধরনের স্বাধীন ও গভীর মতামত আছে একথা কয়জন দারিদ্র্য-গবেষক এবং দারিদ্র্য-বিমোচনেচ্ছু সংস্থার জানা আছে সেকথা জানি না। তার চেয়েও বড় কথা, দেশের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের তরুণ, অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মতামত নেবার কি একেবারেই প্রয়োজন নেই?

হতদরিদ্রদের গবেষণালব্ধ দারিদ্র্য-চিন্তা

—তুমি কি জানো লক্ষ্মী কে আর সরস্বতী কে?

—হ্যাঁ।

—লক্ষ্মী কে?

—ভাত, কাপড়, ঘর।

—আর সরস্বতী?

—সাহুকারের* জ্ঞান। (*সুদী মহাজনের)

—যদি শুধু একজনকে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে তোমরা কাকে বেছে নেবে?

—সরস্বতীকে।

—কেন?

—যদি সবার কাছেই জ্ঞান থাকে তাহলে কেউ কাউকে ঠকাতে পারবে না।[৫]

AMARBOI.COM

আরো মৌল প্রশ্ন : যাদের 'দরিদ্র' বলা হয় তাদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে নিজস্ব সুচিন্তিত মতামত কী? এই প্রশ্নেও সম্প্রতি আলোকপাত হয়েছে উত্তর বাংলার নীলফামারী জেলায় একটি 'গণ-গবেষণা' প্রকল্পে।

আধুনিক সভ্যতায় জ্ঞানসন্ধানের সমস্ত প্রক্রিয়া 'শিক্ষিত'শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে গিয়েছে, যেন একমাত্র তারাই সমাজের জন্য, তার উন্নয়নের জন্য, প্রয়োজনীয় জ্ঞান সন্ধান করবার যোগ্য এবং অধিকারী। 'শিক্ষিত'রা সমাজের প্রচুর সম্পদ খরচ করে গবেষণা করে, দেশ-বিদেশে জ্ঞানসন্ধানে ভ্রমণ করে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার-কনফারেন্স-ওয়ার্কশপ করে। এতে সাধারণ মানুষের কতটা সুফল হয় তা বিবেচ্য, অন্তত বিশ্ব-জনগণের দারিদ্র্য-বিমোচনে তা যে খুব একটা সহায়ক হয়নি একথা বোধ হয় প্রশ্নাতীত। একথাও বোধহয় বলা যায় যে জ্ঞানার্জনের জন্য বিশ্বে যুগ যুগ ধরে যে

৫ ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের পালগড় তালুকের একজন নিপীড়িত আদিবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। (জিভিএস ডি সিলভা ও অন্যান্য, ভূমি সেনা, এ স্ট্রাগল্ ফর পিপলস্ পাওয়ার, ডিভেলপমেন্ট ডায়েলগ, ১৯৭৯ : ২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপুল পরিমাণ সম্পদ 'শিক্ষিত'শ্রেণী আত্মসাৎ করে এসেছে তাতে সব সমাজেই সামাজিক সম্পদ বিতরণে বৈষম্য বেড়েছে এবং এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের ওপর মালিকানার বিপুল বৈষম্যের কারণেও সাধারণ জনগণের ওপর 'শিক্ষিত' শ্রেণীর প্রভুত্ব বেড়েছে। আজকে বিশ্বব্যাপী 'পার্টিসিপেটরি রিসার্চের' যে আন্দোলন চলেছে তার একটি মূল উদ্দেশ্য সামাজিক গবেষণা-জ্ঞানচর্চায় এই বিরাট বৈষম্য এবং তদ্‌জাত সামাজিক শোষণ কমাবার চেষ্টা করা, এবং সাধারণ জনগণকে তাদের নিজেদের সমস্যার উত্তর সন্ধানে নিজেদের জ্ঞানচর্চার সুযোগ ও প্রেরণা দেওয়া যাতে তারা তাদের সমস্যা সমাধানে পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থাকে যে পরনির্ভরশীলতা তাদের দারিদ্র্যবিমোচনে সার্বিকভাবে নেতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে।

সম্প্রতি দশমাসব্যাপী একটি প্রকল্পে নীলফামারী জেলার বিরাট অঞ্চল জুড়ে যাদের 'হতদরিদ্র্য' বলা হয়, এরকম শ্রেণীর মানুষদের তাদের জীবন-যাপনের অবস্থা সম্বন্ধে এবং তাদের জীবন কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে তাদের নিজেদের যৌথভাবে অনুসন্ধান করতে উজ্জীবিত (animate) করা হয়। এ ধরনের 'গণগবেষণা'য় অংশ নেন নীলফামারী জেলার ১৫টি ইউনিয়নে মোট প্রায় চার হাজার অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষ, যাদের মধ্যে আছেন প্রায় তিন হাজার মহিলা এবং প্রায় এক হাজার পুরুষ। এই 'গণগবেষক'রা নিজ নিজ গ্রামে ২০-৩০ জন সংখ্যায় হতদরিদ্র্যদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একদিন মিলিত হয়ে চলেছেন তাদের নিজস্ব গবেষণা-'ওয়ার্কশপে', সেখানে তারা যৌথভাবে অনুসন্ধান করছেন দারিদ্র্য কী ও কত ধরনের, দারিদ্র্যের কারণ কী এবং কোন্ দারিদ্র্য কীভাবে তাদের জীবনে এসেছে, দারিদ্র্য দূর করবার এবং দারিদ্র্য যাতে তাদের জীবনে নতুনভাবে আসতে না পারে তার উপায় বের করা, দারিদ্র্য দূর করা এবং ঠেকাবার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সেগুলো বাস্তবায়িত করা। এবং এই যৌথ গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের ভাষায় তাদের 'মগজকে শাণ দিয়ে' পারস্পরিক সহযোগিতায় এবং এককভাবেও তারা নানাবিধভাবে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এবং দলবদ্ধভাবে তাদের শ্রম শোষণ প্রতিরোধ করে মজুরি বাড়িয়ে এবং অন্যান্য অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ করে তাদের আর্থিক উন্নতি শুধু নয়, পারিবারিক আন্তঃসম্পর্ক উন্নতি, স্বামীদের জুয়াখেলা বন্ধ করা, ঋণের অপেক্ষায় না-থেকে নিজেদের সঞ্চয়-ফান্ড শুরু করা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-কলহ কমিয়ে আনা, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধ করা ও আরো নানাভাবে নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান উন্নত করা, শিশুদের মানবিক বিকাশে সচেষ্ট হওয়া—এ ধরনের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড শুরু করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে তাদের মতো অবস্থানের অন্যদের কাছে তাদের এই আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি প্রচার করে তাদেরও গণগবেষণায় প্ররোচিত করছে এবং এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করছে।

৬ *প্রকল্প : 'দারিদ্র্য বিমোচনে একদল এনিমেটর গড়ে তোলা'—নীলফামারী, আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি প্রতিবেদন*, প্রধান গবেষক : আলাউদ্দিন আলী, রিইব, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গণগবেষণা প্রক্রিয়ার—যে প্রক্রিয়া অপরিকল্পিত ও অত্যন্ত অনুপ্রেরণাময়ভাবে প্রকল্পের অভীষ্ট জনগণকে ছাড়িয়ে নীলফামারী জেলার বহু এলাকায় অন্যান্য 'শ্রেণী' যেমন তরুণ-সম্প্রদায় এমনকি শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে। রিপোর্টটি আমি আগ্রহী সবাইকে পড়তে বলব[৮]। বর্তমান দারিদ্র্য-প্রত্যয়গত নিবন্ধে এই কথাটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে অভীষ্ট জনগণ তাদের বিভিন্ন অভাব চিহ্নিত করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে নানান বিতর্কের পরে, এই প্রকল্পের রিপোর্টে যে ভাষায় লেখা আছে : "শেষ পর্যন্ত জ্ঞান-বুদ্ধির অভাবই যে মূল অভাব এই যুক্তিতেই সকলে একমত হল। এটা আসলে সদস্যদের নিজেদের আবিষ্কার ... এবং তারা অনুপ্রাণিত হন। তখন মাথা খাটানোর গুরুত্ব তাদের নিকট অনেক বেড়ে যায়। তার পরই সেই জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু ভাবতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন বুদ্ধি-জ্ঞানের চর্চার প্রশ্নটা প্রধান হয়ে ওঠে।"[৭]

গত মার্চ মাসে আমি নিজে আর কয়েকজন (দেশী ও বিদেশী) সতীর্থের সঙ্গে এই প্রকল্প দেখতে যাই, এবং আমাদের কয়েকটি গণগবেষণা গ্রুপের কাছ থেকে দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্বন্ধে তাদের সুচিন্তিত মতামত, তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের নিজস্ব প্রচেষ্টার কাহিনী এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টাজাত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ শোনবার সৌভাগ্য হয়। অক্টোবর/০৪ইং মাসে নীলফামারী শহরে এই প্রকল্পের সমাপ্তিকালে সিভিল সোসাইটির এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এর ওপর রিপোর্ট পেশ করা হয়, সেখানেও আমি উপস্থিত ছিলাম। মাঠ-পর্যায়ের আলোচনা এবং নীলফামারীতে আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট উভয় ক্ষেত্রেই একবাক্যে গণগবেষকদের প্রতিনিধিরা বলেন যে তাদের <u>নিজেদের যৌথ জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চার অভাবই তারা তাদের সবচেয়ে মৌলিক অভাব বলে বুঝতে পেরেছেন।</u> এর কয়েকটি কারণ তাঁরা বিভিন্ন জনে ব্যাখ্যা করেন :

১. যৌথ চর্চার অভাবে তারা একা-একা বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন সমস্যার কূল পাননি, এবং হতাশ হয়ে চিন্তা করাও ছেড়েই দিয়েছেন, কিন্তু এখন যৌথভাবে জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চা করে তারা প্রত্যেকের সমস্যায় পরস্পরের জ্ঞান-বুদ্ধি একত্র করতে পারছেন, এবং এই প্রক্রিয়া তাদের নিজেদের একক ভাবেও আরো গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে অনুপ্রাণিত করছে এবং এইভাবে যৌথ ও নতুন করে একক চিন্তার ফলে তারা তাদের ভাত-কাপড়ের দারিদ্র্য বিমোচনের পথে আগের চাইতে বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন;

২. নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর আস্থা হারিয়ে আত্মঅনুসন্ধান না করে তারা শিক্ষিতশ্রেণীর জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, যে নির্ভরতা তাদের উপকার না করে আরো ক্ষতি করেছে;

৩. নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি না-খাটালে বাইরে থেকে কোনোরকম সাহায্য-ঋণ ইত্যাদি পেলেও বা অন্য কোনোভাবে তাদের কিছু অগ্রগতি হলেও তার সুফল বেশিদিন থাকে না—অপচয়, অপব্যবহার বা মিস্‌ম্যানেজমেন্ট হয়ে আবার দারিদ্র্য ফিরে আসে।

৭ উপরোক্ত রিপোর্ট, পৃ. ১০।

৮ চাপড়া ইউনিয়নের বাবড়িঝড় গ্রামের আলেজা। উদ্ধৃতিটি রিইব-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩-৪ থেকে (পৃ. ৩৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রসঙ্গে একজন অর্থনৈতিকভাবে দুঃস্থ গণগবেষকের বক্তব্য উদ্ধৃতি দেয়া যায় :

> আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকলে শুধু টাকা আমাদের উপকার করতে পারে না। এমনকি টাকা আমাদের ক্ষতিও করতে পারে। জ্ঞান-বুদ্ধি টাকার চেয়ে বড়ো।[৮]

গণগবেষণা থেকে দরিদ্র জনগণ এইভাবে তাদের একটি অত্যন্ত মৌলিক চাহিদা চিহ্নিত করেছেন যার স্থান তাঁদের সুচিন্তিত মতে সর্বাগ্রে, যার অভাব দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, তাকে টিকিয়ে রাখে এবং বাড়ায়, দারিদ্র্য বিমোচনের পথে তারা কোনোভাবে এগুলেও এই অভাব তাদের আবার পেছনে পিছলিয়ে দেয়, আর বলাবাহুল্য এই অভাব তাদের নিজেদের মানবিক বিকাশের পথেও বাধা হয়ে থাকে। এই অভাব প্রথাগত দারিদ্র্য বিমোচন চিন্তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব নয়। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এই বক্তব্য নয়, এই অভাব যৌথভাবে জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চা করবার সুযোগের অভাব, যে সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিতশ্রেণী সমাজের সম্পদ দিয়েই নিজেদের জন্য করে নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন। এই অত্যন্ত মৌলিক মানবিক চাহিদাটি প্রথাগত দারিদ্র্য প্রত্যয়ে, দারিদ্র্য সংলাপে এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় অনুপস্থিত।

'আশ্রয়বোধের' অভাব

বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে আশা করি দারিদ্র্য-প্রত্যয়ে এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় এই অভাবটি দূর করবার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা আর ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই। 'পোস্টমাস্টারের' রতন আর 'পথের পাঁচালির' অপুর মার যে 'আশ্রয়বোধের' অভাবের কথা প্রথমদিকে উল্লেখ করেছি সেই আশ্রয়বোধের অভাবের সমস্যার সমাধানও এই দিকেই—এরকম 'আশ্রয়াভাবগ্রস্ত' মানুষ 'আশ্রয়' পেতে পারে তার একক সত্তা থেকে উন্নীত হয়ে এরকম যৌথ সত্তার সদস্য হয়ে, যে যৌথ সত্তা তাকে একটা বৃহত্তর 'পরিবারের' সঙ্গে একাত্ম করে তাকে একটা সহায় দেবে, যে সত্তা তাকে সুখে-দুঃখে সঙ্গ দেবে, যে সত্তা তার মানবিক বিকাশে অবদান রাখবে ও সহায়তা দেবে এবং যে সত্তার বিকাশে সেও তার নিজের অবদান রেখে আত্মতৃপ্তি পাবে। এরকম একটি সত্তার সদস্য হলে তবেই অপুদের স্বামীহারা মা-সকল তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা তথা জীবনবিকাশের পথে অন্তরায় হবেন না নিজেদের আশ্রয়বোধের অভাবে, বরং হাসিমুখে সন্তানকে এগিয়ে দেবেন জীবনবিকাশের জন্য তাদের ছেড়ে দূরদূরান্তে চলে যেতে। এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মানুষে মানুষে পরস্পরের মধ্যে এরকম (sense of belonging) পারস্পরিক একাত্মবোধ সহমর্মিতা ও সহযোগিতার অভাবই দারিদ্র্যের গভীরতম প্রকাশ এই সত্যটাই এই গণগবেষণা থেকে এবং এই গবেষণার ফলে এই একাত্মবোধের পুনর্জন্মে , আত্মপ্রকাশ করেছে।

উপসংহার 'যৌথ আত্মনির্মাণ'

মার্চ মাসের নীলফামারীর গণগবেষণা দেখতে যাবার সফরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সুইনবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এড্‌জাঙ্কট্ প্রফেসর এবং আন্তর্জাতিক এ্যাকশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিসার্চ এসোসিয়েশনের সভাপতি ইয়োলান্ড ওয়াড্ওয়াথ্। তিনি এই গণগবেষণা আন্দোলন দেখে এতই মুগ্ধ হন যে, বলেন—যদি অর্থ জোগাড় করতে পারেন তাহলে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্থানের আদিবাসী সম্প্রদায়রা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে যে আন্দোলন করছে তাদের নেতাদের বাংলাদেশে এনে নীলফামারীর এই গণগবেষণা আন্দোলন দেখাবেন। অস্ট্রেলিয়া ফিরে যেয়ে তিনি তাঁর বাংলাদেশ সফরের ওপর একটি রিপোর্ট লিখে পাঠান, যে রিপোর্টে তিনি গণগবেষণায় মানুষের পরস্পরকে 'শাণিত' ও পরস্পরকে 'নির্মাণ' করবার প্রক্রিয়াকে[৯] 'নয়া পদার্থবিজ্ঞানের' 'অটোপোয়াসিস্' প্রত্যয়ের সঙ্গে তুলনা করেন। গ্রিক ভাষায় 'পোয়াসিস' শব্দের অর্থ 'নির্মাণ', অর্থাৎ 'অটোপোয়াসিস্' অর্থ আত্মনির্মাণ। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও পরিবেশ গবেষক ফ্রিচফ্ কাপরা তাঁর *ওয়েব অব্ লাইফ্* বইতে[১০] 'অটোপোয়াসিস্' প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন যে, যে-কোনো প্রজাতির যৌথ আত্মবিকাশের জন্য নিজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন ও সহযোগিতার একটা বন্ধন প্রয়োজন, এবং যে প্রজাতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কে এই বন্ধন দুর্বল হয়ে যায় সেই প্রজাতির পক্ষে জীব-বিবর্তনে টিকে থাকবার সম্ভাবনাই কমে যায়।[১১] মানবপ্রজাতির অধিপতি শ্রেণীসমূহ এই বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপর শ্রেণীসকলের সঙ্গে মিলনের পরিবর্তে তাদের শোষণে মত্ত হয়ে গিয়েছে, এমনকি এই শোষণের সুবিধার জন্য ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রও প্রস্তুত ও লালন করে চলেছে (সৃষ্টিশীলভাবে, যে কথা বলে সাংবাদিকদের ওয়ার্কশপে উঠেছিল!)। এই পারস্পরিক হিংসা-দ্বন্দ্ব-সন্ত্রাস-হানাহানির সংস্কৃতির বিকাশের ফলে মানবপ্রজাতির অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে—এই আশঙ্কা আজ অনেক মহলই করছেন। এই ধ্বংসাত্মক গতি রোধ করতে হলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিলন ও সহযোগিতার প্রক্রিয়াগুলিকে যৌথ আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়া পুনর্জাগরিত করা বিশেষ প্রয়োজন[১২], যে পথে নীলফামারীর 'হতদরিদ্র' গণগবেষকগণ এদেশের জন্য পথপ্রদর্শক। মানুষের দারিদ্র্যবিমোচনের মানবিক ও আর্থিক দুই প্রকার দারিদ্র্যেরই নিশ্চিত ও চূড়ান্ত পথ এইটিই।

AMARBOI.COM

৯ "পরস্পরকে শাণিত করা" ও "পরস্পরকে নির্মাণ করা" এই দুটি কথা দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টু সম্প্রদালের নিজস্ব ভাষা থেকে নেয়া। আমার লেখা *পিপলস্ সেল্ফ ডেভেলপমেন্ট* বই (জেড্ বুকস্ ও ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৩, পৃ ২২২ দ্র.)

১০ (এঙ্কর বুকস্, ডাবল্ডে, লন্ডন, ১৯৯৬)।

১১ এই অনুসিদ্ধান্ত ডারউইনের বিবর্তনবাদকে আরো গভীরতা দেয়।

১২ রবীন্দ্রনাথও এই প্রক্রিয়াকেই, এই "ঐক্যবোধের মন্ত্র"কেই, শিক্ষার মূলমন্ত্র বলেছেন (বিষ্ণু বসু ও বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ ২৯), এবং মানব-সভ্যতার সংজ্ঞাই দিয়েছেন এই ঐক্যের সুরে : "অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে মহৎ ফল ফলে। ... বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ।" ('ভারতবর্ষীয় সমাজ', আত্মশক্তি, রচনাবলী ৩, পৃ ৫২০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতীন সরকার

অমূল্য বিদ্যাধনের মূল্যহীনতা

বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অন্ত নেই। 'বিদ্যা অমূল্য ধন'—এমন কথা আমরা আবহমানকাল ধরে শুনে আসছি, এবং কথাটি বিশ্বাসও করেছি এতকাল। কিন্তু ইদানীং এর সত্যতা নিয়ে আমার মনে দারুণ সন্দেহ জেগেছে, এবং কথাটির আসল অর্থ নিয়েও আমি খুবই ধন্দে পড়ে গেছি। এমনকি, 'বিদ্যা' 'অমূল্য' আর 'ধন'—এই তিনটি শব্দের অভিধান-নির্ধারিত অর্থেও যেন এখন আর আস্থা রাখতে পারছি না। বিশেষ করে 'অমূল্য' শব্দটির।

বাংলায় 'অ' একটি বহুরূপী অব্যয় পদ। এই 'অ' দিয়ে যেমন 'অভাব' বোঝায়, তেমনই বোঝায় 'বিরোধ বা বৈপরীত্য'-ও। আবার এই 'অ'-ই কখনও কখনও অন্যত্ব, অল্পতা, অপ্রশস্ততা, অযোগ্যতা এবং যথার্থতাও নির্দেশ করে। বাঙালিরা কথায় কথায় কখনও 'অ'-এর একেবারে ফালতু ও চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর ব্যবহারও করে বসে। যেমন, জোশের আতিশয্যে কেউ বলে ওঠে—'আমি কি অমন্দ কথা বলেছি?' কিংবা 'সে তো মোটেই অমন্দ বলেনি'। এখানে বক্তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ-কথাটাই জানানো যে বক্তা নিজে অথবা অন্য আরেকজন 'মন্দ' কথা বলেনি। অথচ 'মন্দ'-র আগে একেবারেই অর্থহীন একটা 'অ' বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'অমূল্য'-র 'অ'-টা নিশ্চয়ই এ-রকম ফালতু নয়। বাংলা অভিধান আমাদের জানিয়েছে : 'অমূল্য' একটি বিশেষণ পদ, এবং এর অর্থ—'যাহা মূল্য দিয়া পাওয়া যায় না, এত অধিক মূল্য যে কেনা যায় না এমন'। কিন্তু অভিধান যা-ই বলুক, বাস্তবে কি বিদ্যা সত্যিই এমন অমূল্য? আমরা তো দেখছি বিদ্যা এখন একান্তই কেনাবেচার ধন, ধনের অধিকারীরাই এখন বিদ্যালাভের অধিকারী। সমস্ত পণ্যই পেতে হয় মূল্যের বিনিময়ে; এবং বিদ্যাও যেহেতু একটি পণ্য, তাই মূল্য না-দিয়ে বিদ্যালাভের কথা কল্পনাও করা যায় না। ধনহীন মানুষ, তাই, বিদ্যাহীন থাকতে বাধ্য।

অবশ্যি, শোনা যায়, কোনো এককালে নাকি অবস্থা এ-রকম ছিল না। তখন বিদ্যার সঙ্গে বিত্ত বা ধন ছিল সম্পর্কহীন। বরং বিত্তহীন লোকেরাই বিদ্যার সাধনা করত, আর বিত্তবান্‌রা থাকত বিদ্যাহীন হয়ে। ভারতীয় পৌরাণিক কল্পনায় বিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্মী, আর বিদ্যার দেবী সরস্বতী। এই দুই দেবীই আবার বিশ্বের পালনকর্তা দেবতা বিষ্ণুর পত্নী—অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই সতিন। আর সতিনদের সম্পর্ক যে মধুর হতে পারে না—এ-কথা কে না জানে? বিত্তবান্‌রা লক্ষ্মীর পূজারী ছিল বলে সরস্বতী ছিলেন তাদের ওপর একান্তই বিরূপ, তাই তারা বিদ্যাধনে থাকত বঞ্চিত।

এ-রকম একটি যুগ সত্যিই ছিল কি না,—কিংবা সে-যুগটি কখন ছিল—এ-বিষয়ে আমার কোনোই জ্ঞান নেই। আমি কেবল জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই কথাগুলো বললাম। তবে আমি যে-যুগে বাস করছি, এই বর্তমান যুগ যে সেই কল্পিত বা শ্রুত যুগের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—সে তো হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। লক্ষ্মীর প্রতাপ এখন এত প্রবল যে লক্ষ্মীপূজারী বিত্তবান্‌রাই দখল করে নিয়েছে সরস্বতী বিদ্যাধনের ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর হাতে সরস্বতী আজ বন্দিনী। লক্ষ্মীর কৃপাবঞ্চিত যে-সব মানুষ সরস্বতীভক্ত (অর্থাৎ বিদ্যালাভে আগ্রহী নির্ধন যারা), তাদেরকে বরদান করার সমস্ত ক্ষমতাই একালে দেবী সরস্বতী খুইয়ে বসেছেন। তাই তো বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা যায় যে নামিদামি ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরাই ভালো ফল করেছে। নামিদামি ইস্কুল-কলেজ মানে যেখানে অনেক পয়সা খরচ করে পড়তে হয়। অর্থাৎ স্পষ্ট হয়ে যায় যে পয়সাওয়ালা মানুষের ছেলেমেয়েরাই বিদ্যা কিনে আনতে পারে। লক্ষ্মী যার প্রতি বিমুখ, সে-রকম কোনো গরিবের ছেলে বা মেয়ে যতই হোক মেধাবী, ইস্কুলের বেড়া ডিঙোতে গিয়েই সে বারবার হোঁচট খাবে, কিংবা কোনোমতে সে-বেড়া ডিঙোতে পারলেও লক্ষ্মীমন্তের ছেলেমেয়েদের অনেক পিছনে গাড়ি থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হবে তাকে। শুধু ইস্কুলে বা কলেজে গিয়েই তো বিদ্যালাভ করা যায় না, কিংবা কোনোমতে কিছুটা বিদ্যার ছোঁয়া পেলেও সে-বিদ্যা দিয়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের কাঙ্ক্ষিত মুকুটটি মাথায় পরা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন পড়ে ইস্কুল-কলেজের বাইরে কুশলী বিদ্যাবিক্রেতাদের কাছে ধরনা দেওয়ার। সেইসব বিদ্যাবিক্রেতারা যে-দোকান খুলেছেন তার আধুনিক নাম 'কোচিং সেন্টার'। কোচিং সেন্টারে বিদ্যা বিক্রি হয়—এমন কথাও বলা ঠিক হবে না। ওখানে যারা যায় তারা মোটেই বিদ্যার্থী নয়—পরীক্ষার্থী। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা উচিত—নম্বরার্থী। কোচিং সেন্টারের দোকানি তথা প্রাইভেট টিউটরদের মধ্যে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাইয়ে দেওয়ার কায়দা-কানুন শিখিয়ে দিতে পারেন যাঁরা, তাঁরাই হন সবচেয়ে সফল দোকানি, তাঁদের দোকানেই খদ্দেরের ভিড়। খদ্দেররা বিদ্যার বেনামিতে পরীক্ষার নম্বর কিনতেই এ-সব দোকানে যান।

উচ্চতর বিদ্যালাভের জন্য যেতে হয় ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের দেশের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নামের যথার্থতা হারিয়ে ফেলেছে অনেক দিন আগেই। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই তো পরিহাস করে বলেছিলেন যে, 'বিশ্বের বিদ্যা লয় প্রাপ্ত হয়' যে-প্রতিষ্ঠানে সেটিকেই বলে বিশ্ববিদ্যালয়। সেদিনের তাঁর পরিহাসোক্তি তো আজ একেবারে নির্মম সত্যে পরিণত হয়েছে। বিদ্যার বেনামিতে পরীক্ষার ছাড়পত্র কিনে আনার জন্য বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি' নামের যে-সব দোকান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-সব দোকানে প্রবেশের ছাড়পত্র পান কেবল লক্ষ্মীমন্ত বা প্রভূত বিত্তের অধিকারীদের ছেলেমেয়েরাই।

এ-রকম দোকান বা বিপণিকেন্দ্রে প্রবেশের ছাড়পত্র যদি কারো অনুগ্রহে বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো দরিদ্রের সন্তান পেয়েও যায়—এবং বিদ্যার অভিজ্ঞানপত্র (ডিগ্রি) নিয়ে বেরিয়েও আসে—তা হলেই-বা কী হবে? এ-বিদ্যা বা ডিগ্রি তার জীবনকে মূল্যবান করে তুলবে কি? জীবনের আশ্রয় যে-জীবিকা, সেই জীবিকালাভে তাকে সাহায্য করবে কি? সাহায্য যদি করেও, তবু সে-সাহায্য তাকে সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ করে তুলবে না নিশ্চয়! সে-বিদ্যা তাকে লাগাতে হবে লক্ষ্মীমন্তদের সেবার কাজে; সেই সেবার বিনিময়ে সে কোনোরকমে গ্রাসাচ্ছদন করে বেঁচেবর্তে থাকবে মাত্র, মাথা উঁচু করে ও মেরুদণ্ড সোজা রেখে বাঁচার মতো বাঁচতে পারবে না। তখন কি ভাবতে বাধ্য হবে না যে, 'বিদ্যা অমূল্য ধন'-এর 'অমূল্য' কথাটির অর্থ মূল্যহীন ছাড়া আর কিছুই নয়?

দুই

এ-রকম অবস্থাটি হঠাৎ করে একদিনে বা দু-চারদিনে ঘটে যায়নি। অনেক অনেক কাল ধরে চলতে চলতেই বিদ্যার পরিস্থিতিটি আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ভাববাদী দার্শনিকরা বিদ্যাকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। অধিকাংশ ভাববাদী দার্শনিকই দর্শন তৈরি করতেন (এবং আজও করেন) সমাজের কর্তৃত্বশীলদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্যেই তাঁরা 'পরাবিদ্যা'র প্রশংসা করতেন, 'অপরাবিদ্যা'কে নানাভাবেই হেয় করতে চাইতেন। পরাবিদ্যা বলতে তাঁরা বোঝাতেন অধ্যাত্মজ্ঞানকে; ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরলোক, মোক্ষ এবং এ-রকম বিভিন্ন কল্পিত 'পারমার্থিক' বিষয়ই ছিল তাঁদের মতে পরাবিদ্যা—প্রকৃত বিদ্যা, উৎকৃষ্ট বিদ্যা। অন্যদিকে পার্থিব বিষয় নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে বস্তুবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট যে-সব বিদ্যা, সে-সবকে তাঁরা বলতেন 'অপরাবিদ্যা'। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, এ-সব বিদ্যা নিতান্তই নিকৃষ্ট—প্রকৃত বিদ্যাই নয়।

আসল কথাটি হল : তথাকথিত পরাবিদ্যার চর্চায় ব্যস্ত রাখতে পারলে সাধারণ মানুষকে অলৌকিকতার আফিমের নেশায় ডুবিয়ে রাখা যায়, নিগৃহীত ও বঞ্চিত মানুষ তার নিগ্রহ ও বঞ্চনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অনবহিত ও অসচেতন থাকে, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বশীল শক্তি অনায়াসে সাধারণ মানুষকে শাসন-শোষণ করে যেতে পারে। এ-রকম পরাবিদ্যার চর্চা ভারতবর্ষের মানুষকে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় উপনীত করল যে, তাদের মনে হল, সমগ্র বাস্তব বিশ্বটাই 'মায়া' বা ভ্রান্তি। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এই মায়াবাদী দর্শন পুরো জাতিটাকে নিষ্ক্রিয় নির্জীব জড়পিণ্ডবৎ করে তুলল।

অথচ ব্রাহ্মণবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের রক্তচক্ষু তথা শত বাধানিষেধ উপেক্ষা করেও এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপমহাদেশে বস্তুবিজ্ঞানের চর্চা একেবারে কম হয়নি। যেমন—'আয়ুর্বেদ' নামক বিদ্যাটি। আয়ুর্বেদ শুধু রোগ-আরোগ্যের চিকিৎসা-বিধানেরই চর্চা করেনি, 'আয়ু' বা জীবনের গভীর রহস্যের সন্ধানই ছিল এ-বিদ্যার মূল লক্ষ্য। আয়ুর্বেদ-আচার্যরা ভাববাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি, কোনোরূপ অলৌকিক ধ্যান-ধারণাকেই প্রশ্রয় দেননি, আধ্যাত্মিকতার মায়াজাল থেকে আয়ুর্বেদকে মুক্ত রাখতেই তাঁরা চেষ্টা করেছেন। আয়ুর্বেদই হয়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুবিজ্ঞান। আয়ুর্বেদকে অবলম্বন করেই উপমহাদেশে রসায়নশাস্ত্রের বিপুল বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল।

শুধু তা-ই নয়। এখানকার শক্তিশালী বস্তুবাদী দর্শনও শক্তিসঞ্চয় করেছিল আয়ুর্বেদ থেকেই। ঝাড়ফুঁক দিয়ে, মন্ত্রতন্ত্র পড়ে কিংবা পুজোআর্চা করে কোনো রোগগ্রস্ত মানুষকে রোগমুক্ত করা যায় বলে আয়ুর্বেদচর্চাকারীরা বিশ্বাস করতেন না। এ-সবকে তাঁরা বলতেন 'দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ'। অন্যদিকে তাঁরা চর্চা করতেন 'যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ'-এর। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি প্রয়োগের যে-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, আয়ুর্বেদ ছিল সেই পদ্ধতিরই অনুসারী। আয়ুর্বেদ কল্পিত আত্মা ও পরকাল নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে ইহকালে মানুষের বাস্তব দেহমনকে সুস্থ রাখার পথসন্ধানে মনোযোগ দিয়েছিল। পৃথিবী তথা বিশ্বের সবকিছুই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত দিয়ে সৃষ্ট; মানুষের দেহেও এই পঞ্চভূতের বাইরে কোনো অলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব নেই। আয়ুর্বেদের এ-রকম সব সিদ্ধান্তই ভারতে বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভবে ও প্রসারে সাহায্য করেছিল। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বস্তুবাদিতার ভিত্তি ছিল এই আয়ুর্বেদই, বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদও আয়ুর্বেদীয় বস্তুনিষ্ঠা থেকেই পুষ্টি আহরণ করেছিল। সে-কারণেই এখানকার ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বশীলেরা আয়ুর্বেদচর্চাকারীদের উপর ভীষণ চটে গিয়েছিল, এবং একসময় আয়র্বেদের মতো প্রকৃত বিদ্যাকেও 'অপরাবিদ্যা' অপবাদ দিয়ে এর চর্চা ও প্রসারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

AMARBOI.COM

এর ফল, স্বভাবতই, মোটেই শুভ হয়নি। আয়ুর্বেদের মতো একটি শক্তিশালী বস্তুবিজ্ঞানের মুক্তধারাটিকে অবরুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে বস্তুবাদী দর্শনের অগ্রগতিও প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। পরাবিদ্যার নামে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যে অরিদ্যা বা ভয়াবিদ্যার প্রসার ঘটিয়ে চলল তাতে বিদ্যা আর প্রকৃত অর্থে 'অমূল্য ধন' রইল না, একেবারেই মূল্যহীন হয়ে গেল। মানুষের জীবন তথা মনুষ্যত্ব বিকাশেরও সঠিক পথ খোলা রইল না। মূল্যহীন বিদ্যা মানুষকেও মূল্যহীন করে তোলে। কারণ বস্তুবিজ্ঞানের মতো প্রকৃত বিদ্যার চর্চা না-করে বাস্তব পরিপার্শ্বকে বদলানো যায় না, বাস্তব পরিপার্শ্বকে না-বদলাতে পারলে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি ঘটে না, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি না-ঘটলে উন্নত জীবনদর্শনও গড়ে ওঠে না,—মানুষ প্রতিনিয়ত কূপমণ্ডূকে পরিণত হতে থাকে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটে যায়। সমগ্র ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর মানবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং কূপমণ্ডূকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই কূপমণ্ডূকতার দরুনই এখানকার অধিবাসীদের চেতনা থেকে পৃথিবীর অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের অস্তিত্বও যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

একাদশ শতকে বিদেশাগত মুসলিম মনীষী আলবিরুনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের এই কূপমণ্ডূকতার অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। আলবিরুনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন সুলতান মাহ্‌মুদের সঙ্গে, যে-সুলতান মাহ্‌মুদের নাম সোমনাথ মন্দির নামক একটি হিন্দুমন্দির থেকে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ-সূত্রেই এখনও উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ খুব সরলভাবে দেখলে সুলতান মাহ্‌মুদকে একজন 'বিদেশী আক্রমণকারী' ও 'লুণ্ঠনকারী'র অতিরিক্ত কিছু মনে হবে না, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর কোনো ইতিবাচক প্রভাবই শনাক্ত করা যাবে না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই উপলব্ধি ঘটবে যে সুলতান মাহ্‌মুদের মতো বিদেশী অভিযানকারীদের অভিযানের ফলেই তখনকার ভারতবর্ষের গণমানসে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল। সে-ধাক্কায় অনেকেরই বোধের কপাট খুলে গিয়েছিল। অত্যন্ত অস্পষ্টরূপে হলেও তাদের উপলব্ধিতে এসেছিল যে তাদের দেশটাই গোটা পৃথিবী নয়, পৃথিবীটা অনেক বড়, এবং তারা ছাড়াও পৃথিবীতে অন্য জাতের মানুষ আছে। সেই মানুষেরা ব্রাহ্মণ্যবিধান মেনে চলে না, তাদের ভেতর ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদ নেই, তারা বহুদেবতার পূজা করে না। অথচ এ-সব না-মেনেও না-করেও তারা তো বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। বরং সে-সব মানুষ যে অনেক বেশি শক্তিধর—ব্রাহ্মণ্যবিধান-মান্যকারী ও তথাকথিত পরাবিদ্যাচর্চা-কুশলী ভারতবর্ষীয়েরা তা হাড়ে-হাড়ে টের পেল।

আস্তে আস্তে এই শক্তিধররাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। ইসলামধর্মানুসারী এই নতুন কর্তৃত্বশীল শক্তি বিদ্যাচর্চার উত্তরাধিকার বহন করেই এদেশে এসেছিল। বিদ্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট উদার ও বহুমুখী। 'বিদ্যাচর্চা পুরুষ ও নারী সকলের জন্যই ফরজ বা অবশ্যকরণীয়', 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ করো', 'বিদ্বানের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র', 'বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজনে সুদূর চীনেও গমন করতে হবে'—ইসলামের পয়গম্বরের এমন সব বাণীর মধ্যেই এই উদারতা ও বহুমুখিতার পরিচয় ধরা পড়েছে। আখিরাত বা পরলোকে বিশ্বাস অবশ্যই ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু ইসলাম দুনিয়া বা ইহলোককে কখনও 'মায়া' বলে উড়িয়ে দেয় না। দুনিয়া ও আখিরাতে যা-কিছু উত্তম ও মঙ্গলকর তার সবকিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই ইসলামধর্মাবলম্বীদের প্রতিদিনকার প্রার্থনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই তাদের পক্ষে দুনিয়া-সম্পর্কীয় বিদ্যাকে 'অপরাবিদ্যা' বলে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেকারণেই দেখি : শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুবর্তীদের মায়াবাদী দর্শনের দুষ্ট প্রভাবে ভারতবর্ষ যখন ইহলৌকিক বিদ্যাচর্চা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ইহলৌকিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা নিরুৎসাহিত হতে হতে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্যজগতে যখন মধ্যযুগের অন্ধকার নেমে এসেছে, ঠিক তখনই—সেই অষ্টম-নবম শতকেই—আরবজগতে ইসলামধর্মাবলম্বী শাসকবৃন্দ 'ইলম আল-কাদীমাহ্' বা প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে মানবসভ্যতাকে সঞ্জীবিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর-মামুন-হারুন-অর রশিদদের পৃষ্ঠপোষকতায় যদি গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও অনুবাদ না হত, তা হলে পৃথিবী থেকে বিদ্যার ধারাবাহিকতাই হারিয়ে যেত, মানবসভ্যতা তার উৎস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, হয়তো-বা একেবারে আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতার নতুন যাত্রা শুরু করতে হত। শুধু গ্রিকবিদ্যা নয়, ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ ও জ্যোতির্বিদ্যার মতো ইহলৌকিক বিদ্যার সংরক্ষণেও আব্বাসীয় আমলের ইসলাম-অনুসারীদের ছিল ইতিবাচক অবদান। ইহলৌকিক বিদ্যার সনিষ্ঠ চর্চার স্বাভাবিক পরিণতিতেই ঘটে মুক্তবুদ্ধির উজ্জীবন। আর এ-রকম মুক্তবুদ্ধির উজ্জীবনের ফলেই আরবজগতে উদ্ভূত হয় 'মুতাজিলা'র মতো যুক্তিবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ এক বলিষ্ঠ দর্শন। এ-দর্শনের অনুশীলন যদি অব্যাহত থাকত, তা হলে হয়তো দশম-একাদশ শতকের আরবজগৎ থেকেই বিদ্যার নবতর উৎসারণ ঘটত, এবং মানবসভ্যতাও কয়েক শতক এগিয়ে থাকত।

কিন্তু, দুঃখ এই, তেমনটি হতে পারেনি। আরবজগতে ইহলৌকিক বিদ্যাচর্চার সুষ্ঠু প্রবাহটিতে দশম শতাব্দীর পর থেকেই লাগে ভাটার টান। প্রকৃত বিদ্যাচর্চার মধ্যেই মেলে সত্যের সন্ধান, আর সত্যের সন্ধানের জন্যই যেমন একান্ত প্রয়োজন যুক্তিবাদের অনুশীলন, তেমনই প্রয়োজন মনের মধ্যে 'সুসংবদ্ধ সংশয়ে'র পোষণ। কিন্তু প্রথাগত ধর্ম কিংবা আধ্যাত্মিকতা কিংবা রহস্যবাদ তো সবরকমের যুক্তিবাদের যেমন শত্রু, তেমনই শত্রু যে-কোনোপ্রকার সংশয়েরও। নিঃসংশয় ও যুক্তিহীন বিশ্বাসই সবরকম ধর্মচিন্তার আশ্রয়; এবং সে-রকম আশ্রয়েই পুষ্ট হয় অলৌকিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যময়তা। দশম শতাব্দীর পর থেকে আরবজগতে এমনটিই ঘটতে থাকে। ইহলৌকিক বিদ্যার সাধক ও সুসংবদ্ধ সংশয়ের পোষক যুক্তিবাদী ইব্‌নে রুশ্‌দ্-ইব্‌নে সিনারা পেছনে পড়ে যেতে থাকেন, সামনে চলে আসেন নিঃসংশয় বিশ্বাসবাদী আলগাজ্জালি ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ। মুতাজিলা দর্শনটি বিকশিত হওয়ার বদলে হতে থাকে অবদমিত, এবং ক্রমে 'বিশ্বাসবাদ' পোক্ত হতে হতে 'যুক্তিবাদ'কে একেবারেই হীনবল করে দেয়। ভারতবর্ষে যখন ইসলাম-অনুসারী বা মুসলমানরা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তারা ইহলৌকিক বিদ্যাচর্চায় ও যুক্তিবাদে ছিল এ-রকমই হীনবল। তাই ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে ইসলামের অনেক প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বটে, কিন্তু মুসলিম-শাসন এখানে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অর্থাৎ মুসলিম-শাসন-আমলেও উপমহাদেশে ইহলৌকিক বিদ্যাচর্চার ধারাটি প্রায় স্থবির হয়েই থেকেছে। শুধু মুসলিম জগতে নয়, সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেই ইলম-আল-কাদিমা বা প্রাচীন বিজ্ঞানসম্পর্কীয় বিদ্যাচর্চার ধারাটি স্থবির হয়ে গেল। এর বদলে প্রসার ঘটে চলল বস্তুবিজ্ঞান-বিরোধী নানা অপবিদ্যার।

তিন

প্রাচ্যজগৎ থেকে সরে গেলেও আরবদের ইহলৌকিক বিদ্যাচর্চার মশালটি আলো ছড়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে। সে-বিদ্যাচর্চার নতুন সূচনার মধ্য দিয়েই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে প্রতীচ্যের মানুষ ঘটাল রেনেসাঁস। রেনেসাঁস-চৈতন্যে-উদ্দীপ্ত মানুষের কাছে 'বিশ্বাসবাদ'-এর বদলে 'যুক্তিবাদ'-ই হল গ্রহণীয় ও মাননীয়। আর সে-কারণেই বিশ্বাসবাদের ধারক-বাহক খ্রিস্টান যাজকদের পরলোক-নির্ভর ধর্মবিধান ইহলৌকিক বিদ্যাসমৃদ্ধ যুক্তিবাদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল। যাজকরাও অবশ্যি সহজে পথ ছেড়ে দিল না। সর্বপ্রযত্নে তারা ইহলৌকিক বিদ্যাচর্চা তথা সত্যানুসন্ধানকে বাধা দিয়ে চলল, সত্যানুসন্ধানী মানুষদের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমি বা ধর্মবিরোধিতার অভিযোগ আনল, ইনকুইজিশনের তাণ্ডব ছড়িয়ে অবিদ্যা ও অপবিদ্যার অন্ধকারকেই চিরস্থায়ী করে রাখতে চাইল। গিওর্দানো ব্রুনোর মতো মুক্তবুদ্ধি বিদ্যাব্রতীকে তারা আগুনে পুড়িয়ে মারল, প্রকৃত বিদ্যার দিগন্ত-উন্মোচনকারী গ্যালিলিওকে কারানির্যাতনে জর্জরিত করল। তবু, এতসব অপকর্ম করেও, তাদের শেষরক্ষা হল না। জয় হল রেনেসাঁসেরই। রেনেসাঁসই ধর্মযাজকদের প্রতাপান্বিত ঔদ্ধত্যের থাবা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের মুক্তি ঘটায়, সামন্ততান্ত্রিক স্থবিরতার অবসান ঘটিয়ে নব নব দেশের পথসন্ধানে ভৌগোলিক অভিযানের অভিযাত্রী করে তোলে। রেনেসাঁসের পথ ধরেই আসে রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেন্ট। রিফর্মেশন বা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ধর্মব্যাখ্যায় পাদরি ও যাজকসংঘের একচেটিয়া অধিকার বাতিল করে দিয়ে প্রতিটি মানুষের বিবেকের স্বাধীনতার পথ খুলে দেয়। এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়ন এমনভাবে যুক্তির আলোকোজ্জ্বল মশালটিকে উচ্চে তুলে ধরে যাতে যুক্তিহীন বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অন্ধকার ক্রমেই ফিকে হয়ে যেতে থাকে। স্বঘোষিত পারমার্থিক 'পরাবিদ্যা' পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ইহজাগতিক 'অপরবিদ্যা'কে।

এ-রকম অপরাবিদ্যার বলে বলীয়ান হয়েই প্রতীচ্যের অভিযাত্রীরা জয় করে নেয় প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ। বিজিত হয় বাংলা তথা ভারতবর্ষও। বিজেতাদের ওপর ভর করে প্রতীচীর নব-উন্মোচিত ইহজাগতিক বিদ্যার একটি স্রোত বিজিত দেশটির উপকূলে এসেও আছড়ে পড়ে বৈকি। কিন্তু কেবল আছড়েপড়া পর্যন্তই। নবীন এই বিদ্যার স্রোতটি পুরো দেশজুড়ে প্রবাহিত হয়ে দেশের সকল মানুষের চিত্তকে সরস সফল সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারেনি। তেমনটি হওয়া সম্ভবই ছিল না। কারণ বিদ্যার বিকিরণ ঘটিয়ে বিজিত দেশের মানুষকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলার উদ্দেশ্য বিজেতাদের থাকতেই পারে না। বিজেতারা বিদ্যাকে ব্যবহার করে বিজিতকে বশীভূত রাখার হাতিয়াররূপে। সে-হাতিয়ার বিজিতের হাতে তুলে দিয়ে তাকে সমান শক্তিধর করে তুললে বিজেতার জন্য যে তা হবে একান্তই আত্মঘাতী—সে-বিষয়ে তারা সবসময়েই সচেতন। সে-রকম সচেতনতা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিজেতাদেরও পুরো মাত্রাতেই ছিল।

তবু, সচেতনভাবে যা-ই করুক বা করতে ইচ্ছা করুক, বাস্তবের নিয়মনীতিকে তারা অমান্য করতে পারে না—কেউই পারে না। ইংরেজদেরও বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ তথা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের আনুগত্য করতেই হয়—জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই ভারতবর্ষে শোষণের উদ্দেশ্যে রাজ্যবিস্তার করতে এসেও ইংরেজ শাসকরা এখানে এমন একটি 'বিপ্লব' ঘটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়, মনীষী কার্ল মার্কসের ভাষায় যেটি 'এশিয়া মহাদেশে এযাবৎকাল-শ্রুত একমাত্র বিপ্লব' (Only Revolution ever-heard of in Asia)। এবং মার্কসের বিচারেই—সেটি তারা করে সচেতন ইচ্ছায় নয়, একান্তই অচেতনভাবে—'ইতিহাসের অচেতন যন্ত্ররূপে' (As an unconscious tool of History)।

ইতিহাসের অচেতন যন্ত্ররূপেই তারা যেমন এখানে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের মতো যন্ত্র-প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন করে ফেলে—এবং মান্ধাতার আমল-থেকে-চলে-আসা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন গ্রাম-কাঠামোতে ভাঙনের সূচনা ঘটায়—তেমনই, নিতান্ত অনিচ্ছায় হলেও, তারাই প্রতীচ্য-উদ্ভূত নতুন বিদ্যারও বীজতলা তৈরি করে ফেলতে বাধ্য হয়। সে-বীজতলা-থেকে-জন্মনেওয়া কিছু-কিছু চারাগাছ যে সারবান্ বৃক্ষেও পরিণত হয়েছে—সেকথাও অস্বীকার করা যাবে না। সেই বীজতলা থেকেই তো ডিরোজিও-শিষ্য 'ইয়ংবেঙ্গল'দের উদ্ভব। সেই ইয়ংবেঙ্গলরাই নতুন বিদ্যার কোলাহল তুলে এখানে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনির সৃষ্টি করে। যদিও সে-ঝাঁকুনিটা প্রত্যক্ষভাবে লাগে সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশে, তবু এর পরোক্ষ প্রভাব অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

সে-প্রভাবকে দেশীয় রক্ষণশীল সমাজ যেমন সর্বতোভাবে প্রতিহত করতে চেয়েছে, তেমনই বিদেশীয় শাসকগোষ্ঠীও এর রাশ টেনে ধরেছে। ইংরেজ শাকসগোষ্ঠীর কেউ চেয়েছে এখানাকার মানুষকে এদেশীয় পরম্পরাগত ও গতানুগতিক বিদ্যাচর্চার পাঁচিলের ভেতরে আটকে রাখতে, কেউ চেয়েছে এমন বিদ্যার প্রসার ঘটাতে যাতে এদেশের অধিবাসীরা দেশীয় ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদের একদলকে বলা হত 'প্রাচ্যবাদী', অন্যদলকে 'প্রতীচ্যবাদী'। তবে শাসকগোষ্ঠীর ভেতরকার কি প্রাচ্যবাদী কি প্রতীচ্যবাদী—কেউই চাইতেন না যে 'নেটিভ'রা প্রকৃত বিদ্যাচর্চা করে যথার্থ বিদ্বান্ হয়ে উঠুক। বিদেশী শাসনকর্তৃত্বকে নিরাপদ ও নিরঙ্কুশ রাখাই ছিল প্রাচ্যবাদী ও প্রতীচ্যবাদী—উভয়ের লক্ষ্য। কেবল লক্ষ্যসাধনের পদ্ধতি নিয়েই ছিল তাঁদের মতদ্বৈধ।

সে-সময়কার (অর্থাৎ উনিশ শতকের) এদেশীয় দুজন মনীষী—রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—কিন্তু তথাকথিত প্রাচ্যবাদীদের বিদ্যাবিষয়ক নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যায় দুজনেরই ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রাচ্যের ঐতিহ্য নিয়ে তাঁদের গর্ববোধও কম ছিল না। কিন্তু যথার্থ বিদ্বান্ মুক্তবুদ্ধি ছিলেন বলেই পাণ্ডিত্য ও গর্ববোধকে তাঁরা ঘোলাজলের ডোবায় পরিণত করে ফেলেননি। বিদ্যার ভৌগোলিক বিভাজনে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না, প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রতীচ্যবিদ্যাকে দুর্ভেদ্য চীনের প্রাচীর দিয়ে বিভক্ত করে ফেলারও তাঁরা বিরোধী ছিলেন। তাই, এদেশের ইংরেজ-শাসকরা যখন প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিল, তখন রামমোহন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার প্রতিবাদ করে বড়লাট আমহার্স্টকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্র পড়ানোর জন্য কলেজ না-খুলে কলেজে গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব ইত্যাদি পড়ানোর ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখলেন। তাঁর মতে "সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষায় কিংবা বেদান্ত দর্শনের নিষ্ফল আলোচনায় মূল্যবান দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যয়" করা হবে একান্তই অর্থহীন। এতে ভারতবর্ষের ছাত্ররা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বদলে যা শিক্ষা করবে ইউরোপে তা শিক্ষা দেয়া হত আধুনিক বিজ্ঞানচেতনার পথিকৃৎ বেকনের আবির্ভাবের আগে। এ-রকম বিদ্যার কোনোই মূল্য নেই। ইহলৌকিক ও বিজ্ঞানসম্মত হলেই-যে বিদ্যা মূল্যবান হয়—একথাই রামমোহন আমাহার্স্টকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টের কাছে প্রেরিত এই পত্রটিকে 'নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি' বলে অভিহিত করেছেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

নবযুগের এই শঙ্খধ্বনিই আরও বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে। ১৮৫৩ সালে বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ব্যালান্টাইনের সুপারিশকৃত শিক্ষানীতির প্রতিবাদে বিদ্যাসাগরও নবযুগের 'অপরাবিদ্যা' চর্চার পক্ষেই দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। একজন অসাধারণ মেধাবী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত হয়েও তিনি অনায়াসে ভারতবর্ষীয় তথা প্রাচ্যদর্শনের দুই স্তম্ভ ন্যায় ও বেদান্তকে 'ভ্রান্তদর্শন' বলে অভিমত দিলেন, এবং এদেশের দীর্ঘকাল ধরে প্রায়-স্থবির-হয়ে-থাকা ইহলৌকিক বিদ্যাচর্চার দ্বার উন্মোচনে এগিয়ে এলেন।

সে-দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিদ্যার সকল কক্ষে প্রবেশ করে এদেশীয়দের সকলে বিদ্যাধনে ধনী হয়ে উঠতে পারল না। মেকলের মতো উপনিবেশ-রক্ষার প্রহরী-রা সে-পথ রুদ্ধ করে দিলেন। মেকলে শুধু প্রাচ্যবাদীদের বিপরীতেই অবস্থান গ্রহণ করলেন না, প্রাচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও অপমানে জর্জরিত করলেন। প্রতীচ্যের বিদ্যা দিয়ে তিনি এদেশের এমন একদল উন্মূল বিদ্বানগোষ্ঠী তৈরি করার পথ বাতলালেন, যে-গোষ্ঠীর লোকেরা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় হলেও রুচিতে নীতিতে প্রবৃত্তিতে হবে ইংরেজ। সোজা কথায়—এরা হবে এদেশে ইংরেজ-আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্য নিবেদিত-প্রাণ। বিপুলসংখ্যক জনসাধারণকে বিদ্যার প্রত্যক্ষ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত রাখার লক্ষ্যেই মেকলে সাহেব 'অভিষেচন তত্ত্ব' (Filtration Theory) নাম দিয়ে একটি অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন। এ-তত্ত্ব বলে যে, উচ্চবর্গের বিদ্বান্‌দের কাছ থেকে চুইয়ে চুইয়ে যেটুকু বিদ্যা নিম্নবর্গের জনসাধারণের মধ্যে পৌছবে, সেটকুই তাদের জন্য যথেষ্ট।

শেষ পর্যন্ত মেকলের প্রস্তাবই ইংরেজ-শাসকদের মনঃপূত হল। এবং তাতে ইংরেজ-কাঙ্ক্ষিত ও ইংরেজ-অনুগত একটি বিদ্বানগোষ্ঠীরও উদ্ভব ঘটল। তবে এই গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যেই আস্তে আস্তে আত্মসচেতনতা ও স্বদেশনিষ্ঠারও সঞ্চার ঘটে, বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের সকল মতলবও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এই গোষ্ঠী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই নতুন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির স্রষ্টারাও উঠে আসেন। আবার এই গোষ্ঠীর মানুষদেরই একসময় বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে হল। নতুন বিদ্যার বলে ইংরেজের চাকুরে হয়েছিল যারা, পদোন্নতিতে তারা ইংরেজদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ল। অনেক ইংরেজের থেকে অনেক বেশি বিদ্যার অধিকারী হয়েও বাঙালি বিদ্বান্ মর্যাদায় ইংরেজের সমান হতে পারলেন না। এদেশীয় সবচেয়ে বিদ্বান ও যোগ্যব্যক্তিটির জন্যও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে বড় কোনো পদমর্যাদার চাকুরি পাওয়া সম্ভব ছিল না। এ-রকম নানাভাবে বঞ্চিত ও অবমানিত হতে হতেই উনিশ শতকের শেষপর্বে এসে বাঙালি বিদ্বান্দের অনেকে একধরনের অভিমানে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, এবং সেই অভিমানেই প্রতীচ্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। সে-চেষ্টারই ফল ধর্মনিরপেক্ষ রেনেসাঁস ভাবনা ছেড়ে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের আশ্রয় গ্রহণ। হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের এই পশ্চাৎমুখিতাই এদেশীয়দের বিদ্যাচর্চাকে আরও খণ্ডিত ও বিকৃত করে ফেলে। বিদ্যা হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষক। হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় মুসলিম রিভাইভ্যালিজম। এই দুই রিভাইভ্যালিজমের হাতে পড়ে বিদ্যার যে খণ্ডায়ন ও বিকারায়ণ ঘটে, সেই খণ্ডায়ন ও বিকারায়ণ নিয়েই বাঙালির বিশ শতকে প্রবেশ।

চার

সারা দুনিয়ার জন্য যেমন, বাংলা তথা ভারতবর্ষের জন্যও বিশ শতক বহু ঘটনার ঘনঘটার, নানামুখী সংঘাতের এবং এরই সঙ্গে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের শতক। এই শতকের গোড়াতে ইংরেজ শাসকরা বঙ্গভঙ্গ করেছে, এদেশীয়দের আন্দোলনের মুখে তারা বঙ্গভঙ্গ রদ করতেও বাধ্য হয়েছে। আবার একসময়ের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধীরা পরে বাংলাভাগে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ-শতকেই বাংলা খণ্ডিত হয়ে এর এক অংশ 'পাকিস্তান' নামক একটি অদ্ভুত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আবার পাকিস্তানের সিকি শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বাঙালিরা যুদ্ধ করে পাকিস্তানের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে, এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরই আবার সে-রাষ্ট্রটির ঘাড়ে মৃত পাকিস্তানের ভূত চেপে বসেছে। এ-শতকেই এদেশে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য-চেতনার সঙ্গে যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতার বিস্তার ঘটেছে, তেমনই এর বিপরীতে মুসলিম সমাজেই একটি সুস্থ সমন্বয়ী প্রগতিশীল 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'ও সংঘটিত হয়েছে। এই শতকের দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এ-দেশের উপরও প্রবলভাবেই পড়েছে। এ-শতকেই এদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে এবং এদেশের মানুষ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পৈশাচিক উল্লাসে মেতেছে। এ-শতকেই মহান্ নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একপর্যায়ে পৃথিবীর অন্তত এক-পঞ্চমাংশ মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় এসেছে, আবার এ-শতক শেষ হওয়ার আগেই বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যস্তও হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। তবু, সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-দর্শন মার্কসবাদ তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সারা বিশ্বে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে যে-বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, সে-বিপ্লব কখনও মিথ্যা হয়ে যাবে না; আমাদের দেশ ও সমাজ থেকেও সে-বিপ্লবের বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক প্রভাবকে কেউই মুছে ফেলতে পারবে না।

এ-রকম সব দেশী-বিদেশী ভাবনা ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই আমাদের দেশের বিদ্যাচর্চার ধারা-উপধারাগুলোও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে।

উনিশ শতকের বাংলায় যে-গোষ্ঠীটি ইংরেজ-প্রবর্তিত নববিদ্যা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে সে-গোষ্ঠীটির নাম 'হিন্দু'। 'মুসলমান' নামক অন্য গোষ্ঠীটি নানা আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক কারণে ছিল এর সুযোগবঞ্চিত। তবু নানা প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করেই, উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে, বাঙালি মুসলমান হাঁটি হাঁটি পা পা করে নববিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। কিন্তু এদেশে সেই নববিদ্যা তখন হিন্দুত্বের রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। নববিদ্যার ধারাটি প্রতীচ্য থেকে এলেও এদেশে যেহেতু হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাই এটিকে প্রথমে ধারণ করতে পেরেছিল, তাই এ-বিদ্যাকে তারা স্থাপন করে নিয়েছিল হিন্দুত্বের আধারে। হিন্দুর ধর্মীয় ও পৌরাণিক পরিভাষাই হল এ-বিদ্যাচর্চার মাধ্যম, হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখা হল দেশের ইতিহাসকে, হিন্দুর আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনাই হয়ে উঠল নববিদ্যার ধারক। হিন্দু ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের কোনো পরিভাষা বা দৃষ্টিভঙ্গি বা আনন্দ-বেদনাই এটি ধারণ করতে পারল না। অর্থাৎ প্রতীচ্য-থেকে-আগত নববিদ্যার আধেয় ধর্মনিরপেক্ষ হলেও এদেশে এর আধারটি হয়ে গিয়েছিল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক। এ-কারণেই নববিদ্যাচর্চা এখানে একটি 'রেনেসাঁস'-এর মতো ঘটনার সূত্রপাত করলেও, না-মেনে উপায় নেই যে, গোড়া থেকেই এটি বহন করছিল ধর্মীয় রিভাইভ্যালিজমের বীজ।

হিন্দুত্বের রং, রূপ ও হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের বীজ বহন করে বেড়ে উঠেছিল বলেই, বেশকিছু বিলম্বে নব্যবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত মুসলমানদের কাছে বিষয়টি খুব অস্বস্তিকর ঠেকতে লাগল। সেই অস্বস্তি থেকে বাঁচবার জন্যই তাদের ভিন্ন পথের সন্ধান করতে হয়েছে, হিন্দুত্বের রং থেকে নব্যবিদ্যাকে মুক্ত করে—অথবা সেই রঙকে বজায় রেখেই—তাতে মুসলমানত্বের রঙ যুক্ত করার চেষ্টা করতে হয়েছে। সে-চেষ্টাও আবার তাদের নানা ধরনের জটিলতার পাকে জড়িয়ে ফেলে। একদল মুসলমান তো বাংলার মানুষ হয়েও বাংলা ও বাঙালিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে চাইলেন, এমনকি, 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু'—এমন উদ্ভট প্রশ্নও উত্থাপন করলেন। বাংলাকে যাঁরা মাতৃভাষা বলে মেনে নিলেন তাঁদেরও কেউ কেউ সৃষ্টি করতে চাইলেন একটি স্বতন্ত্র 'মুসলমানি বাংলা'। এঁরা এমন স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে উঠলেন যে আবহমান বাংলা ও বাঙালির সকল সমন্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই প্রত্যাখ্যান করলেন। এর ফলে, বিশ শতকেও, নব্যবিদ্যা তার স্বভাব-সংগত পথে বিকশিত হতে ও যথার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবান হয়ে উঠতে পারল না, বরং নতুন করে পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকেই আমন্ত্রণ করে আনল। এই উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদীদের বিপরীতেও অবশ্যি, বাংলার মুসলমানদের মধ্যেই, বিদ্যাচর্চার একটি সুস্থ সমন্বয়ী ধারারও পত্তন ঘটেছিল। এ-ধারার অনুসারীরা 'শিখা গোষ্ঠী' নামে পরিচিত। 'শিখা' নামক একটি সাহিত্যপত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বলেই এর এ-রকম পরিচিতি। বিদ্যাচর্চাকে এঁরা বুদ্ধির মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধীশক্তির প্রবলতার কাছে এঁরা পরাভূত হলেন। পাকিস্তান-আন্দোলন প্রবল হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চায় মুক্তবুদ্ধি ও শুভবুদ্ধিরও পশ্চাদপসরণ ঘটতে থাকে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তিই সেই পশ্চাদপসরণে মদদ দেয়। হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য-দিয়ে-গড়ে-ওঠা বাংলাভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বাভাবিক ধারাপ্রবাহকে পাকিস্তান তো সম্পূর্ণ উল্টে দিতেই চেয়েছিল। তবে, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই, পাকিস্তানের এই অস্বাভাবিক চাওয়া পাওয়ায় পরিণত হতে পারেনি। বিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ওঠে প্রতিবাদের নির্ঘোষ। বাঙালি বিদ্বান ও বিদ্যার্থীদের বিদ্যা যেন একমুহূর্তে পাকিস্তানি ভ্রান্তিবিলাসের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসে। এই বিদ্বানরাই অনুঘটক হয়ে বাঙালির রাজনীতিকেও ভুয়া পাকিস্তানি ভাবধারার কুয়াশামুক্ত করে তোলেন। বাংলা ও বাঙালির রাজনীতি সুস্থ, স্বচ্ছ ও স্বাধিকার-সচেতন হয়ে ওঠে, বাঙালি স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং সে-সংগ্রামে জয়ী হয়ে স্বাধীনতাকে অধিগতও করে নেয়। এরপর স্বাধীনতাকে দেশের সকল অধিবাসীর জন্য অর্থবহ করার লক্ষ্যে যথার্থ বিদ্বানদের প্রণোদনা ও প্রয়াসেই রচিত হয় এমন একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধান, যে-সংবিধান শোষণমুক্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠার গণ-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষারূপ দেয়। কিন্তু, হায়, গণ-আকাঙ্ক্ষার সেই ভাষা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করার আগেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিতে লাগে উল্টোরথের টান। সে-টানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটতে থাকে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনাধারারই। প্রগতিচেতন বাঙালি বিদ্বানরাও এই উল্টোরথের টান ঠেকাতে ব্যর্থ হন, স্বাধীন বাংলাদেশের বিদ্যাচর্চাও সুস্থ ও কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হতে পারে না।

এই যে নব্যবিদ্যায় প্রথমেই হিন্দুত্বের রঙ্ লাগা, এবং তা থেকে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম-মুসলিম রিভাইভ্যালিজমের উদ্ভব, মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীলতার বিস্তার, তারপর এ-সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বাঙালির স্বাধীন বাংলাদেশের উপল উপকূলে উপনীত হওয়া, আবার সেই স্বাধীন বাংলাদেশেরই উল্টো হাওয়ার টানে ভেসে যাওয়া—এ-রকম সব উল্টোপাল্টা বাস্তবতার আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে একটা বৈজ্ঞানিক আলোকবির্তকার অবশ্যই প্রয়োজন। সেই অলোকবর্তিকা কোন্‌টি—এ-প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর দেওয়া মোটেই সম্ভব হবে না। তাই আমি—বিতর্ক, প্রতিবাদ ও ভিন্নমতের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানিয়ে—নিজের মতটিই সোজাসুজি ব্যক্ত করে ফেলতে চাই। আমি মনে করি : 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'ই হল সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈজ্ঞানিক আলোকবর্তিকা যার সাহায্যে বস্তু তথা ঘটনাপ্রবাহ তথা প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাসের স্বরূপকে সঠিকভাবে দেখে নেওয়া যায়। বিদ্যাকেও অবিদ্যা ও অপবিদ্যা থেকে পৃথক্ করা যায় এরই সাহায্য নিয়ে। সভ্যতার সূচনাকাল থেকে সারা পৃথিবীর চিন্তক মনীষীবৃন্দ এই বর্তিকাটি নির্মাণের জন্য উপাদান সংগ্রহ করছিলেন, তেল জোগাড় করছিলেন, সলতে পাকিয়ে চলছিলেন। অবশেষে উনিশ শতকে সেটির পূর্ণরূপ দান করলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স নামক দুই মনীষী। এঁরাই হলেন 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' নামক আলোকবর্তিকাটির স্থপতি।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল প্রবক্তা কার্ল মার্কসের লক্ষ্য ছিল 'দুনিয়াটাকে পরিবর্তন করা'র দিকে, 'দুনিয়ার ব্যাখ্যার পরিবর্তন করা' নয়। তবু, এ-কথাও মানতে হবে যে, তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দুনিয়ার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের নানাবিধ প্রপঞ্চের ওপর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলো ফেলেই সে-সবের সঠিক ব্যাখ্যাটির দেখা মিলেছে। বিশ শতকের কিছু বাঙালি বিদ্বানও সেই আলো দিয়েই আলো জ্বেলেছেন, এবং অনেক বিষয়ের প্রকৃত রূপও নতুন করে দেখে নিয়েছেন। বিনয়কুমার সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অরবিন্দ পোদ্দার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন, নরহরি কবিরাজ, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—এবং এ-রকম আরও বেশকিছু বিদ্বানের নাম করা যায়, যাঁরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলো দিয়েই অব্যাখ্যাত বা অপব্যাখ্যাত অনেক বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যার দিগন্ত উন্মোচন করেছেন বিশ শতকের প্রথমার্ধেই। শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যাঁরা একাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা হবে আরও বেশি দীর্ঘ। (তাই সে-তালিকা প্রণয়নে বিরত থাকছি।) এঁদের সকলের সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা-যে একই রকম হয়েছে বা একমাত্রিক হয়ে থেকেছে তা অবশ্যই নয়। এঁদের বিভিন্ন জনের ব্যাখ্যায় নানা বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতার দেখা মিলেছে। এই বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতাই আসলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বাঙালি বিদ্বান্‌বৃন্দ সেই প্রাণশক্তির সাহায্যেই অমূল্য বিদ্যাধনের মূল্যহীন হওয়ার পরিণতিকে ঠেকানোর প্রয়াস গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু, দুঃখ এই, এঁদের এই প্রয়াস বাঙালির বিদ্যাচর্চার মূলধারার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি—তেমনটি হতে দেয়া হয়নি। এঁদের বিরুদ্ধে অনেক ধরনের ষড়যন্ত্র চলেছে। সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্রটি হল 'নীরবতার', ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'কনস্পিরেসি অব সায়লেন্স'। এই 'কনস্পিরেসি'তে অন্যধারা বা মূলধারার প্রায় সকল বিদ্বানই নিজেদের কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত করেছেন, বিদ্যাচর্চার মূলধারার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্ত ভাবনা যাতে কোনোমতেই সংযুক্ত হতে না-পারে তার সকল বন্দোবস্ত তাঁরা করে রেখেছেন। কখনও কখনও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-সমর্থিত কিছু কিছু কথাবার্তা হয়তো পাঠ্যসূচিতে ঢুকে পড়েছে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোতে রচিত কিছু কিছু গবেষণাকর্মও হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। তবু সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য দুর্গ' হয়েই রয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতিশীল আলোয় সেগুলোকে আলোকিত হয়ে উঠতে দেওয়া হয়নি।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অন্য অনেক তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদের চেয়ে অনেক বেশি সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল। মূলধারার বাঘা বাঘা বিদ্বান্ ও বিদ্যাচর্চাকারীরা এই সুবোধ্যতা ও প্রাঞ্জলতাকেই ভয় পান। কারণ এ-দর্শনের আলোতে শুধু বস্তু ও বাস্তবের স্বরূপই স্পষ্ট দেখা যায় না, এ-আলো বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষকে ভাগ্যপরিবর্তনের তথা সমাজ-পরিবর্তনেরও পথ দেখায়। বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষেরা যদি সে-পথ দেখে ফেলতে পারে, তবে বঞ্চক ও নিগ্রহকারীদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে যাবে। কিন্তু মূলধারার বিদ্যাচর্চা তো কর্তৃত্বশীলদের কর্তৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যেই নিয়োজিত ও নিবেদিত। বিদ্বান ও বিদ্যাচর্চায় রত মানুষরা যদি এই কর্তৃত্বশীলদের কর্তৃত্বের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে না-পারেন, যদি 'সেই নিম্নে নেমে এসে' 'সবার পিছে সবার নিচে' অবস্থিত 'সর্বহারা'দের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে একীভূত করে ফেলতে না-পারেন, তবে বিদ্যাচর্চার রক্ষণশীল ধারার বদলে প্রকৃত প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে তাঁরা কিছুতেই যুক্ত হতে পারবেন না, এবং বিদ্যা থাকবে মূল্যহীন হয়েই। অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য বিদ্যা কোনোমতেই অমূল্য ধন হয়ে উঠবে না।

বস্তুবোধের আলোকবির্তকা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই সকল অবিদ্যা ও অপবিদ্যার অন্ধকার ভেদ করে প্রকৃত বিদ্যা ও বিদ্যার প্রকৃত রূপটি দেখাতে পারে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে অতীতকে যেমন স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তেমনই ভবিষ্যতের ইতিহাস-নির্মাণের কৌশলও জেনে নেওয়া যায় এ-পদ্ধতি অনুশীলন করেই।

সীমাহীন অসচেতনতা এবং নানামুখী ষড়যন্ত্রের পাল্লায় পড়ে আমরা সেই সঠিক পথটিই ধরতে পারছি না।

AMARBOI.COM

পাঁচ

সারা দুনিয়ার ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী এস্টাব্লিশমেন্ট এবং তাদের সহযোগী বিদ্বান ও তাত্ত্বিকরা সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে যাচ্ছেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের স্পর্শ থেকে বিদ্যার মূলধারাকে মুক্ত রাখতে। তবে এই বিদ্বান ও তাত্ত্বিকরা যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শক্তি ও সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন—সে-বিষয়েও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাঁরা প্রায় সবাই জানেন ও বোঝেন : যদি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চর্চাকে বাধামুক্ত করে দেওয়া হয়, যদি এটি কোনোরকমে বিদ্যার মূলধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তবে জনগণ এমন অমূল্য বিদ্যাকে তাদের হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে যা দিয়ে তারা 'উপারি ফেলিবে অধীন বিশ্ব অবহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে'। আর সে-অবস্থাটি যে ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী এস্টাব্লিশমেন্টের জন্য মোটেই স্বস্তিকর হবে না, সে তো জানা কথাই। তাই ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রহরী সকল বিদ্বান ও তাত্ত্বিকের প্রথম কাজই হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে মানুষের সামনে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা, একে কলঙ্কিত ও হাস্যকর করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলা, একে সম্পূর্ণ অসত্য ও অকার্যকর প্রতিপন্ন করা। তাঁরা নিজেদের দর্শন ও তত্ত্ব নির্মাণ করতে গিয়ে প্রথমে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকেই তাঁদের পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলে ধরে নেন। তাঁদের এই প্রতিপক্ষটি-যে অমোঘ সত্যের প্রচণ্ড বলে বলীয়ান্—এ-কথা তাঁরা জানেন এবং অন্তত মনে মনে স্বীকার করেন। তাই মার্কসোত্তর কালে—বিশেষ করে সারা বিশশতক জুড়ে—বুর্জোয়ারা যত তত্ত্বদর্শন উদ্ভাবন করেছে তার সবগুলোতেই মার্কসবাদ তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধিতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। যদিও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে খণ্ডন করা বা অসত্য প্রতিপন্ন করার মতো কোনো তত্ত্বদর্শনই এত দীর্ঘকালেও তারা তৈরি করতে পারেনি, তবু তাদের প্রয়াসের ক্ষান্তি নেই। এ-রকম ক্ষান্তিহীন প্রয়াস থেকে উপজাত তাদের সর্বশেষ তত্ত্ব 'পোস্ট মডার্নিজম'। কূটাভাসের মতো শোনালেও বলতে হয় যে পোস্টমডার্নিজম তত্ত্বের তাত্ত্বিকরা মূলত তত্ত্ব-বিরোধী, এবং তাদের পোস্টমডার্নিজমও মোটেই কোনো তত্ত্ব নয়। অন্তত প্রকৃত ও সমাজ-বিশ্লেষণের কোনো সামগ্রিক তত্ত্ব তো নয়ই। পোস্টমডার্নিস্টরা সামগ্রিকতা-দ্যোতক সকল তত্ত্বেরই বিরোধী। তাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-বিরোধিতাও সকল প্রকার সামগ্রিকতার প্রতি বিরূপতার কারণেই। পোস্টমডার্নিস্টরা সব সমস্যার প্রতিই দৃষ্টি দিতে চায়, সব সমস্যারই মোকাবেলা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে; কিন্তু সব সমস্যাকেই তারা আলাদা আলাদা করে দেখে, আলাদা আলাদাভাবেই সব সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজে, সমস্যাসমূহের পারস্পরিক সংযোগ আছে কিংবা সব সমস্যার একটি অভিন্ন মূল বা উৎস আছে বলে মানতে তারা রাজি নয়। আমরা যাকে সামগ্রিকতা বা অখণ্ডতা বলছি—তাদের পরিভাষায় যা 'গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ' বা 'মাস্টার ডিসকোর্স'—সে-রকম সবকিছুর বিরুদ্ধেই তাদের অবস্থান। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে তারা এ-রকম গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ বা মাস্টার ডিসকোর্স হওয়ার সম্ভাবনার বলেই চিহ্নিত করে, এবং সে-কারণেই একে প্রত্যাখ্যান করে।

AMARBOI.COM

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে খণ্ডন করতে না-পারলেও প্রত্যাখ্যান করা খুব সহজ মনে হয়েছিল বিশশতকের শেষ দশকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের সময়। ধনতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদীদের উল্লাস তো সে-সময়ে একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাদের তাত্ত্বিকরা সে-সময়ে শুধু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নয়, সকল তন্ত্রের তত্ত্বের আদর্শের, এমনকি ইতিহাসেরও, সমাপ্তি ঘোষণা করে বসে।

কিন্তু অচিরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল : সমাপ্তি-তত্ত্বের তাত্ত্বিকদের প্রতি ইতিহাসের একটুও সমর্থন নেই। সমাপ্তিহীন ইতিহাস 'চরৈবেতি চরৈবেতি' বলতে বলতে এগিয়ে চলছে বস্তুর দ্বান্দ্বিক নিয়মকে অঙ্গীকার করেই। আজকে ধনতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ভেতর থেকেই যেভাবে সাম্রাজ্যবাদের শয়তানি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদ ও গণ-প্রতিরোধের সূচনা ঘটেছে, তাতেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সত্যতা নতুন করে প্রমাণিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিমানবিকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত বিদ্বানবৃন্দ আজ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে নতুনভাবে পাঠ করে নিতে মনোযোগী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছেন। সামির আমিন, এজাজ আহমদ, নোয়াম চমস্কি, অমর্ত্য সেন—এমনকি একসময়কার ধনবাদী অর্থনীতির নিষ্ঠাবান প্রবক্তারূপে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ স্টিগলিৎজ-এর মতো বিদ্বানও—আজকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকবর্তিকাটি হাতে তুলে নিয়েছেন। আরও অনেকেই এটি হাতে নিয়েছেন একান্ত সচেতন দৃঢ়তায়, কেউ-বা নিজেরই অজ্ঞাতসারে।

বাংলাদেশের বিদ্বান ও বিদ্যার্থীদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায়ন্তর আছে বলে আমার মনে হয় না। অবশ্যি এটা নিছকই আমার নিজের ধারণা। আমার ধারণাই যে চূড়ান্ত সত্য—এমন জেদ আমার নেই। কোনো বিদ্বান যদি আমার ধারণার ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন, এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চেয়ে সত্যতর ও উচ্চতর কোনো তত্ত্বজ্ঞান আমাকে দান করতে পারেন, তবে সানন্দে আমি ভুল স্বীকার করে আমার এখনকার ধারণাকে নির্দ্বিধায় বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেব। কিন্তু তেমন কোনো সত্যতর ও উচ্চতর তত্ত্ব না-পাওয়া পর্যন্ত আমার এতকাল-অনুসৃত নিজস্ব ধারণাকে বর্জন করে তাত্ত্বিক দেউলিয়াপনা বরণ করে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। রাজি না-হওয়ার একটি বড় কারণ হল যে বিগত দেড়শো বছর ধরে প্রচণ্ড কোলাহল তুলে অনেক তত্ত্বদর্শনকে আত্মপ্রকাশিত হতে দেখেছি, সে-সবের গর্জনে কান ঝালাপালাও হয়ে গেছে; কিন্তু আবার অল্পদিনের ভেতরেই সে-সবের সব কোলাহল ও গর্জন স্তব্ধ হয়ে যেতেও দেখেছি। এ-সকল তত্ত্বদর্শনের আয়ু বুদ্বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী। তবু এইসব তথাকথিত তত্ত্বদর্শন এদের স্বল্পায়ু জীবনেও পরম একাগ্রতার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বদনাম করে গেছে, এবং এর গায়ে এখানে-ওখানে কালির ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। এখনও এরকম অনেক অনেক তত্ত্বদর্শন জন্ম নিচ্ছে এবং সেগুলোও একই কাজ করে চলছে। কিন্তু তাতেও আজ পর্যন্ত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অসত্য প্রমাণিত হয়নি, কিংবা কেউই এর ঔজ্জ্বল্যকে সামান্য পরিমাণেও ম্লান করতে পারেনি।

তাই বলে এমন কথাও বলা যাবে না যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনুসারী মাত্রই এ-তত্ত্বটির সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, এবং এর সাহায্যে সকল বিষয়েরই সঠিক তাৎপর্যটি নিষ্কাশন করে আনতে পেরেছেন। কিংবা একসময়ে এক বিষয়ে যিনি এ-তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগ করেছেন, সেই তিনিই-যে সব সময়ে সব বিষয়ে এর প্রয়োগে অভ্রান্ত থেকেছেন—এমনও নয়। এ-তত্ত্বের প্রয়োগে অনেকেই অনেকরকম ভুলের শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জন ও মূল্যায়নের বিচারে বাঙালি মার্কসবাদী বিদ্বানদের একটি বড় গোষ্ঠীই একসময়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বেনামিতে যান্ত্রিক বস্তুবাদী হয়ে উঠেছিলেন, তত্ত্বটির মারাত্মক অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে বসেছিলেন। সেই অপপ্রয়োগের জের এখনও চলছে। সে-রকম ভুল ও অপপ্রয়োগ ঐতিহ্যের বিচারে যেমন ঘটেছে, তেমনই ঘটেছে সমসাময়িক কালের ঘটনাপ্রবাহের তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রেও। সেইসব ভুল ও অপপ্রয়োগের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই আজকের দিনে সতর্কভাবে পথ চলতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিগতকালের ভিত্তির ওপর ভর করেই তো দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানকাল। আবার বর্তমানকালও একসময় বিগত হয়ে তারই ভিত্তির ওপর ভাবীকালকে দাঁড় করিয়ে দেবে। কাজেই বর্তমানকালকে অর্থবহ করে তোলা এবং ভাবীকালকে সুন্দরতর করার লক্ষ্য যাদের আছে, তারা কখনও বিগতকালের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করতে কিংবা খাটো করে দেখতে পারে না। আবার কোনোরূপ বাছবিচার না-করে ঐতিহ্যের সবটুকুই গ্রহণ করাও চলে না। ঐতিহ্যের যে-অংশটুকু ইতোমধ্যেই অকার্যকর ও পশ্চাৎপদতার দ্যোতক হয়ে গেছে সে-অংশটুকু অবশ্যই বর্জনীয়, এবং যে-অংশটুকু সুন্দর ভাবীকাল-নির্মাণের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে পারে সেটুকুই কেবল গ্রহণীয়। ঐতিহ্যের অনুবর্তনও কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয়। অনুবর্তনের বদলে প্রয়োজন নবায়নের। সবিচার গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াতেই ঐতিহ্যের নবায়ন ঘটাতে হয়। ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জন-নবায়নের কাজে নৈপুণ্য প্রকাশের মধ্যেই বিদ্বানের বিদ্যাবত্তার প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠে। এক্ষেত্রে বাঙালি বিদ্বানদের নির্মোহ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আজকে খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এদেশের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো বিদ্যার ক্ষেত্রটিও-যে দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদীদের দখলে চলে যাচ্ছে, এর জন্য প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ-বলে-পরিচিত বিদ্বানরা কোনোমতেই দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনুসারী বলে দাবি করেন, তাঁদের ওপর তো সে-দায় আরও বেশি করে বর্তায়। আজ যে স্বাধীন বাংলাদেশে মৃত পাকিস্তানের পুনর্জন্ম ঘটেছে, অসুস্থ ও বর্জিত ঐতিহ্যকে-যে সুস্থ ও গ্রহণীয় ঐতিহ্যকে কোণঠাসা করে ফেলেছে—সেই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির পরিবর্তনে বিদ্বৎসমাজের ওপরই পড়েছে মূল দায়িত্বভার।

পাকিস্তান আমলে এখানকার অধিকাংশ বিদ্বান প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাৎপদতা-প্রতিরোধে যে-রকম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের বিদ্বানরা কোনোমতেই সে-রকম দায়িত্বশীল হতে পারছেন না। অথচ দায়িত্বশীল হওয়ার প্রয়োজন আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তান আমলেও বিদ্যালয়ে 'ধর্মশিক্ষা' আবশ্যিক ছিল না, স্বাধীন বাংলাদেশে তা হয়েছে। সকল মানুষের আচরণীয় 'মানবধর্ম' ও নীতিনৈতিকতার শিক্ষাই তো প্রকৃত বিদ্যালাভের জন্য আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে-প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ 'ধর্মশিক্ষা' সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের পাঁচিলই তুলে দেয় কেবল।

না, 'ধর্মশিক্ষা' অনাবশ্যক—মোটেই আমি এমন কথা বলছি না। বরং আমি বলি : ধর্মই বিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রধান বিষয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। তবে, প্রসঙ্গত এ-ও বলে নিই, বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে যে-'ধর্মশিক্ষা' দেয়া হচ্ছে তার 'ধর্ম' শব্দটিতে ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' অর্থই প্রযোজ্য—মূল সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম' বলতে যা বোঝায়, এটি তা নয়। সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দটির তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও গভীর। সেই ধর্মকে বাদ দিয়ে বিদ্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা তো ভাবাই যায় না। কিন্তু ধর্ম ও রিলিজিয়ন কোনোমতেই এক নয়। তবু, স্বীকার্য যে, মানুষের ইতিহাসে রিলিজিয়নও খুবই গুরুত্ববহ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বিভিন্ন রিলিজিয়নের উদ্ভব ঘটেছিল। বিগত যুগে উদ্ভূত সব রিলিজিয়ন সব যুগের মানুষের জন্যই অনেক ঐতিহ্যের সম্পদ্ রেখে গেছে। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল বিদ্যার্থীরাই সে-সব ঐতিহ্য-সম্পদের সঙ্গে পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ রিলিজিয়নের পরিচয় নয়, সকল সম্প্রদায়ের সকল বিদ্যার্থীরই সকল রিলিজিয়নের পরিচয় লাভ করা চাই। আর সে-পরিচয় ঘটবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সে-রকম পরিচয়ই হবে ধর্মান্ধতা, ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক। কিন্তু তার জন্য তো দরকার রিলিজিয়নকেও অলৌকিক বিশ্বাসের অর্গলমুক্ত করে একটি লৌকিক 'অপরাবিদ্যা'রূপে পাঠ করা। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের রিলিজিয়ন-চর্চা উপাসনালয়ের রিলিজিয়ন-চর্চা থেকে অবশ্যই পৃথক্ হতে হবে। উপাসনালয়ে প্রবেশ করতে হয় ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে, আর বিদ্যালয়ে যেতে হয় যুক্তির হাতিয়ার নিয়ে। এর উল্টোটা করলে উপাসনালয় ও বিদ্যালয় উভয়েরই চরিত্র নষ্ট হয়।

বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে এমনভাবে চরিত্রভ্রষ্ট করেছে যারা, স্বাধীন বাংলাদেশের সেই কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠীটির প্রতি আমাদের বিদ্বান্‌বৃন্দ কি সঙ্গত ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন? প্রশ্নের উত্তরটি, দুঃখজনকভাবেই, নেতিবাচক। কোনো-কোনো বিদ্বান উচ্চারণ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদ খুব তীব্র ও জোরালো হয়ে ওঠেনি, বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের চরিত্রভ্রষ্টতা মোচন করার লক্ষ্যে তাঁরা সম্মিলিত প্রতিরোধের সৃষ্টি করতে পারেননি। আর তারই ফলে বিদ্যা ও বিদ্যাঙ্গন নিয়ে শাসকশ্রেণী যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে যেতে পারছে, বিদ্যার্থীদের মগজের কোষে কোষে বিভ্রান্তির বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, দেশ ও জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানার সুযোগ থেকেও তাদের বঞ্চিত করছে। এরা বিদ্যাকে শুধু মহার্ঘপণ্য বানিয়েই ছাড়েনি, বিদ্যার পণ্যায়নের সূত্রে সমাজে শ্রেণীবিভক্তিকে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে, নিম্নবর্গের মানুষ যাতে শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠতে না-পারে তারও পাক্কা বন্দোবস্ত করে রাখছে।

এই গণবিরোধী গোষ্ঠীটি যতদিন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হয়ে থাকার সুবাদে বিদ্যারও নিয়ন্ত্রণভার হাতে রাখতে পারবে, ততদিন বিদ্যার অর্থহীনতা ঘুচবে না; ততদিন বিদ্যা কেবল অর্থবাদনেরই সেবায় লাগবে, প্রকৃত অর্থে অমূল্য হওয়ার বদলে মূল্যহীন হয়েই থাকবে।

বস্তুবিজ্ঞানের বিদ্যা যিনি গ্রহণ করবেন, তিনি বস্তুবাদী না-হলেও অন্তত বস্তুনিষ্ঠ হবেন, এবং হবেন একজন বিজ্ঞানচেতনা-সম্পন্ন মানুষ—এমনটি তো একান্তই নিম্নতম প্রত্যাশা। কিন্তু আমাদের দেশের বস্তুবিজ্ঞানের বিদ্যার্থীদের মধ্যে কতজন এই নিম্নতম প্রত্যাশাটুকুই পূরণ করতে পারেন? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো অবদান-সংযোজনের কথা বাদই রাখলাম; কিন্তু পদার্থবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষদেরও যখন দেখি ভাগ্য-পরিবর্তনের-লক্ষ্যে জ্যোতিষির প্রেসিক্রিপ্‌শন নিয়ে হাতের অঙ্গুরিতে রত্নপাথর ধারণ করতে, কিংবা পীরের খাদেম বা 'অধ্যাত্মিক' গুরুর সেবায়েৎ হতে, তখন তো এদের বিদ্যার এক কানাকাড়িও মূল্য আছে বলে মেনে নিতে পারি না। তেমনটিই তো দেখি বিভিন্ন সামাজিক বিদ্যা বা মানবিকীবিদ্যার পাঠগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রেও। এঁদেরও খুব কম সংখ্যকই সমাজসচেতন কিংবা মানবিক বোধসম্পন্ন হয়ে থাকেন। বিদ্যা যদি মানুষকে বিজ্ঞান-সচেতন সমাজ-সচেতন ও দায়িত্ব-সচেতনই না-করতে পারে, সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে সে-বিদ্যা তবে কোন্ মূল্যেরই-বা ধারক হবে?

প্রগতিচেতনা বিদ্বৎসমাজ, অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই, আমাদের রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা বহাল থাকার বিষয়টি সমর্থন করতে পারেন না। এ-ব্যবস্থাটি যে আমাদের সংবিধানেরও পরিপন্থী—সে-কথাও তাঁরা বিভিন্ন সময়ে সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। বিদ্যাচর্চার কোনো প্রতিষ্ঠান হবে সরকারি, কোনোটি বেসরকারি, কোনোটিতে বাংলামাধ্যমে আর কোনোটিতে ইংরেজিমাধ্যমে বিদ্যাচর্চা করা হবে, আবার এ-সবেরই পাশাপাশি থাকবে কেবল বিশেষ ধর্মতন্ত্রচর্চার জন্য 'মাদ্রাসা' নামে-পরিচিত অজস্র প্রতিষ্ঠান—এ-রকম ব্যবস্থা অবশ্যই অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত। এ-রকম ব্যবস্থাকে বজায় রাখার পক্ষে যাদের অবস্থান, তারা-যে গণবিরোধী ও প্রগতিবিরোধী—সে-ব্যাপারে অন্তত আমার মনে কোনোই সন্দেহ নেই। ওদের সঙ্গে যুক্তিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

তবু, তা না থাকলেও, মাদ্রাসার প্রসঙ্গ নিয়ে আমি এখানে দু-একটা কথা না-বলে পারছি না। না, ঠিক মাদ্রাসা নিয়ে নয়; মাদ্রাসার শিক্ষাকে খুবই ক্ষতিকর ভেবে এর যাঁরা তীব্র বিরোধিতা করেন, কথাগুলো আসলে তাঁদেরই সঙ্গে। বলা যেতে পারে : এটি একধরনের আত্মসমালোচনা, এবং চিত্রের শুধু এক পিঠ না-দেখে তার উল্টো পিঠটিও দেখে নেওয়া।

আমরা যারা কখনও মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম না, সেক্যুলার বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বস্তুবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা প্রকৌশলবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেছি যারা, সেই আমরা কি সবাই মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের চেয়ে অধিকতর মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রগতিশীল হয়েছি? অন্যদিকে, মাদ্রাসায় যাঁরা পাঠ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও কি সবাই মুক্তবুদ্ধির বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছেন?

নিকট-অতীতের ইতিহাস-পর্যালোচনাতেই দেখা যায় : আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল-ধরে-বিদ্যমান লোকায়ত অসাম্প্রদায়িকতা ও রিভাইভ্যালিজমের খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের প্রায় সবাই কিন্তু ছিলেন পাশ্চাত্যরীতির সেক্যুলার বিদ্যায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বান। ধর্মতন্ত্রী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তপ্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরাও বিদ্যা লাভ করেছিলেন ওইধরনের সেক্যুলার বিদ্যায়তনেই। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর সে-রাষ্ট্রটিতে মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতার অন্তঃসার ঢুকিয়ে দেয়ার নেতৃত্বও নিয়েছিলেন এঁরাই। 'আজকের বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে, তার সব কিছুই আমাদের ধর্মশাস্ত্রে অনেক আগেই লেখা হয়েছে, স্বয়ং বিধাতাই সেগুলো তাঁর প্রতিনিধি মারফৎ জানিয়ে দিয়েছেন'—পত্রপত্রিকায় বা বইয়ে বিজ্ঞানের এমন ধর্মতন্ত্রী ব্যাখ্যা বা ধর্মতন্ত্রের 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' লিখতে কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা সেক্যুলার বিদ্যায়তন থেকে বিজ্ঞানের বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। এ-সব বিজ্ঞানীর কথাই বরং সাধারণ মানুষ 'প্রামাণ্য' বলে গ্রহণ করেন। 'মাদ্রাসা-পাস' কিংবা অন্যকোনো ধর্মতন্ত্রী বিদ্যায়তনে পড়ালেখা-করা কোনো আলেম বা পণ্ডিত যদি এ-ধরনের 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা দিতে আসেন, তবে মানুষ তাঁকে খুব কমই পাত্তা দেবে। তাহলে, সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে অধিকতর পারঙ্গম কারা—মাদ্রাসায়-পড়া আলেমরা না সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা বিদ্বান বিজ্ঞানীরা?

আবার মাদ্রাসায়-পড়া আলেমদেরও অনেককেই তো সেক্যুলার ধারার বিদ্যাচর্চাকারীদের চেয়ে সমাজপ্রগতিতে অনেক বেশি অবদান রাখতে দেখি। অবিভক্ত ভারতবর্ষের দেওবন্দে যাঁরা মাদ্রাসা ও জামিয়া গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা তো ধর্মতন্ত্রভিত্তিক অবৈজ্ঞানিক দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে অসাম্প্রদায়িক জাতিচেতনায় অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, পাকিস্তান নামক অস্বাভাবিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃঢ় সমর্থক হয়েছিলেন। মৌলানা হোসেন আহমদ মাদানি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কিংবা আমাদের এই বাংলার মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী—ধর্মতন্ত্রী বিদ্যাচর্চায় অভ্যস্ত এই আলেমদের মতো এমন কতজন নির্ভেজাল অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীর দেখা পাওয়া যাবে সেক্যুলার ধারা বিদ্বানদের মধ্যে? শুধু অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী নয়, কমিউনিজম-অনুরাগী আলেমও আমরা দেখেছি। ব্রিটিশ ভারতে ইসলাম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতা মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের খবরে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯২১ সনে বিপ্লব-নায়ক লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে গিয়েছিলেন। মৌলানা হসরত মোহানি শুধু কমিউনিজমের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদও গ্রহণ করেছিলেন।

এ-প্রসঙ্গেই আমরা আরেকজন মাদ্রাসায় পড়া বাঙালি আলেমের কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ। দীর্ঘজীবী এই মৌলানা জীবনের নানা পর্বে নানা ধরনের চিন্তা ও কর্মের অনুসারী হয়েছেন, অনেক প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজেকে বিতর্ক-কুটিলও করে তুলেছেন। কিন্তু, সেইসঙ্গে একান্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, ধর্মতন্ত্রের ব্যাখ্যায় এই 'আলেম' মানুষটি যে-অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তেমনটি খুব কমসংখ্যক সেক্যুলারপন্থী বিদ্বানই দিতে পেরেছেন। এই আলেমই তো 'সমস্যা ও সমাধান' লিখে সঙ্গীত ও চিত্রকলার মতো নান্দনিক বিষয় সম্পর্কে মুসলমানদের মানস-প্রতিবন্ধজনিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যার গ্রন্থিমোচন করে তার সঙ্গত সমাধানসূত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। 'মোস্তফা চরিত'-এ তিনি যেভাবে অলৌকিকতার ধোঁয়াশা মুক্ত করে মহানবীর জীবনচরিত উপস্থাপন করেছেন, তেমনটি আর কে করতে পেরেছেন? গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'র সঙ্গে আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত'-এর তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে সেক্যুলার বিদ্যায়তনের 'ছাত্র' গোলাম মোস্তফার চেয়ে মাদ্রাসার 'তালেব-উল-এল্‌ম্' আকরাম খাঁ কত গভীর বিজ্ঞানমনস্ক।

এ-রকম দৃষ্টান্ত আরও আছে।

মাদ্রাসা-শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করার জন্য আমি মুক্তচিন্তাসম্পন্ন আলেমদের দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরিনি। কিংবা বিদ্যাচর্চার সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। বৈষম্য সৃষ্টিকারী নানা ধারার শিক্ষাব্যবস্থার বদলে দেশের সকল নাগরিকের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিদ্যাচর্চার অভিন্ন ধারা প্রবর্তনের আন্দোলন করে যাচ্ছেন যাঁরা, আমি তাঁদেরই সহমর্মী ও সহযাত্রী। তবে আমি এখানে শুধু একথাটুকুই বলতে চাই যে বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলো যতই উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত হোক না কেন, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চাই কোনো মানুষকে প্রকৃত বিদ্বান বানাতে পারে না। প্রকৃত বিদ্বান বা 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই' যে 'স্বশিক্ষিত'—সুরসিক চিন্তাবিদ প্রমথ চৌধুরীর এই বক্তব্যটি সব দেশ ও সব কালের জন্যই অমোঘ সত্য। স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত মানুষেরাই যে-কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলোকে অতিক্রম করে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার ধারক হয়ে উঠতে পারেন। তেমনটিই হয়ে উঠেছিলেন 'মাদ্রাসা' নামক ধর্মতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অনেক আলেমও। আর যাঁরা সুশিক্ষিত হতে চেষ্টা করেননি, সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও তাঁদের প্রকৃত বিদ্বান ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে পারেনি।

AMARBOI.COM

আমার, তাই, মনে হয় : আজকে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তারের যত না প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষকে স্বশিক্ষিত হতে উদ্বুদ্ধ করা,—এবং সেই লক্ষ্যে আন্দোলন সংগঠিত করা। মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞানচেতনা প্রসারের জন্য দেশের নানা স্থানে যাঁরা পাঠচক্র গড়ে তুলেছেন, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে যাঁরা ব্যতিক্রমী সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়েছেন, ইস্কুল-কলেজের সিলেবাসভিত্তিক যান্ত্রিক বিদ্যাচর্চার বাইরে বইপড়াকে আনন্দের বিষয় করে তুলে দেশের কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদের পরীক্ষার্থীর বদলে বিদ্যার্থী হতে উৎসাহ যোগাচ্ছে যাঁরা,—তাঁরাই আসলে সঠিক কাজটি করছেন। তাঁরাই পারবেন বিদ্যার মূল্যহীনতা ঘোচাতে। তবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোতে উৎসাহী এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। তাই অ-প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বিদ্যাচর্চার কাঙ্ক্ষিত আন্দোলনটি ঠিকমতো দানা বেঁধে উঠতে পারছে না। তবু, এরই ওপর ভরসা রাখা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প আছে কি-না—আমার জানা নেই। সে-কারণেই অনেক অনেক কান-ঝালাপালা-করা স্লোগানের ভিড়ে যখন শুনি—'আলোকিত মানুষ চাই', তখন সেই স্লোগানটি জাগরণীগানের মতোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান থেকে মনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। আলোকিত মানুষ তো সেই মানুষ, প্রকৃত বিদ্যার আলোতে যার ভেতরকার সব অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। যে-মানুষ নিজে আলোকিত হয়েছেন তিনি তো অবশ্যই সেই আলো দিয়ে আলো জ্বেলে আশপাশের সকলের অন্ধকার দূর করে দিতে প্রবৃত্ত হবেন। তিনি তো অবশ্যই 'আপন হতে বাহির হয়ে' বাইরে এসে দাঁড়াবেন, এবং 'বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া' অনুভব করবেন। যিনি তা না করবেন, আপনাতে আপনিই মগ্ন হয়ে থাকবেন যিনি, অনেক অনেক বই পড়ে তাঁর মাথাটিকে তিনি নানা তথ্যের গুদাম বানিয়ে ফেললেও তাঁকে কিছুতেই আলোকিত মানুষ বলব না। আলোকিত মানুষ অবশ্যই নিজস্ব মতাদর্শবিহীন কিংবা নানামতের নির্বিচার ভারবাহী হবেন না; আবার একদেশদর্শীও হবেন না। দশদিকে তাঁর আলোর প্রক্ষেপণ ঘটিয়ে তিনি হবেন দশদিকদর্শী। সে-রকম হতে হলে তাঁর থাকতে হবে একটি সুষ্ঠু বিশ্বদৃষ্টি, একটি সুস্থ জীবনদর্শন, এবং প্রকৃতি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক নিয়মনীতি সম্পর্কে অবহিতি।

এ-রকম আলোকিত মানুষদের অবশ্যই একা একা থাকলে চলবে না। তাঁদের জোট বাঁধতে হবে, জোট বেঁধেই প্রাকৃতজনকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে, এবং সে-লড়াইয়ে জিততে হবে। সত্যিকার আলোকিত মানুষ যাঁরা, তাঁরা জানেন : অন্ধকারের শক্তিটিই রাষ্ট্রযন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রণ করছে, বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থাটিকেও কুক্ষিগত করে রেখেছে। সেই শক্তিটিই বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে ধনের দেবী লক্ষ্মীর সেবাদাসী বানিয়েছে, লক্ষ্মীকেও মুষ্টিমেয় প্রতাপশালী সম্পত্তিতে পরিণত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাকৃতজনকে লক্ষ্মীছাড়া করেছে। এই শক্তিটিকে উৎখাত করেই কেবল প্রাকৃতজন লক্ষ্মীমন্ত হতে পারে, বিদ্যা সরস্বতীর শৃঙ্খল মোচন করে বিদ্যার পণ্যায়ন ঠেকাতে ও তার অমূল্যত্ব ফিরিয়ে আনতে পারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ নু মু হা ম্ম দ

ধর্মের কথা জীবনের কথা

শৈশবে আমার মার পর যে-ব্যক্তির কাছে আমি প্রথম ধর্মশিক্ষা পাই তিনি ছিলেন আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম। মসজিদটি পরিচিত ছিল 'মাটির মসজিদ' হিসেবে। আসলেই তখন এটি মাটির তৈরি একটি ছোট্ট ঘর ছিল। সে-মাটির ঘরেই আমার প্রথম আমপারা সিপারা ও ক্রমে কোরান শেখা। সেখানেই আমার নামাজ শেখা। দীর্ঘদিন এই ঘরেই আমি কোরান পড়েছি, নামাজ পড়েছি। শুধু ঈদের নামাজ বা জুম্মার নামাজ নয়, দিনের পাঁচ ওয়াক্তের বেশিরভাগ, কখনো কখনো সব ওয়াক্তই। তারাবির লম্বা নামাজ এবং দিনের পর দিন নামাজের মধ্য দিয়ে সাতাশে রমজানের রাতে কোরান খতম করার অভিজ্ঞতা আমার বহু বছরের। কতবার এভাবে এবং একা একা কিংবা ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে কতবার কোরান খতম করেছি তার সংখ্যা মনে নেই। সংখ্যা যে বহু এটা বলতে পারি।

এখন সেই মাটির মসজিদ চারতলা একটি বিশাল ভবন। নামটি অবশ্য এখনও একই আছে 'মাটির মসজিদ'। আমার প্রথম ধর্মশিক্ষক ছিলেন একজন তরুণ ইমাম। আমাদের খুব প্রিয় ছিলেন তিনি। ছোটবেলায় ধর্মশিক্ষা করতে গিয়ে হুজুরদের সম্পর্কে অনেকের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। আমার হয়নি। যে-কারণে তিনি আমাদের প্রিয় ছিলেন সম্ভবত সে-কারণেই তিনি তাঁর চাকুরি হারান। এরপর আমরা তাঁকে আর বেশিদিন পাইনি। তিনি আমাদের প্রিয় ছিলেন কারণ যা করা তাঁর বয়সের একজন মানুষের জন্য স্বাভাবিক তিনি তা-ই করতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন, গল্প বলতেন, মাঝেমধ্যেই ফুটবল খেলতে নেমে যেতেন মাঠে। সে-সময় মসজিদের সামনে একটা পুকুর ছিল, তিনি সেখানে সাঁতারও কাটতেন। এসব কাজ অনেকেরই পছন্দ ছিল না। এখন আরও মনে হয় এসব কাজের জন্য নিছক নয়, যে-মানসিকতার জন্য তিনি 'নির্বোধ গাম্ভীর্য' থেকে দূরে ছিলেন সেই মানসিকতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নিশ্চয়ই ভিন্ন ছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে হয়তো মেলেনি মসজিদ কমিটির। মসজিদ কমিটি তো শুধু ধার্মিকদের জায়গা নয়, এটি এলাকার ক্ষমতাবানদেরও জায়গা।

আমার ধর্মশিক্ষা থেকে ধর্মবিষয়ক শিক্ষা এক দীর্ঘ পথপরিক্রমার ফসল। এটা কোনো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত কথন নয়। এক নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে বেড়ে ওঠা মানুষের ভেতর ও বাইরে থেকে দেখা ধর্ম, যার ভেতরে ও বাইরে কেবল মানুষ।

২

জন্ম এবং মৃত্যু বিশেষ করে মৃত্যু মানুষকে সবসময়ই প্রশ্ন আর ভাবনার মধ্যে ফেলেছে। অনিশ্চয়তা, নশ্বরতা মানুষকে, যখন থেকে মানুষ চিন্তা করতে সক্ষম সেই বহু বহু প্রাচীন কাল থেকে, নতুন নতুন বিশ্বাস কাঠামোর জন্মদানে আকর্ষণ করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। মানুষ বুঝতে চেয়েছে নিজেকে, বুঝতে চেয়েছে প্রকৃতিকে, তাকাতে চেয়েছে অজানার দিকে। মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে নিজে শক্তি পেতে চেয়েছে, নিজেকে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছে আরও অনেককিছুর সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> "মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
> আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে ॥
> ... ...
> অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
> তুমি আছ মোরে চাহি—আমি চাহি তোমা-পানে।
> স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
> এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা বিস্ময়ে ॥"

প্রকৃতি আর মানুষের একাকার অবস্থার মধ্য দিয়েই মানুষ ক্রমান্বয়ে নিজেকে উন্মোচিত করেছে, করেছে প্রকৃতিকে। যত উন্মোচন তত যেন আরও বড় রহস্য সামনে। এই করেই মানুষের সমাজ সংসার এগিয়েছে। বিজ্ঞানচিন্তা, দর্শনচিন্তা থেকে শুরু করে নানাবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে এই পথেই।

সচল মানুষ কখনো শূন্যমস্তিষ্কে থাকে না, থাকেওনি। জীবন জগৎ নিয়ে সকল সময়েই সব মানুষেরই নিজ নিজ চিন্তা বা ব্যাখ্যা ছিল, আছে। মানুষ কোথেকে এল, কোথায় যাচ্ছে এই প্রশ্ন মানুষের প্রথম ভাবনার একটি। ক্রমান্বয়ে মানুষ তার জন্মরহস্য উন্মোচন করেছে, উন্মোচন করেছে প্রকৃতির আরও অনেক রহস্য, মানুষের নিজের শরীর যা নিজেই এক মহাজগৎ, তার পুরোটা না হলেও অনেককিছু এখন মানুষের জানা। কিন্তু যে-রহস্য মানুষকে এখনও কাবু করে রেখেছে তা হল মৃত্যু। মৃত্যুভাবনা মানুষকে-জগৎ সম্পর্কে তার ভাবনাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যায়। মানুষ মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে চায়। এর জন্য তার চিন্তায় মৃত্যুপরবর্তী একটি জগৎ সবসময়ই তৈরি হতে চায়, সবসময়ই দেখা যায়। মানুষ 'জন্ম জন্মান্তরের' কথা ভাবে। এই ভাবনায় সে নিজে একা দাঁড়াতে পারে না। সাথে তৈরি করতে হয় এমন শক্তি যার ক্ষমতা তার মতো সীমাবদ্ধ নয়, অসীম। ক্রমে তৈরি হয় ঈশ্বরভাবনা। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যত সম্প্রসারিত হয় তত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শক্তির রূপ ও ধরনের মধ্যেও পরিবর্তন হয়। ঈশ্বর তাই কাল, স্থান ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ শাশ্বত থাকতে পারে না। তার অবয়ব চারিত্র্য ইত্যাদিতেও পরিবর্তন হয়।

মানুষের ধর্মভাবনা তাই পরিবর্তনশীল। সেজন্য মানুষের ইতিহাসে যত ধর্ম এখন টিকে আছে তার চাইতে বেশি ধর্ম বিলুপ্ত হয়েছে। যত ধর্ম টিকে আছে সেগুলোও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। প্রতিটি ধর্মের গায়েই কাল, স্থান আর মানুষের নতুন ধ্যানধারণা আর উপলব্ধির ছাপ চোখে পড়ে।

৩

মসজিদের ইমাম নিজে ক্ষমতাবান, ক্ষমতাবান মসজিদের মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসার শিক্ষক। তাঁদের কথা শুনে গ্রাম শহরের মানুষ অনেক কাজই করে। গ্রামে এখনও মুরগির প্রথম ডিম, জাংলার প্রথম লাউ, গাইয়ের প্রথম দুধ ইমাম সাহেব, না থাকলে ছোট হুজুরের কাছেই যায়। মানুষ তার জীবনের অনেক সিদ্ধান্ত নেবার সময়ই প্রথম যায় ইমাম সাহেবের কাছে। গ্রামের সালিশে এখনও ইমাম সাহেব একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শহরে গরিব ধনী ধর্মবিশ্বাসী সকল মানুষ তাঁদের সাফল্য বা ব্যর্থতার সময়ে দোয়া চাইতে তাঁদেরই শরণাপন্ন হন। মিলাদে ডাকেন কিংবা দোয়া মাহফিলে তাঁর উপস্থিতি না থাকলে ভরসা পান না। গরিব শ্রমজীবী পরিবারও অন্য কিছু জোগাড় করতে পারলে তার কিছু মসজিদে দিয়ে আসতে চেষ্টা করে। এমন অনেক পরিবার শহরেও আছে যারা নিয়মিত একজন হুজুরকে খাওয়ায়, অন্যকে মসজিদে খাওয়া পাঠান। আমাদের পরিবারে আব্বার দাওয়াতে বরাবর যে-না-কোনো হুজুর, ইমাম বা মুয়াজ্জিন, নিয়মিত খেতেন। দোয়া পড়তেন, আমাদের নসিহত করতেন।

কোনো সাফল্যে শোকরানা আদায়ের অংশ হিসেবে হুজুরকে কোনো উপহার দেয়াও একটা রীতি। কোনো বিপদ-আপদে তাঁর কাছ থেকে দোওয়া, তাবিজ নিয়ে কাপড় বা অর্থ বা উপহার দেয়াও একটা রুটিন-ব্যাপার। জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহে হুজুরদের উপস্থিতি তো অপরিহার্য। জীবনের বিভিন্ন পর্বে উপস্থিতি যাঁদের এত অপরিহার্য তাঁরা নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান। তাঁদের ক্ষমতাহীন ভাববার কোনো কারণ নেই। জীবনের বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তাঁদের সিদ্ধান্ত একরকম অপরিহার্য।

কিন্তু তার পরও ইমাম বা মুয়াজ্জিন সাহেবরা কি সমাজের ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন, এই প্রশ্ন আমার সেই সময় থেকেই। এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজেছি তখন থেকেই। বুঝবার চেষ্টা করেছি আশপাশের অনেককিছু। ক্ষমতাবানরা যেভাবে জগৎ দেখে, যেভাবে নিজের ক্ষমতা চর্চা করে, যেভাবে সম্পদ ও কর্তৃত্ব তৈরি করে তার বিরুদ্ধে তাদের কথা বলার উপায় কী? যাদের আয় আসে দখল দুর্নীতি জালিয়াতি প্রতারণা লোকঠকানো মিথ্যাচার থেকে সেসব আয়ের বিরুদ্ধে কী করে তাঁরা কথা বলতে পারেন? তাঁরা কি এ-ধরনের আয় উপার্জনকারীদের মসজিদ উন্নয়নে টাকা দিতে কিংবা এ-ধরনের লোকদের মসজিদ কমিটিতে ঢোকার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন? বারবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছি, পারেন না। পারেন না বলে সবার প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না। দেখেছি অনেকেই সয়ে যান, ধর্মীয় যুক্তি দাঁড় করান, নির্দ্বিধায় জালিমের পক্ষে ফতোয়া দেন। আবার জালিম শয়তান কিসিমের লোকের কথা শুনতে হচ্ছে বলে ঘৃণা ক্ষোভে কাঁদতেও দেখেছি এক ইমামকে।

পারেন না, কেননা এসব ক্ষমতার অনেক গ্রন্থি আছে। এসব উৎস থেকেই সবচেয়ে বেশি টাকা আসে মসজিদ উন্নয়নে। মসজিদ মাদ্রাসায় টাকা দিলে আয়কর মাফ হয়, আবার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভাবমূর্তি তৈরি হয় যে-ভাবমূর্তি অনেক কিছু ঢেকে রাখে। আবার পুরনো ক্ষমতার উপর নতুন ক্ষমতা যোগ হয়। এদের বিরুদ্ধে কথা বলে স্কুল শিক্ষক মাদ্রাসা-শিক্ষক কিংবা মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিন কারও পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব হয় না। কারণ এই ক্ষমতাবানরাই কমিটিতে, তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আর এদের প্রিয় হলে বিভিন্ন দাওয়াত, উপহার, নজরানা যে-পরিমাণ আসে তা মাসের বেতন থেকে অনেক বেশি। তাই এসব লোকের সঙ্গে আপোস করা, তাদের আধিপত্য মেনে নেবার অভ্যাস করা নিরাপদ। আমার শৈশবে যে-হুজুর প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সবারই, তিনি এই অভ্যাসটা করতে পারেননি। সেজন্য সাজা পেয়েছিলেন। এরপর কোথায় গেছেন তিনি আর জানতে পারিনি। কিন্তু এরকম হুজুর আরও দেখেছি, খুবই কম, তাঁদের জীবনও সংখ্যাগরিষ্ঠ হুজুরদের মতো আরামদায়ক হয়নি।

AMARBOI.COM

বাংলায় ধর্ম বলতে শুধু রিলিজিয়ন বোঝায় না, এটা বোঝায় আরও অনেককিছু। ধর্ম বলতে বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, নীতি, নিয়ম, লক্ষণ, গুণও বোঝায়। 'মানুষের ধর্ম' 'পশুর ধর্ম' 'বস্তুর ধর্ম' সেরকমই কিছু কথা। আসলে রিলিজিয়ন মানে যে ধর্ম বোঝায় সেটাও নানাভাবে নির্দিষ্ট কাল-স্থান ও বিশ্বাস-কাঠামোয় একটি বিশ্বাসী গোষ্ঠী, তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য, পরিচয় এ সবকিছুই শনাক্ত করে।

মানুষের বর্তমান সময়ে আমরা যখন ধর্মের কথা বলি তখন কতিপয় প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বধর্ম'-এর কথাই সবার আগে মনে আসে। মনে হয় যেন এসব ধর্ম মানুষের সঙ্গে তার অনাদিকাল থেকে জড়িয়ে আছে। এরকম বোধ হয় যে, মানুষ সবসময়ই এরকম ধর্ম দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বধর্ম হিসেবে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি দিয়েছে সেগুলোই মানুষের বিশ্বাস প্রথা ও ধর্মীয় পরিচয়ের আদি নয়।

মানুষের অভিজ্ঞতা আর ধর্মের অভিজ্ঞতা এই দুই-এর মধ্যে কি কোনো তফাত আছে? মানুষের বয়স আর ধর্মের বয়সের মধ্যে কার বয়স বেশি, কার কম, নাকি এরা বয়সে এক? এক হিসেবে এক আবার অন্য হিসেবে ভিন্ন। অর্থাৎ মানুষ যখন থেকে মানুষ, যখন থেকে সে চিন্তা করে, তখন থেকেই তার সমাজ প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস চিন্তা প্রথা ব্যাখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসন্ধান সবই ছিল। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথা যদি বলি তা হলে বলতে হবে তার বয়স মানুষের তুলনায় অনেক কম। এযাবৎকাল যত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এসেছে সেগুলোর সবচেয়ে পুরনো যে তার বয়সও এখন থেকে বড়জোর চার হাজার বছর। কিন্তু মানুষের বয়স, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে, প্রায় দশ লক্ষ বছর। মানুষের বয়স মানে যখন থেকে বর্তমান মানুষের উদ্ভব হয়েছে। তার মানে প্রায় নয় লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বছর মানুষ বর্তমানে প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলোর আওতার বাইরে ছিল। কিন্তু তার অর্থ আবার এটা নয় যে, মানুষ তখন এ-সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা, অনুশাসন, বিশ্বাস বা ভক্তি বা ভীতি বা পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সেসবগুলোকেও আমরা ধর্ম বলতে পারি আবার বলতে পারি জীবনব্যবস্থাও। সেখানে এক-একটি ছোট ছোট জনগোষ্ঠী বা গোত্রের জীবন-যাপনের সবকিছুর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাদের বিশ্বাস, প্রথা, অনুশাসন মিলিয়েই আমরা শনাক্ত করতে পারি। সেসব ধর্মে কোনো ঐশী গ্রন্থ পাওয়া যায় না কেননা গ্রন্থের যুগে মানুষ প্রবেশই করেছে অনেক পরে। কিন্তু সবকিছুতেই অতিপ্রাকৃত শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে ধর্ম মানে বর্তমানে আমরা যেভাবে বুঝি, একক ব্যক্তির পরকালের শান্তি বা নিরাপত্তা নয় বরঞ্চ জীবনকালের, সমষ্টির টিকে থাকার পথ, পদ্ধতি ও নিশ্চয়তা। মৃত্যুপরবর্তী চিন্তাও তারই অংশ।

৫

মসজিদে নিয়মিত যেতে যেতে এবং পরিবারে আব্বার দাওয়াতে বিভিন্ন পীর হুজুরদের আগমন ও তাঁদের প্রতি অন্যদের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখতে দেখতে আমার সেই জীবনের প্রতি আগ্রহ বেড়েছিল যে-জীবন এই সমাজের মধ্যে থেকেও ভিন্ন। ক্রমে বুঝেছি এই জীবন শ্রদ্ধা এবং করুণা একই সঙ্গে অর্জন করে, যে-জীবন অভিশাপ ও ঘৃণাও কুড়ায় কম নয়, যে-জীবনের চারদিকে গভীর আবরণ দিয়ে একটা রহস্য ভাব সদা জারি থাকে। এই রহস্যঘেরা মানুষেরা একটা ভিন্ন ভাব তৈরি করেন শুধু পোশাকে নয়, মুখভাব, ভাষা আর জীবনযাপনেও। রহস্য আর গাঢ় হয় যখন নানারকম গল্প, লৌকিক ও অলৌকিক, তাঁদেরকে ঘিরে প্রচার পায়। প্রভাব ও ক্ষমতা বেশি দেখা যায় তাঁদের যাঁদের ঘিরে এসব গল্পের সংখ্যা বেশি। আমার শিশুকিশোর উপলব্ধি থেকে হুজুরদের দেখেছি অনেক ক্ষমতাবান হিসেবে। চারপাশের সকল মানুষকে, বিশেষত আমার কাছে প্রবল ক্ষমতাধর ব্যক্তি আমার পিতা এবং তারপর আমার শিক্ষকদের যেভাবে এই হুজুরদের প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হতে দেখেছি, যেভাবে দেখেছি বিপদে আপদে বা আনন্দ বেদনায় তাদের শরণাপন্ন হতে তাতে হুজুরদের জায়গা ছিল অনেক উপরে। আরও বিভিন্ন কাহিনী শুনে শুনে মনে হত এঁদের অজানা কিছু নেই, অসাধ্য কিছু নেই।

মাদ্রাসার ছাত্রদের (মাদ্রাসায় ছাত্রী পড়ে সেটা শুনেছি বহুকাল পরে) দেখেও বেশ কৌতূহল হত। দেখতাম একই বয়সের স্কুলে-পড়া ছেলেরা যেখানে কোনো ভুল হলে বা না-হলে বকা খায়, তিরস্কৃত হয়, মার খায়, সে-সময় মুরুব্বিরাও মাদ্রাসার ছাত্রদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ পাত্তা দিচ্ছেন। বরাবর দেখে এসেছি সমাজে এ-শ্রেণীর ভিন্ন অবস্থান। দেখেছি যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ বা যারা শ্রমজীবী মানুষ তারা বসে নিচে, তাদের খাওয়াও ভিন্নভাবে দেওয়া হয়, তাদের গুরুত্ব থাকে সর্বনিম্ন, আত্মীয় হলেও এই অবস্থার কোনো ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্র বা হুজুর দুর্বল সামাজিক অবস্থান থেকে এলেও, তাদের আর্থিক অবস্থা যা-ই থাকুক, তারা বসা, খাওয়া ইত্যাদিতে বেশ গুরুত্ব পায়। এসব দেখে এই জগতের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। মনে হয়েছে তা হলে মাদ্রাসায় কেন পড়ি না?

মাদ্রাসা আমি দেখেছি একটু বড় হয়ে। নানার বাড়ি গ্রামে যেখানে প্রথম ছোট মাদ্রাসা দেখেছি। সেখানে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল না। বড় মাদ্রাসা এবং বোর্ডিং প্রথম দেখি লালবাগে। লালবাগ শাহী মসজিদ এবং মাদ্রাসা একই সঙ্গে লাগোয়া। এরপর দেখি কামরাঙ্গির চর-এর মাদ্রাসা। এ সবই দেখি আমার আব্বার সঙ্গে গিয়ে। আব্বা প্রথমে ছিলেন পরীবাগের পীরের মুরিদ। পরীবাগের পীরসাহেবের মৃত্যুর পরও আব্বা যেতেন দরবারে। ক্রমে বুঝতে পারি তিনি লালবাগের হাফেজ্জী হুজুরের মুরিদ হয়েছেন। লালবাগ শাহী মসজিদ ও মাদ্রাসার পর, আমরা শুনতাম, হাফেজ্জী হুজুরের নিজের বিশেষ উদ্যোগে কামরাঙ্গির চরে মাদ্রাসা হচ্ছে। সেখানেই তিনি বেশি সময় দিতেন। আব্বা এইসব জায়গাতে গিয়ে হাফেজ্জী হুজুরের সঙ্গে দেখা করে দোয়া নিতেন এবং আমাদেরকেও তাঁর সামনে এগিয়ে দিতেন। এতেকাফে বসতেন। আগ্রহের কারণে বেশিরভাগ সময়ে আমি একাই থাকতাম আব্বার সঙ্গে। শুনতাম জানতাম, হুজুরের সঙ্গে এই দেখা হওয়া এবং তাঁর দোওয়া পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। সবাই এরকম পায় না।

AMARBOI.COM

৬

ধর্ম মানে যদি কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস এবং তার সাথে অন্যান্য বিশ্বাস প্রথা অনুশাসন বোঝায় তা হলে বলা যায় সকল পর্বেই মানুষের মধ্যে ধর্মের উপস্থিতি ছিল। তবে তা কখনোই একরকম থাকেনি, মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ্বাসের ধরন, ঈশ্বর দেবতা সবই।

একক অসীম ক্ষমতাধর হিসেবে ঈশ্বরকে এবং তার সঙ্গে যুক্ত নানা ক্ষেত্রে নিয়োজিত দেবতা বা ফেরেশতাদের আলাদাভাবে আবিষ্কার করবার আগে মানুষ এসব ক্ষমতা দেখেছে তার দেখা জগতের অস্তিত্বমানদের মধ্যেই। মানুষের জ্ঞানজগতে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনেক পরে। মানুষের যে-বয়স তার বেশিরভাগ সময়েই মানুষ বিশ্বাস করেছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার বহুকেন্দ্রে। কেননা মানুষের নিজের জীবনও এককেন্দ্রিক কোনো ব্যবস্থা দেখেনি ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়ে। মানুষ দীর্ঘকাল যে-গোত্রে জীবনযাপন করেছে সেখানে তার জীবন ছিল যৌথ। ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা এই ব্যবস্থা ভেঙে ছোটবড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার মধ্যেই ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীনকালে বর্তমান মিশর অঞ্চলের অধিবাসীদের ছিল শত শত দেবতা যাদের একেকজন একেক গোত্রের কাছে ঈশ্বরের মর্যাদা পেত। গোত্রের ভাঙন, যুদ্ধ ও একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় দুর্বল বা পরাজিত গোত্রের দেবতা বা ঈশ্বরেরও নাজুক অবস্থা হয়। এবং ক্রমান্বয়ে যা দাঁড়ায় তাতে গোত্রের সংখ্যাও কমতে থাকে, কমতে থাকে দেবতা বা ঈশ্বরের সংখ্যাও। খ্রিস্টজন্মের ৩২০০ বছর আগে অর্থাৎ এখন থেকে ৫২০৪ বছর আগে মিশরের একটি বড় অংশ জুড়ে বিভিন্ন গোত্র একীভূত হয় এবং মানব-ইতিহাসের প্রথম দিককার রাজা হিসেবে আবির্ভূত হন রাজা মেনেস। এতদিন যেসব দেবতা-ঈশ্বর বিভিন্ন গোত্রের পরিচয় হিসেবে উপস্থিত ছিল তারা অনেকে দুর্বল বলে পরিত্যক্ত হল। শক্তিশালী গোত্রের যারা তাদের মধ্যে বাছাই-করা বা শক্তিশালী হিসেবে স্বীকৃত তারাই টিকে থাকল। রাজা মেনেস-এর শাসন সংহত হবার পর তিনজন দেবশক্তিকে 'জাতীয়' মর্যাদা দেওয়া হল। এর মধ্যে *হোরাস* ছিল রাজার ব্যক্তিগত ঈশ্বর, *রা* সূর্য ঈশ্বর/দেবতা। *রা*-কে বিবেচনা করা হত ফেরাও রাজাদের আদি শক্তি হিসেবে। এই বিশ্বাস অনুযায়ী ফেরাও রাজা বা সম্রাটেরা আসলে স্বর্গের প্রেরিত, ঈশ্বরেরই অংশ। আমরা পরেও দেখেছি দেশে দেশে রাজতন্ত্র দীর্ঘদিন মানুষের এই বিশ্বাস-এর উপরই টিকে থাকে।

ভারতে যা এখন হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত তাতে আমরা আরও বিস্তৃতভাবে দেখি বহু দেবী ও দেবতা অর্থাৎ বহু জনগোষ্ঠী কীভাবে একক ধর্ম-পরিচয়ের অধীনে চলে আসে, বহু দেবী ও দেবতা কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় এমনকি বিরোধিতা নিয়েও একক রাষ্ট্র জাতি উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে একক ধর্ম-পরিচয়ের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়।

দেবতা বা ঈশ্বরের অন্য কোনো পরিচয় দাঁড়াবার আগে গোত্র পর্যায়ে প্রকৃতিই ছিল মানুষের অবনত হবার ক্ষেত্র। বিশাল প্রকৃতির অসীম উপস্থিতি, রহস্য আর ক্ষমতার সৌন্দর্য কিংবা ভয়াবহত্ব নিয়েই সবকিছু নিয়ে হয়ে উঠেছিল ঈশ্বর। সেই হিসেবে এই প্রকৃতি তার অজানা শক্তি দিয়ে মানুষকে রক্ষা করত, তাকে খাওয়াত, আশ্রয় দিত, ভয় দেখাত আবার শাস্তিও দিত। সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ, শস্য, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত সবকিছুই ছিল বিস্ময় এবং অসীম ক্ষমতার প্রতীক। মানুষ নানারকম পূজা দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখত, সন্তুষ্ট না রাখলে চলবে কেন? এসবের মধ্যেই, এসবের সঙ্গেই তো মানুষের বসবাস।

প্রকৃতিজগতের এই সবকিছুই বিবেচিত হত জীবন্ত হিসেবে। সেই হিসেবে ইচ্ছা অনিচ্ছা সন্তুষ্টি ক্রোধ সবই এদের আছে এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে দৃঢ়মূলই থাকবার কথা। সুতরাং মানুষ তার অধীনস্থ হিসেবে ভালো থাকা খারাপ থাকা পাপ পুণ্য করণীয় বর্জনীয় ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ধারণা নির্মাণ করতে থাকে তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই। কোনো-না-কোনো পশু কিংবা প্রকৃতির কোনো-না-কোনো অংশের নামে গোত্রের পরিচিতি ঘটে এরকম অভিজ্ঞতার মধ্যেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরান যদিও অনেক খতম করেছি কিন্তু তার ভাষ্য সে-সময় আমার কিছুই জানা ছিল না। অনেকের মতো আমিও ধর্ম বলতে যা জেনেছি তাকেই শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত বলে জেনেছি। কিন্তু ধর্ম আসলে তো শুধু শাস্ত্র দিয়ে চলে না। শাস্ত্রের পাশে, শাস্ত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে অনেক ভাষ্য। এই ভাষ্য কীভাবে গড়ে ওঠে তা আমার জানা ছিল না। ভাষ্যের মধ্যে ক্ষমতা, সমাজবিন্যাস দেখার মতো অবস্থাও তৈরি হয়নি। জানা ছিল না এটাও যে, এই ভাষ্য একক নয়, অপরিবর্তিত নয়। জানা ছিল না যে একই ইসলাম ধর্মেরও অনেক ভাষ্য গড়ে উঠতে পারে। সেই অনেক ভাষ্য নিয়ে বিরোধ, জটিলতা এমনকি সহিংসতাও হতে পারে। যে-পরিবারে এবং যে-চারপাশ নিয়ে বড় হচ্ছিলাম তার ভাষ্যই আমারও ভাষ্য হয়ে গিয়েছিল। আর তার সঙ্গে মেলে না যেসব কথা বা কাজ সেগুলো আমার কাছে ছিল পরিত্যাজ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে ঘৃণ্যও। কী কী কাজ করলে কতটা ছোয়াব আর কী কী কাজ করলে কতটা গুনাহ্ সেটাও ক্রমে নিজের ভেতর জায়গা করে নিয়েছে। এই সবকিছু মিলে অন্য সবার মতো কাদের থেকে আমি আলাদা তারও একটি মানসিক গঠন তৈরি হয়েছিল।

আমি জেনেছি অমুসলিমেরা কাফির, মৃত্যুর পর যাদের আর কোনো উপায় নেই, নির্ঘাত তাদের জন্য দোজখবাস। দোজখের ভয়াবহ বর্ণনা অনেক ছোটবেলা থেকেই শুনেছি। এর মধ্যে আগুন, সাপ এবং দুরমুজ ছিল সবচাইতে ভীতিকর। দোজখের আগুন যে কতটা ভয়াবহ, সাপের চেহারা আর দুরমুজ যে কতটা ভয়ংকর তার যথাযথ বর্ণনা দান করা বক্তাদের পক্ষেও কখনোই সম্ভব হচ্ছে না। তাঁরা যতটা বলতেন তার অনেক কম বললেও এমনকি এগুলো পৃথিবীর সেরা হলেও তা, আমার ঐ বয়সে ভয় পাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বক্তারা সবসময়ই মনে করিয়ে দিতেন যে আসল ভয়াবহতা এর থেকে অনেক বেশি, তার বর্ণনা সম্ভব নয়। দোজখের বয়ান ছিল সবসময়ই সতর্ক করবার, নানাকিছু থেকে বিরত রাখবার এবং অনুমোদিত নানাকাজে যুক্ত করবার একটি খুব কার্যকর উপায়।

অবধারিত দোজখবাসী অমুসলিম কাফিরদের বিশ্বাস প্রথা নিয়মকানুন ইত্যাদি সম্পর্কে যা বিভিন্ন হুজুরের বয়ানে কিংবা মুরুব্বিদের কথা থেকে, এমনকি স্কুলশিক্ষকদের কাছ থেকে শুনেছি তাতে তাদের প্রতি কোনো কৌতূহল কিংবা শ্রদ্ধা তৈরি হয়নি। বরঞ্চ তৈরি হয়েছে একটা করুণা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘৃণাও। হিন্দুদের বিষয়টি সবসময়ই প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপিত হত। হিন্দু এবং ভারত বরাবর ছিল সমার্থক। তাদের পোশাক, বিশেষত ছেলেদের ধুতি এবং মেয়েদের কপালে টিপ, মাথায় সিঁদুর কখনো নিন্দা, কখনো হাস্যরস, কখনো বিদ্রূপের ব্যাপার ছিল। এই সহজ তথ্যটি জানতে বহুবছর লেগেছে যে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ধুতি পরেন না, কপালে টিপ দেন না আর পানিকে জল বলেন না। অথচ এগুলোই ছিল চিহ্ন যা দিয়ে দূরত্ব অবিশ্বাস ঘৃণা তৈরি হতে থাকত। এসব বক্তব্য আবার একই সঙ্গে পাকিস্তান-পূর্বকালে বিভিন্ন অঞ্চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু দ্বারা মুসলিম বৈষম্য, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের নানা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, জনশ্রুতি দ্বারা মিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হত। তার ফলে হিন্দু চরিত্র একই সঙ্গে দয়ামায়াহীন, নির্মম এবং যেহেতু মূর্তিপূজক সেহেতু অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাসী। শুনতাম এরা মূর্তিপূজক হিসেবে যারা আরবদেশে ইসলাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তাদের সমগোত্রীয়—কাফের।

কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও ছিল। হিন্দু সম্পর্কে এসব বর্ণনা যাদের কাছ থেকে শুনেছি তাদেরকেই আবার মুগ্ধ হয়ে শুনতে দেখেছি এমন শিল্পীদের গান, পাগল হতে দেখেছি এমন শিল্পীদের ছবি দেখবার জন্য, অধীর আগ্রহ নিয়ে পড়তে দেখেছি এমন লেখকদের বই যারা নামে পোশাকে হিন্দু। তাদেরকেই বলতে শুনেছি যে হিন্দু শিক্ষক, হিন্দু কারিগর, হিন্দু ময়রাদের কোনো তুলনা হয় না। মুসলমানদের পক্ষে এসব কিছুই করা সম্ভব হবে না। চোখেমুখে আনন্দ আর শ্রদ্ধা নিয়ে অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনেছি হিন্দু বিদ্বান বা গুণী ব্যক্তিদের সাহচর্যের। এ-দুটি কীভাবে মেলে তা নিয়ে তখন কোনো প্রশ্ন আমার নিজের মধ্যে আসেনি। হয়তো মনে হয়েছে এটাই স্বাভাবিক। ঢাকায় আমার পাড়ায় কিংবা পরিচিতজন কিংবা সহপাঠীদের মধ্যে হিন্দু কেউ ছিল না, বা খ্রিস্টানও নয়, প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুদিনের জন্য একজন বৌদ্ধ সহপাঠী পেয়েছিলাম। ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সেজন্য কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়নি। অন্যান্য জাতিরও কারও সঙ্গে আলাপ হয়নি দেখা হয়নি। তার ফলে একক একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল পরাক্রমের মনোজগতের প্রবাহের মধ্যে থেকে অন্যদের কথা শুনেছি। কয়জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে বিভিন্ন সূত্রে দেখেছি, ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়বার সময় একজন হিন্দু শিক্ষক পেয়েছিলাম যিনি আমাকে আমার নানার আরবি বানান শিখিয়েছিলেন। নানাবাড়িতে বড়ছোট যে-কোন অসুখবিসুখে যে-ডাক্তারের উপর আমরা শুধু নয় পুরো গ্রামবাসীই নির্ভর করত তিনি ছিলেন একজন হিন্দু, মণি ডাক্তার। গ্রামে থাকাকালে তাঁর চিকিৎসার উপরই আমাদের নির্ভরতা ছিল। দীর্ঘদেহী পাতলা, সাইকেল-এ করে আসতেন। গ্রামে কারিগর বা দইমিষ্টি বানানোর মানুষেরা হিন্দু ছিলেন। আর ছিলেন চামার বলে কথিত জনগোষ্ঠী। খুবই নিম্নপর্যায়ে ছিল তাদের অবস্থান।

আরেকটি ধর্মগোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা জেনেছি খুব খারাপভাবে। এরা মূর্তিপূজক নয়—এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিতাবী অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্যেও আল্লাহর কাছ থেকেই কিতাব এসেছিল। সেই হিসেবে তারাও আল্লাহর বান্দা কিন্তু তারা অভিশপ্ত এবং নিন্দিত। আমরা জেনেছি আল্লাহ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরা হল ইহুদি। ইহুদি কোনো মানুষ বাংলাদেশেই তখন ছিল কি না জানি না। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিবাসী কোনো ইহুদি ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কারও দেখা হয়েছে এরকমও শুনিনি। ইহুদি ধর্মাবলম্বী ভিনদেশীর দেখা পেতেও বহু বছর পার হয়েছে। কোনো দেখাসাক্ষাৎ না হলেও কিংবা দেশের মানুষের নিজস্ব কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা না থাকলেও, বিশেষত এদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রতি প্রবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘৃণা টের পেয়েছি সবসময়ই। এটা জারি থাকতে পেরেছে দুটো সূত্র থেকে : এক. ধর্মগ্রন্থে সরাসরি ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ থেকে এবং দুই. প্যালেস্টাইনে সেখানকার অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে ব্রিটিশ-মার্কিনের জোর জবরদস্তি করে একটি ইহুদিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তাদের অব্যাহত সন্ত্রাস থেকে।

আর কোনো ধর্মাবলম্বী বা বিশ্বাস প্রথা নিয়ে এরকম বৈরী অবস্থান না থাকলেও কোনো শ্রদ্ধাও গড়ে ওঠেনি আমাদের মধ্যে। বৌদ্ধভিক্ষুদের ন্যাড়া মাথা কিংবা গেড়ুয়া পোশাক নিয়ে হাসিঠাট্টা কিংবা খ্রিস্টান পাদরিদের নানা ত্রুটি বের করার উদ্দেশ্যে কথাবার্তা ছিল আমাদের উপভোগ্য একটা কাজ। শুনে শুনে এমনভাবেই নিজেদের ধর্মবোধে ও তার শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা মুগ্ধ ছিলাম যে আর সব বিশ্বাস বা প্রথা বা নিয়মনীতিই আমাদের মনোযোগ বা অনুরাগ আকর্ষণ করতে পারেনি। প্রকৃতিপূজাসহ ভিন্ন ধরনের সকল চর্চা প্রথা সম্পর্কে যা-কিছু শুনেছি তা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক, উদ্ভট, অযৌক্তিক হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মে অবিশ্বাসীদের নিয়ে নানা কটুকথা তখন শুনেছি। ধর্মে অবিশ্বাস মনে হত অসম্ভব একটা ব্যাপার! এই অবিশ্বাসীদের জন্য যে কী ভয়ংকর শাস্তি অপেক্ষা করছে সেটা শুনে আঁতকে উঠতাম। এরকম কারও সঙ্গে আমার তখন দেখা হয়নি। তবে স্কুলে মসজিদে এবং বাড়িতেও শুনতাম এই অবিশ্বাসীরা হল কমিউনিস্ট, তারা চীন রাশিয়ায় রাজত্ব করছে। সে এক ভয়াবহ রাজ্য।

AMARBOI.COM

এককেন্দ্রিক ধর্ম অর্থাৎ একেশ্বরবাদী ধর্মের বয়স তুলনায় সবচাইতে কম। একেশ্বরবাদী ধর্ম বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে স্রষ্টারূপে হিসেবে যেসব ধর্ম গ্রহণ করে সেগুলো। একেশ্বরবাদী ধর্ম মনে করে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার থাকতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে এই ভাবধারার প্রথম ধর্ম মুসা-প্রবর্তিত ইহুদি ধর্ম। আরব-বিশ্বে যারা নিজেদেরে নবী ইব্রাহিমের উত্তরসূরি হিসেবে মনে করত তাদের মধ্যেই এই ধর্মের উদ্ভব ঘটে। ইহুদি ধর্ম প্রবর্তনের সময়কাল খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ১৮০০ বছর আগে বা এখন থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগে। এই ধারাতেই প্রায় একই অঞ্চলে পরপর আরও দুটি ধর্মের উদ্ভব হয়। এগুলো হল : ১৮০০ বছর পরে খ্রিস্টধর্ম এবং প্রায় ২৪০০ বছর পরে মানে এখন থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে ইসলাম ধর্ম। পুরোপুরি এই ধারায় না হলেও দূরের অঞ্চলের সর্বশেষ একেশ্বরবাদী ধর্ম সম্ভবত ব্রাহ্মধর্ম। এর প্রতিষ্ঠা কলকাতায় প্রায় ২০০ বছর আগে।

একেশ্বরবাদী (মনোথেইজম) ছাড়া আরও অনেকরকম ঈশ্বর প্রথা ছিল এবং এখনও আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—

- *নির্বাচিত ঈশ্বরবাদী (হেনাথেইজম) :* বহু গোত্র বা জনগোষ্ঠী বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও একজন নির্দিষ্ট ঈশ্বরকে তাদের নিজেদের ঈশ্বর বলে মনে করত যার প্রতি অনুগত থাকা তারা দায়িত্ব মনে করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- ***বহুঈশ্বরবাদী (পলিথেইজম) :*** এই ধারার অনুসারী বলতে তাদের বোঝায় যারা বহু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তাদের প্রতি অনুগত। এই ধারণাও অনেকের মধ্যে প্রবল যে, এই বহু ঈশ্বর আসলে বহু ঈশ্বর নয়, এক ঈশ্বরেরই বহু রূপ। বহুরূপে এ আসলে একজনই। হিন্দু ধর্মের বহু ধারা উপধারার মধ্যে এই ধারণা প্রবল।
- ***জগৎ ঈশ্বরবাদী (প্যানথেইজম) :*** এই জগতের সকলকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর আছে। অথবা জগৎচরাচরে যা-কিছু সবই ঈশ্বর।
- ***প্রাণ ঈশ্বরবাদী (প্যানেনথেইজম) :*** সকল প্রাণ, জীবই আসলে ঈশ্বরের একেক প্রকাশ বা তার উপস্থিতি প্রকাশ করে।

এই ঈশ্বর, একক হোক বা বহু হোক, কি নারী না পুরুষ? অনেক ধর্মেই, বিশেষত একেশ্বরবাদী ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে এই প্রশ্ন রীতিমতো ধর্মদ্রোহিতার শামিল। বাংলা ভাষায় সম্বোধনে লিঙ্গীয় বিভাজন করা যায় না আরবি, হিব্রু এবং ইংলিশ ভাষায় ঈশ্বর আল্লাহ সম্পর্কে সম্বোধন যেভাবে উপস্থিত করা হয় তাতে তাঁর পুরুষরূপই প্রকাশিত হয়। ইংলিশ-এ স্পষ্টতই তাঁকে হি (বড় হাতের এইচ) বলা হয়, কদাচ শি নয়। অন্যান্য প্রধান ধর্মেও ঈশ্বর বা প্রবলপরাক্রান্ত দেবতাদের পুরুষ হিসেবেই দেখা যায়। কিন্তু মানুষের অতীত অনুসন্ধান করে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র।

প্রাচীনকালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষত যেসব অঞ্চলে পরবর্তী সময়ে প্রধান অনেকগুলো ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে, সেই মধ্যপ্রাচ্যে পুরনো জীবনের যা-কিছু স্বাক্ষর আছে সেখানে আমরা পাই বিভিন্ন গুহাচিত্র, মাটির বা পাথরের বিভিন্ন মূর্তি। এগুলোর মধ্যে বড় বড় কর্তৃত্বশালী চেহারার কিছু মূর্তি পাওয়া যায় যেগুলো দেখে বোঝা যায় এগুলো তৎকালীন মানুষের নিজেদের নয়, তাদের গ্রহণ করা দেব বা ঈশ্বরের মূর্তি, যাকে মানুষ পূজা করত বা ভক্তি করত। এসব মূর্তির সময়কাল বিবেচনা করলে আমরা যত পেছনে যাই তত অধিকসংখ্যায় আমরা এমনসব মূর্তি পাই যাদের শরীরগঠন নারীর। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এরকম মূর্তির সন্ধান পেয়েছেন ৩০ হাজার বছর আগেরও। শুধু প্রত্নতত্ত্ববিদদের আধুনিক প্রকরণ ও পদ্ধতি নয়, অন্যান্য শ্রুতিকাহিনী গাথা এমনকি ধর্মগ্রন্থ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

কোরান-এ সুরা হুদ-এ আছে বাদশাহ শাদ্দাদের, যিনি ধনসম্পদ ও ক্ষমতার জোরে নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে ভাবতে শুরু করেছিলেন, তাঁর সময়কালে হজরত হুদ নবী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে-সময় আরবের কথিত অঞ্চলের মানুষ ছিলেন আদ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। হজরত হুদও ছিলেন এই সম্প্রদায়েরই মানুষ। এই সম্প্রদায় পরিচিত ছিল সাহসী এবং দুর্দান্ত হিসেবে। এই সম্প্রদায়ের যে-চারজন প্রধান পূজ্য 'ঈশ্বর' ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন নারী অর্থাৎ দেবী। বিভিন্ন সূত্রে তাঁদের নামও পাওয়া যায়। এঁরা হলেন—সকিয়া (বৃষ্টিদায়িনী), হাফিজা (বিপদনাশিনী), রাজিকা (জীবিকা প্রদায়িনী) ও সালিমা (রোগনাশিনী)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতে এই চিত্র আরও ব্যাপকভাবে দেখা যায়। বর্তমানের মধ্যেও এই অতীত ভালোভাবেই দেখা যায়। শনাক্ত করা যায় এই পর্বের অবসানের লক্ষণও।

৯

ছোটবেলায় যেসব অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলাম তার সব যে শাস্ত্রসম্মত ছিল তা নয়। কিন্তু সেসবও ছিল ধর্মবিশ্বাস ও চর্চারই অন্তর্ভুক্ত। ধর্মবিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতায় অনেক বিশ্বাসই জীবন্ত আকারে হাজির হয়। শুধু স্বপ্ন নয়, জাগরণেও তার সাক্ষাৎ হতে পারে এমন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা ঐ বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে ঘটে না, ঘটতে পারে না। অনেক চরিত্র তখন জীবনের চারপাশেই ঘুরতে থাকে কিংবা জীবনের অনেক সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করতে পারে। এই অভিজ্ঞতা সকল পর্যায়ের ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু অভিজ্ঞতার ধরন সময় কাল বয়স সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বদলে যেতে পারে। আর এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ধরনও তার বিশ্বাসের ধরন-পরিবর্তনের সাথে পালটে যেতে পারে। ধর্ম পরিবর্তনে আবার নতুন নতুন অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে দেখা হয়।

অর্থাৎ হিন্দু থাকাকালে যার দেখা হয়েছে, নিদ্রায় বা জাগরণে বা ধ্যানে, মা দেবী দুর্গা বা কালীর সঙ্গে, মুসলমান হয়ে গেলে হয়তো তার সঙ্গে সেসব কোনো দেবীর সঙ্গে দেখা হয় না, দেখা হওয়া শুরু হয় বিভিন্ন পীর বা বুজুর্গের সঙ্গে। আবার এমনও হয় যে একই ব্যক্তি পাশাপাশি কালী ও আলিকে স্মরণ করছেন। দেবী ও বুজুর্গ নিয়ে একই সঙ্গে সাধনা করছেন। মা মনসাকে ভক্তি দিয়ে কোন পীরের মুরিদ বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজছেন এরকম অনেক মানুষ এই অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা শুনতাম এরকম। রূপকথার গল্প, ধর্মের নানা অতিপ্রাকৃত চরিত্র এবং নানা লোকগাথা তখন একাকার হয়ে আছে মনের মধ্যে। এরকম মানুষ সম্পর্কে ধারণা এটাই প্রতিষ্ঠিত দেখেছি যে, এ-ধরনের লোক সাধারণ নন। তাঁরা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এরকম লোককে বেশ ভয় এবং ভক্তি নিয়েই দেখেছি। এঁদের থেকে দূরে থাকতেই চেষ্টা করেছি সবসময়। এরকম অনেকে মানুষকে প্রাণী বানিয়ে ফেলতে পারেন সে-আশঙ্কাও মনের ভেতর ছিল।

আমার নিজের এমন কোনো অশরীরী শক্তির সাথে দেখা হয়নি। তবে দেখা হয়েছে এরকম অনুভূতি পেয়েছি। নবী মুহাম্মদকে স্বপ্নে দেখলাম এরকম অনুভূতি আমি পেয়েছি, দেখেছি আরও সুফি-সাধক ওলি আল্লাহকে। শ্বেতশুভ্র পোষাকে পবিত্র উপস্থিতি তাদের। মানসিক আরাম পেয়েছি। কী কী করলে কিংবা কোন কোন ধরনের জায়গায় ফেরেশতা দেখতে পাওয়া যাবে সে-সম্পর্কে অনেক কিছু ততদিনে শুনেছি। কয়েকটি পরস্পরবিরোধী সত্তা তখন চিন্তাজগতে প্রবলভাবে উপস্থিত, বেহেশত-দোজখ, ছোয়াব-গুনাহ্, ফেরেশতা-শয়তান, ইহকাল-পরকাল নানাভাবে আলোড়িত করে ভাবনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন, অনুভূতি। কখনো কোথাও অনুভব করি ফেরেশতার অস্তিত্ব কখনো করি শয়তানের।

ফেরেশতা শয়তান ছাড়াও আর যে-দুটি শক্তিকে প্রবল প্রতাপে মানুষের উপর শাসন চালাতে দেখেছি তারা হল ভূত এবং জিন। তাদের আধিপত্য দেখেছি জাগরণে নিদ্রায়, ঘরে-বাইরে, কাজে-অকাজে সর্বত্র। কালী ও আলির মতো ভূত এবং জিন তখন চিন্তাজগতে একই সঙ্গে অবস্থান করত। কিন্তু এটা শুধু আমার ব্যাপার ছিল না। এটা কমবেশি আশেপাশের প্রায় সকলেরই বিশ্বাসের অংশ ছিল। শাস্ত্রীয় মতে ভূত এবং জিনকে একইভাবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। কারণ এই দুটো ধারণা এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা-কাঠামো থেকে তারা উদ্ভূত। ভূত (পুরুষ) এবং পেতনি (নারী) হল এই অঞ্চলের মৃত্যু-পরবর্তী শাস্তিপ্রাপ্ত কিংবা অশান্ত জীবনের ধারণার অংশ। হিন্দু বলে ব্যাপক অর্থে যাদের ধরা হয় তাদের মধ্যে এগুলোর অস্তিত্ব প্রবল। আসলে এসব ধারণা এই অঞ্চলেরই বহু পুরনো ধারণা। কাজেই ইসলাম ধর্মান্তরণ অনেক পুরনো ধ্যানধারণা চর্চা বাতিল করেছে, সবকিছু পারেনি। তাই ভূত-পেতনি শাস্ত্রসম্মত না হলেও মুসলিম-সমাজে বেশ শক্তি নিয়েই তারা বিরাজমান ছিল, আছে। এখন হয়তো কমেছে তবে তা কতটা ধর্মচিন্তার 'শুদ্ধ' প্রসার থেকে আর কতটা বিদ্যুৎ-আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের কারণে তা বলা হয়তো কঠিন।

জেনেছি এভাবেই যে, কোনো মানুষের যদি মৃত্যু স্বাভাবিক না হয়, যদি মৃত্যু-পরবর্তী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঠিকমতো সম্পন্ন না হয় কিংবা যদি সে কোনো কারণে অভিশপ্ত হয়, কিংবা যদি অতৃপ্তি বা অশান্তি নিয়ে মৃত্যু ঘটে তো হলে মৃত্যুর পর তার পরিণতি পুরুষ হলে ভূত এবং নারী হলে পেতনি। ভূত বা পেতনি হিসেবে তখন সে মানুষকে নানাভাবে জ্বালাতন করতে থাকে যতদিন না তার মুক্তি ঘটে। এর মধ্যে ভালো ভূত বা পেতনি আর খারাপ ভূত বা পেতনির কথাও শুনেছি। এদের থাকা বা খাওয়ার জায়গাও মোটামুটি নির্ধারিত শুনেছি। শ্যাওড়া গাছ তেঁতুল গাছ বাঁশবাগান এদের থাকবার জন্য একটা প্রায় স্থায়ী জায়গা ছিল, এ ছাড়া ছিল ঝোপঝাড়। খালবিল বা নির্জন বিভিন্ন এলাকাও অনেক সময় নির্দেশিত হত তাদের জায়গা হিসেবে। দূর থেকে চলমান আলো দেখিয়ে অনেকে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত করতেন। প্রমাণ হিসেবে হাজির করতেন আলো বা ছায়া। এদের খাওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না। আমরাও সে-ব্যাপারে খুব কৌতূহলী ছিলাম না, ভূত পেতনির খাওয়া প্রয়োজন হয় এটা কখনো খুব গুরুত্বের সঙ্গে মনে হয়নি।

গ্রামে গিয়ে বেশি সমস্যা মনে হত রাতের বেলা। তখন ভূত-পেতনির কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। ঘরের বাইরে যেকোন অন্ধকার কোণায় তাদের দেখা যেতে পারত। সেজন্য গ্রামে গেলে রাতে আমাদের পক্ষে বাইরে বের হওয়া একটু কঠিন ছিল। এরকম অনেকের কাছে শুনেছি যে বড় বড় দুই বৃক্ষের উপর দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে-থাকা ভূত দেখা গেছে। যে দেখেছে তাকে কখনো পাইনি, কিন্তু এরকম ঘটনা দেখার কথা শুনেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম মানুষ অনেক পেয়েছি। ছোটদের মধ্যে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা আবার বেশি ছিল। ছোটদের সামনে বড়দের গল্পে এসবই আসত বেশি। ভূত-পেতনির কথা বলার ভঙ্গি কেউ শোনাতে গেলেই তাতে নাকিসুর চলে আসত। ভূত-পেতনির কথা কেন নাকি হয় তা নিয়ে প্রশ্নও কম ছিল না। কেউ-কেউ বলেছেন যেহেতু মৃত্যু পরবর্তী পর্ব এটা সেহেতু এই পর্বে শরীর আগের মতো কাজ করে না, কথা বললে নাকে চলে যায়। আকারও নির্দিষ্ট থাকার উপায় ছিল না তাদের। সেজন্য দৈত্যাকার উপস্থিতির কথা যেমন শুনতাম তেমনই শুনতাম মানুষের আকৃতিতে তাদের চলাফেরার কথা। অনেকে বলত কুকুর বিড়াল ইত্যাদি চারিদিকে যা-কিছু আছে সবকিছুই আসলে অশরীরী কোনো-কিছুর সাকার রূপ। এসব কথা অবশ্য মানুষ বিশেষ গ্রহণ করত না, আমরাও না, বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেছি এসব ঠিক নয়। কারণ তা না হলে কুকুর বিড়াল নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনই বিপর্যস্ত হয়। তবুও বিশেষত রাতে হঠাৎ অন্ধকারে কুকুর বা বিড়ালের বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো কিংবা তাকানো আর চোখের ঝিলিক দেখে পর্যুদস্ত অবস্থা হত। গোয়ালঘরে নানা ঘটনা ঘটার কথা তখন শুনেছি। পুকুরে, খালবিলে, গাছের অন্ধকারে তো ঘটছে বটেই। গ্রামের মানুষকে দেখেছি এসবে প্রবল বিশ্বাস করতে এবং প্রতিবিধানের জন্য নানা ব্যবস্থা করতে কিন্তু ভয় পেতে দেখিনি। সবাই ধরেই নিয়েছিলেন এদের সঙ্গে বসবাসই স্বাভাবিক এবং নিয়তি।

রাতের বেলা গ্রামের বাড়ির উঠানে বা রাস্তা দিয়ে সাদা শাড়িতে ঢাকা নারীমূর্তি যেতে অনেকেই দেখেছে বলে শুনেছি। এরা যে আশেপাশের বাড়ির কোনো বাস্তব নারী নয় সে ব্যাপারে সবাই সাধারণত নিশ্চিত হত এটা দেখে যে ঐ মূর্তি মাটি থেকে প্রায় এক ফুট উপর দিয়ে হেঁটে গেছে। আবার এই বিতর্কও ছিল যে এভাবে সাদা শাড়ি পরে, মাথা চুল ঢেকে যেসব নারীমূর্তি যায় তারা পেতনি নয়, পরী। পেতনিরা চুল খুলে যায়, চুল থাকে পা পর্যন্ত। গায়ের রং কালো। তবে হাঁটার ভঙ্গি প্রায় একইরকম। নিরাপদ দূরত্বে থেকে আমার দেখার আগ্রহ ছিল এদের কিন্তু তা কখনো পূরণ হয়নি। পেতনি আর পরীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিন্দু মুসলিম চরিত্রও একভাবে তৈরি করে। আর ভূত-পেতনি মুসলিম শাস্ত্রে না থাকলেও এই সমাজকেও একইরকমভাবে উপদ্রব করত। তবে তাদের মোকাবিলা করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ছিল। যেমন কোনো মুসলমান বিপদে পড়েছে মনে করলে কলেমা তৈয়ব বা অন্য কোনো দোয়া পড়লে চলে যেত ভূত বা পেতনি, আর কোনো হিন্দুর জন্য একই ফলাফল হত নির্দিষ্ট মন্ত্রপাঠ করলে। আগুন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ এক উপকরণ যা দেখলে হিন্দু মুসলমান যে-কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি দূরে সরে যাবে। এ-ব্যাপারে সবাই স্থিরনিশ্চিত ছিল।

অমাবস্যার রাত বরাবরই ভূত আর পেতনির জন্য উন্মুক্ত রাত। এই রাতে তাদের অবাধ গতিবিধি। নির্দিষ্ট যেসব জায়গায় তাদের থাকবার কথা সেসব জায়গা থেকে তারা সবাই এই রাতে দলে-দলে লোকালয়ে বেরিয়ে আসে এই ছিল ধারণা। মানুষ সবাই তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পায় না। কেউ-কেউ দ্যাখে। কিন্তু সব মানুষই জানে ভূত-পেতনির প্রধান মনোযোগ হল গর্ভস্থ সন্তান। কোনো গর্ভবতী নারী যদি অমাবস্যার রাতে বের হয় তা হলে অবশ্যই ভূত-পেতনি তার পিছু নেবে এবং একপর্যায়ে পেটের বাচ্চাকে নিয়ে নেবে। মা হয়তো টেরও পাবে না। প্রসবের সময় যে-বাচ্চা হবে তা হবে মৃত। গ্রামে মৃত বাচ্চা প্রসব, গর্ভপাত, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের সঙ্গে যে ভূত-পেতনির ভূমিকার সম্পর্ক আছে তা সবাই জানত, বিশ্বাস করত। এই জানা ও বিশ্বাসের কারণে এ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানা ঝাড়ফুঁক, তাবিজ, পানিপড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। অনেক গ্রামেই এখন বিদ্যুৎ গেছে। কিন্তু অমাবস্যার রাতে পেটের বাচ্চার দিকে এগুলোর নজর এখনও অনেক গ্রামে আছে। তার ফলে, সেদিনও শুনলাম এক আত্মীয়ার কাছে, গ্রামে এই ভূত-পেতনির নজরের কারণেই অনেকেরই বাচ্চা মরে যাচ্ছে, অনেক সময় মা নিজেও আক্রান্ত হচ্ছে।

জিন-পরীর বিষয়টি যেভাবে শুনেছি তাতে ভূত-পেতনির তুলনায় তাদের অবস্থান একটু সচ্ছল ও সংগঠিত মনে হয়েছে। মনে হত এদের আভিজাত্য তুলনামূলকভাবে বেশি। ক্ষমতাও। গাছ পালা বনে জঙ্গলে বা খালবিলে জিন-পরীর থাকার কথা কখনোই শোনা যায়নি। আমরা বরাবর জেনে এসেছি জিন যে-কোন সময় যে-কোনো জায়গায় উপস্থিত হতে পারে। জিনের মধ্যে দুই ধরনের জিনের কথা শুনেছি—ভালো জিন এবং খারাপ জিন। ভালো জিন মসজিদ-মাজারসহ সকল ধর্মীয় জায়গায় থাকতে পারে, এবাদত বন্দেগির মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারে, বুজর্গ বা কামেল মানুষের সাথে থাকতে পারে। বহুবার এই কথা শুনেছি যে, হাফেজ্জী হুজুর যখন একা একা থাকেন তখন তাঁর সঙ্গে বহুসংখ্যক জিন থাকে। প্রমাণ কী? প্রমাণ তিনি যখন দোওয়া করেন তখন বহুকণ্ঠে আমিন শোনা যায়। তা ছাড়া মসজিদ যখন খালি থাকে তখনও ভেতরে অনেক চলাফেরার আওয়াজ শোনা যায়। জিন ও ফেরেশতা এই দুই চরিত্র প্রায় সমার্থক অর্থেই আমাদের কাছে পরিবেশিত হত সবসময়।

গ্রামে বা লোকসমাজে জিনের ভূমিকার মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বা প্রীতির কথা শোনা না গেলেও শহরে বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা শোনা গিয়েছিল ১৯৬৫ সালে। তখন আমি ক্লাস ফোর-এ পড়ি, সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ—পূর্ব পাকিস্তান। সেই বছরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছিল। ভারত মানে হিন্দু আর পাকিস্তান মানে মুসলমান এভাবেই আমরা জেনে এসেছি বরাবর। সুতরাং এই যুদ্ধকেও আমরা দেখেছি হিন্দু আর মুসলমানের লড়াই হিসেবেই। যেভাবে শুনে এসেছি তাতে মুসলমানের পরাজয় আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আর এই পাটীগণিতও ততদিনে জেনেছি যে, একজন সাচ্চা মুসলমান দশজন কাফের বা হিন্দুকে পরাজিত করতে বা বধ করতে সক্ষম। কারণ মুসলমানরা গোরু খায় আর আল্লাহর রহমত তো আছেই। হিন্দুরা গোরু পূজা করে, তাদের আর কীইবা শক্তি থাকবে! পাকিস্তানের বিজয়ের ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হলাম যখন জানলাম পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন সৈনিকপিছু ঘোড়ায় দশজন ফেরেশতা অদৃশ্যভাবে লড়াই করছে। যুদ্ধশেষে জানলাম পাকিস্তান বিরাট বিজয় লাভ করেছে আর যুদ্ধের কয়েকদিনের পরেই লালবাহাদুর শাস্ত্রী আইয়ুব খানের ধমক শুনে হার্টফেল করেছেন। বহুবছর লেগেছে এই তথ্য জানতে যে, সেই যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরাট বিপর্যয় হয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রাখায় এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অবিশ্বাস ও দূরত্ব অনেক বেড়েছিল।

১০

কেউ কোনো ভালো কাজ করলে কিংবা কাউকে কোনো কারণে পছন্দ করলে ভালো জিন তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে, এমনকি মিষ্টির বাক্সে করে অনেক টাকা দিয়ে যাবার কথাও শুনেছি। রূপকথার গল্পের মতো আরও অনেককিছু করার ক্ষমতা আস্তে আস্তে হয়তো ততদিনে কমে এসেছিল। আর খারাপ জিন যে-কোনো বিপদে ফেলতে পারে এমনকি গলা টিপে ধরতে পারে কাউকে অপছন্দ করবার কোনো কারণ ঘটলে। বিশেষত গাছের নিচে বা জলাভূমিতে বা পথে কেউ আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলে এটা নিশ্চিত ধরেই নেয়া হত যে, এটা জিন মতান্তরে ভূতের কাজ। জিনদের নারীচরিত্র বা নারীরূপ হল পরী। খুব নির্দিষ্ট বিষয়েই কেবল আলাদা করে পেতনি বা পরীর কথা উল্লিখিত হত। পেতনি শব্দটিই বা তার বর্ণিত চেহারাটি মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। ভাবটিও খুবই দরিদ্র। তা ছাড়া পেতনির মারপিট এমনকি গলা টিপে ধরার কথাও শোনা যেত। কাজেই পেতনির ব্যাপারে আগ্রহের চাইতে ভীতিই বেশি ছিল কিশোর তরুণদের মধ্যে।

পরীর বিষয়টি ভিন্নরকম। পরীর যে-চিত্র আমাদের সামনে ছিল সে-অনুযায়ী সে সুন্দরী এবং প্রেমময়ী এক তরুণী আর তার বাস আকাশের কোনো এক সুন্দর রাজ্যে। সুতরাং এই পরীর অজানা রহস্য কিছুটা শঙ্কা তৈরি করলেও তার প্রতি আকর্ষণও কম ছিল না। ছেলেদের যখন পরী নিয়ে যাবার কথা বলা হত তখন তাতে তেমন কোনো আপত্তি দেখা যেত না। কোনো কোনো ঘটনা শুনতাম দূর কোনো জায়গার বরাত দিয়ে। প্রায়ই শুনতাম কোনো ছেলেকে পরী নিয়ে গিয়েছিল, অবার কিছুদিন পরে ফেরতও দিয়ে গেছে। এরকম কোনো ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কিন্তু অবিশ্বাস করবারও কোনো কারণ পেতাম না। কেননা এই গল্প আমাদের শোনা, তা ছাড়া অন্য আরও অনেক গল্পের কল্পনা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এসব বিশ্বাস বা সম্ভাবনা নিয়ে আনন্দ বা উত্তেজনায় বেশি সময় কাটানোর সুযোগ আমার ছিল না। কেননা গ্রামে থাকতাম বছরের মধ্যে মাত্র কিছুদিন, বাকি সময়টা শহরে। শহর আবার এসব ক্ষেত্রে বরাবরই বেশ নীরস। এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ থাকলে, তা ছাড়া যদি গাছপালা বনজঙ্গল না থাকে তা হলে ভূত-পেতনি কোথায় থাকবে? জিন-পরীর জন্য আসা-যাওয়া বা বিচরণও তাতে কঠিন হয়ে পড়ে। তার ফলে শহরে দুএকটি ঘটনা শোনা গেলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জীবন-যাপন কথাবার্তাকে এরা সেভাবে তেমন প্রভাবিত করেনি। কিন্তু তার পরও গ্রামের নানা ঘটনা শহর পর্যন্ত তাড়া করত। ভয়ও।

ছোটবেলায় ফুফুবাড়ির একটি ঘটনা। একটা গরিব কৃষক পরিবার। তাতে স্বামী স্ত্রী ও তিন সন্তান। হঠাৎ করে দেখা গেল তাদের অবস্থা ভালো হওয়া শুরু করেছে। গ্রামে সবারই বিশ্বাস ঐ লোকের কাছে এক পরী আছে, সেই এই উন্নতির পথ বাতলাচ্ছে। সমস্যা হল তার স্ত্রীকে নিয়ে। পরী তাকে যেভাবে থাকতে বলত সেভাবে সে থাকত না। এর ফলে পরী একসময়ে খুবই গোস্বা হয়ে ওঠে। একদিন গভীর রাতে যখন লোকটি বিলে গেছে মাছ ধরতে তখন তাকে ঐ পরী একটা গর্ত করে তাকে বেশ শায়েস্তা করে। পরে সবাই গিয়ে ঐ লোককে একটা গর্তের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পায়। পরীর কারণেই, শুনেছি, কোনোভাবেই তাকে আর সুস্থ করা যায়নি। একপর্যায়ে পরীর হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য এক ফকির-দরবেশ আনা হয়। সে পরীকে তাড়ানোর জন্য নানা কাণ্ড করেও ব্যর্থ হয় এবং একপর্যায়ে শিক গরম করে তার কানে ঢোকানো হয়। বলা হয় এই শিক পরীকেই আহত করবে, লোককে নয়। কিন্তু একপর্যায়ে ঐ লোক মারা যায়। পরীর অভিশাপ তাতে দূর হয়নি। এরপর তাদের অবস্থার অবনতি শুরু হয় এবং তাদের ছেলেও মারা যায়।

মেয়েদের উপর জিনের আছরের কথা সবাই জানে, জানে। জানতাম, সাধারণত তরুণীদের, বিবাহিত এবং অবিবাহিত, উপরই জিনের বিশেষত বদজিনের নজর পড়ে বেশি। সাধারণত সন্ধ্যায় খোলা চুলে থাকলে কিংবা নির্জন কোনো স্থানে একা একা গেলে জিনের আক্রমণ হয়। আক্রমণ হবার পর থেকেই আক্রান্ত মেয়ের চলাফেরা আর ভাবগতিক পালটে যায়। সাধারণত যা ঘটে তা হল যাদের তার মান্য করবার কথা, স্বামী বা মুরুব্বি, তাদের অমান্য করবার প্রবণতা যেন সব আড়াল সরিয়ে সামনে আসে। মেয়েদের জন্য যেসব কাজ পরিবারে বা সমাজে অনুমোদিত নয় সেসব কাজই সে তখন করতে থাকে। যেমন জোরে জোরে কথা বলা, জোরে জোরে হাসা, জোরে জোরে হাঁটাচলা, মাথায় কাপড় না রাখা ইত্যাদি। এই জিন তাড়ানোর অনেক পথ আছে, প্রয়োগও দেখেছি অনেক। নানাধরনের শাস্তি সব। জিনকে শাস্তি দিতে গিয়ে মেয়েদের মৃত্যুবরণ মানুষকে খুব অস্বাভাবিকভাবে নিতে দেখিনি। জিন যদি খুব বেশি বেয়াড়া হয় তা হলে আর কী করা যাবে? ... [চলবে]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র হ মা ন হে ন রী

অগ্নিকাণ্ড

উত্তপ্ত টিনের চালে নেচে যাচ্ছো বন্দি-বিড়াল ...
নিচে মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার—
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে মলিন কাপড়, সামান্য তৈজসপত্র
পুড়ে যাচ্ছে দশ-বাই-ষোলো হাত স্বপ্নের সংসার
এক আশ্রয়ণ থেকে নিরাশ্রয়ে ডুবে যেতে
মানুষের কতটুকু অবকাশ লাগে?

এ সামান্য অগ্নিকাণ্ড, ক্ষুদ্র ঘটনা, জন্ম নিলো
ক্ষুধার ছলনা থেকে—উনুনের অগ্নি-অজুহাতে—
তবু এই বন্দি-বিড়াল কিন্তু জীবনানন্দে নেই;
এ রকম নৃত্যরত মৃত্যুর কাহিনী। নতুন শতাব্দী
এর জন্মদাতা গরীয়ান পিতা, এই বন্দি-বিড়ালের
নিহত হবার গল্প সিভিল সমাজে আমি কীভাবে জানাবো?
নন্দনতত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা দরকার—অতএব
সে দিকে যাবো না; বিচারের কাছে গেলে
ভিক্‌টিমের কন্‌ফেশন চাই—সে দিকেও
না-যাওয়া সঙ্গত; ফলে তো
উত্তপ্ত চালে বিড়ালের নৃত্যমৃত্যু নিবৃত্ত হবে না!

আহা রে বিড়াল! এশিয়ার দুঃখের মতো
ক্ষুধা-মৃত্যু-অশিক্ষার স্বর্ণশেকলে বাঁধা বন্দি-বিড়াল,
মৃত্যুর সুন্দর রূপ—প'ড়ে আছো নগ্ন চাতালে ...
এ হেন মৃত্যুর কোনও সুরাহা হবে না

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজন্ম

অনিবার্য দুর্ঘটনার স্মৃতি ঠেলে সে আসে, হামাগুড়ি দেয়,
হেঁটে বেড়ায়। কেউ-না-কেউ তাকে কাঁধে বসায়, সে ছুঁতে চায়
ঘুরে-চলা ফ্যানের ব্লেড। কুস্তি দ্যাখে। বহুজাতিক দুধ খেয়ে
টিনের লাল গাভীটিকে ভালোবেসে ফ্যালে। তার সমস্ত পুষ্টি মোটাসোটা
মহিলার উলের বল হয়ে মেঝেতে গড়ায় আর ঠোক্কর খেতে থাকে বিকেলের
নিরীহ দেয়ালে। ... সবকিছু পণ্ড করে-দেওয়া এ্যানিমেটেড ইঁদুরের
ছোটাছুটি দেখতে দেখতে সে বেড়ে ওঠে। ... একদিন তার তৃতীয় পা
পিন-আপ কাহিনীতে এসে পড়ে, তারপর একে একে দুর্ঘটনা ঘটে চলে,
পরিকল্পিত গোপন হত্যাকাণ্ডের ফাঁকে একটা গান শরীর থেকে
উষ্ণতার রঙ নিয়ে নামে, হামাগুড়ি দেয়, হাঁটে, কারো কাঁধে চড়ে ছুঁতে চায়
ফ্যানের ব্লেড; বহুজাতিক দুধ খেতে খেতে কুস্তি দ্যাখে ...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরঙ্গগঞ্জন : হরিণের লজ্জা দেখার লোভ

বাঙলা কবিতা লিখি। লিখতে গিয়ে, হঠাৎ একটা শব্দ নিয়ে খটকা লাগে। হয়তো শব্দটির অর্থ কিছুটা আবছা মতোন, আর তখনই অভিধান খুলে বসি। অভিধানে সব শব্দের মানে লেখা আছে। যেমন, কুলঙ্গি। কুলঙ্গি মানে হচ্ছে—জিনিশপত্র রাখার জন্য দেয়ালের মধ্যস্থিত ছোট খোপ। নিশ্চয়ই কুলঙ্গি শব্দটি আপনি বুঝে নিয়েছেন? আমিও বুঝেছি। ছোটবেলার রাত্রিগুলোয় কুলঙ্গিতে ল্যাম্প জ্বলত দেখতাম।

কুলঙ্গি শব্দটার পরিষ্কার মানে কী—সেটা দেখবার জন্য যখন সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান খুললাম, খুঁজছি ক... কা... কু... কুলঙ্গি খুঁজে পাওয়ার অন্তত তেইশটি শব্দ আগে চোখে পড়ল অদ্ভুত এক শব্দ, শব্দটি কুরঙ্গগঞ্জন। ভাবলাম, কুরঙ্গগঞ্জন মানে কী? দেখি, কুরঙ্গ মানে হরিণ; মৃগ। কিন্তু কুরঙ্গগঞ্জন? কুরঙ্গগঞ্জন মানে—হরিণকে লজ্জা দেয় এমন; হরিণ থেকে উৎকৃষ্ট। কবিতার প্রতিবেশী, আপনি তাহলে কুরঙ্গগঞ্জন শব্দের মানে বুঝেছেন? না, আমি ঠিক বুঝিনি। কারণ হরিণকে লজ্জা দেয় এমন কোন প্রাণী আছে—উদাহরণ হিসেবে সেটা অভিধানে নেই। কোথায় কে আছে যে, তাকে দেখে হরিণ লজ্জা পেয়ে যাবে? তাছাড়া হরিণের কী নেই যা তার মধ্যে আছে? এদিকে, হরিণ সুন্দরবনে থাকে, হরিণ থেকে উৎকৃষ্ট সে থাকে কোথায়? সমুদ্রে, পাহাড়ে, নাকি ঢাকার কোনো ব্লক-আবাসিক এরিয়ায়?

কুরঙ্গগঞ্জন-এর আভিধানিক অর্থ জানার পরও, মাথায় নানাপ্রশ্ন আসে। প্রশ্নে প্রশ্নে প্রেম ঘন হয়। ভাবি, যদি কোনো ভেরিগুড ম্যুড ছুটে আসে একদিন লেখার সময়, সে লেখায় হঠাৎ করেই বসিয়ে দেব কুরঙ্গগঞ্জন শব্দটি, হয়তো হরিণের লজ্জা দেখার লোভে, নয়তো হরিণ থেকে উৎকৃষ্ট কাউকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তু ষা র গা য়ে ন

প্রকৃতির সন্নিহিত কোণে

দেহকে বিযুক্ত ক'রে মাটি থেকে বহুতল শূন্যতায়
অনেক দিনের বসবাস : ধুলোর নিশ্বাস যত যন্ত্রাবগাহন
'যন্ত্রের একাংশ হওয়া বুঝি দূর পরিণাম' ভেবে
হাঁসফাঁস ক'রে মন হাঁফ ছেড়ে দূরে যেতে চায়

যতটা গতির ঘোর যন্ত্রের চাকায়, তারো আগে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' বলে
শহর ছাড়িয়ে যায় মাটি, ভাবে পালাবে কোথায়
যেতে যেতে ধরা পড়ে মানুষের হাতে হামেশাই
আর চুল্লির আগুনে পুড়ে ইট হ'য়ে যায় :
উঁচু উঁচু চিমনির ধোঁয়া আকাশে জানান দেয় মৃত্যুর সংবাদ
তবুও জীবন মৃত্তিকার, নাভিকুণ্ডে শত পাক
কোথাও নদীর তীরে ধীরে ধীরে খোলে তার ভাঁজ
কলকল বহতা বাতাস, দিগন্ত মুড়িয়ে নেয় তাকে
শত পুত্র সন্তানের সাধ ভ'রে দিতে বীজ হাতে আসে
কালো কালো চাষিদের দল... সবুজ সম্প্রসারিত হ'তে থাকে
ডাকে আমনের দেশ—আহ্ মন, আমন রুয়েছ কত মন
টানা মাটিতে আবার, কতদূর নিয়ে যাবে টেনে টেনে এই পা আমার
যন্ত্রকে বিযুক্ত ক'রে চরণসাধনে যান... পায়ের নিচে গুঞ্জরিত খড়,
আখের ছোবড়া রোদে রাখা মাড়াইয়ের শেষে, নাকে লাগে এসে গুড়ের সুঘ্রাণ—
ফটফট উনুনে জ্বলছে খড়ি, শীতের শুরুতে শিশির উন্মুখ ঝকমারি তরকারি
জানে বটে বিজ্ঞ বট : মাটি থেকে উঠে শালপ্রাংশু দেহে
কীভাবে ঝুরিকে ফের নামাবে সে শূন্য থেকে মাটির ভেতরে...
নিশ্বাসে উগরে দিলে কালোধোঁয়া, ঝিলমিল পাতা তার শুষে নেয় হেসে
আসন্ন উৎসব : উপচানো শেকড়ের পাশে তার দু'টো রঙ করা ঘট

সকল গতির ঘোর নদীর কিনারে এসে থামে
কানের দু'পাশে ডাকে মর্মর বাতাস
ক্ষীণ আওয়াজ সব জড় ও প্রাণের উৎস থেকে
পলির প্রগাঢ় পাড় ভাঁজে ভাঁজে নেমে গেছে জলে
সহসা কী হ'ল—কলকল শব্দ তুলে জলকন্যা টেনে নিল
নিমেষেই দেহভার হারালো কোথায়—ভুরভুর শব্দ তুলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবি খেতে হয়, দেখা যায় : পিঠে তার মৃদুস্রোত, ঘনটান অতল জঙ্ঘায়
আবেশে মথিত ক'রে ক'রে প্রদাহ স্খলিত ক'রে দেয়
আহ্ শান্তি! সব অবসাদ গেল জলে
জাগে নবজন্ম নবরূপে প্রকৃতির সন্নিহিত কোণে... ...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জা হা না রা পা র ভী ন

বেহুলা কথন

আমাদের বেহুলারা নিঃসন্দেহে পতিভক্ত।
একরাতবয়সী স্বামীর লাশ নিয়ে
নেমে যায় জলে

কলাবৃক্ষ দিয়ে বানানো নাও। সেই নায়ে
চড়ে বৈধব্য সারানোর অব্যর্থ ভ্রমণ

পরবর্তী চিত্রনাট্য আমাদের সবার পড়া।

এবার লাশ বদল করে দেয়া যাক
মনে করি অন্ধ সাপ ভুল করে কেটে গেছে
বেহুলার পা।

ফলাফল :
বেহুলার লাশ ফেলে চলে যায় লখিন্দর
অন্য কোথায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম জ নু শা হ্

লীলাচূর্ণ

যাও মেঘ, ভূ-মণ্ডল বনস্পতির নিকটে যাও;
তারে গিয়ে বলো, মরণের পরে থাকে শুধু গান।
শরীর মন্থনে আছে সুখ, তবু এক দুঃখী-জ্ঞানী
তরমুজ-মদ আর নভোছক পাশাপাশি রেখে
সুখ খোঁজে তাতে। যাও মেঘ, তুমি তো অমন নও,
পাড় হও বাঘিনীর আরতি, লবণ পাহাড়।
পৃথিবীতে পড়ে থাক চন্দন ঘষার গোল পিঁড়ি,
হেরম্ব বধূটি পড়ে থাক। মাধবী টিলায় বসে
কোনো কোনো রাতে দেখি বাদামি গম্ভীর চন্দ্রোদয়।
জন্মাবধি আমি নীল কমলের কনিষ্ঠ প্রেমিক—
এই দ্যাখো মাটির তিলক, সময়ের ঝুঁটি ধরে
ঝুলে আছি, নিচে থরে থরে ফুটে আছে পদ্মশিখা।
এত কিছুর পরও, মেঘ, গোপনে আমারে দিলে
কটাক্ষ মধুর ভাণ্ড, খৃস্টরুটি, পানি, বারে বারে—

২

একটি শাদা বালিশ ভাগাভাগি করে শুয়ে থাকি
আমি ও আমার মৃত্যু। আমাদের পাথরের ঘর
রক্তাভ ঝর্নার শব্দে ডুবে যেতে থাকে সারারাত।
আকাশমণির ছায়া ঘরের বাইরে জেগে জেগে
নক্ষত্রের অভিশাপ থেকে আমাদের রক্ষা করে।
সারাদিন হাঁটি আমি ভিক্ষুকের পদচিহ্ন ধরে,
সারাক্ষণ পিছু ডাকি, 'বনমালি, ওগো বনমালি...'
যেতে যেতে দেখি পণ্ড হয় কত নটবর সভা—
কত অবগাহনের, চিরপদার্থের স্বপ্নে কাটে
আমার সমস্ত দিন। যাবত্ত গ্রামের কালাচাঁদ
বলেছে আমায় : নিরঞ্জন, বড় দেরি হয়ে গেল;
এক অবনত-মাথা ল্যাম্পপোস্ট এই শাদা কথা
সমর্থন করে যায়। যদি আমি ও আমার মৃত্যু
ঘুম শেষে উঠি, নষ্ট চোখ পড়ে থাকে বিছানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জা কি র তা লু ক দা র

আপনগোত্রের মানুষ

এ কদিকে পেঁয়াজ-মটরশুঁটির ক্ষেত, অন্য তিন পাশে মেটেরঙা ন্যাড়া জমির মাঝখানে চুপচাপ কুয়াশায় ভিজছিল দালানটা। মানুষসমান উঁচু কয়েকটা খয়ের গাছ, বাবলা কাঁটা, বেড়ার ধারের লিকলিকে অড়হরের পাতার ফাঁকে সকালের পাখি নয়, জমে আছে থোকা থোকা কুয়াশা। মোটামুটি দেড় বর্গমাইল বিস্তারের মধ্যে এই একটাই দালান—এখানকার লোকের কাছে হাসপাতাল। পোশাকি নামি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আরো পোশাকি নাম হচ্ছে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল উপকেন্দ্র।

দক্ষিণমুখো দালানের সামনে তিরিশ-বত্রিশ ধাপের মাঠ। তারপর কিছুটা ইট বিছানো, কিছুটা ইট উঠে যাওয়া পশ্চিমদিকে চলে যাওয়া রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে গুটিকয়েক ভোরের নামাজি নামাজ পড়ে ছোট মসজিদ থেকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেছে যে যার ঘরে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে বসে নামাজিদের সাদা পলিথিনের মতো কুয়াশাঢাকা মূর্তিগুলোকে মসজিদে যেতে এবং ফিরতে দেখেছে ছমারি ও গণেশ লাকড়া। ওরা বসে আছে হাসপাতালের বারান্দায়। কখন থেকে তা-ও ঠিক মনে নেই। কখন ওরা নিজেদের গ্রাম থেকে ছয়বছরের মেয়ে রীতাকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে সেটাও মনে নেই। এখানে এসে ওরা দেখেছে উত্তরবঙ্গের প্রবাদপ্রতিম প্রবল শীতের মধ্যে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা হাসপাতালের প্রাণহীন কাঠামোটিকে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। ভেতরে কেউ আছে কি না ওরা জানে না। থাকলেও ডাকার সাহস ওদের নেই। ডাকা যায় কি না তা-ও জানা নেই। ওরা নিঃশব্দে জবুথবু হয়ে বসে থাকে। রীতা তো মাঝে মাঝে ফোঁপায়। কিন্তু ছমারি আর গণেশের মুখে কোনো শব্দই নেই। এমনকি সন্তানের কষ্টে মমতা প্রকাশের জন্যও কোনো শব্দ তারা উচ্চারণ করেনি। ওরা অপেক্ষা করছে হাসপাতালের ঘুম ভাঙার।

ওদের পরনের কাপড়ের কথা বলতে বেশি সময় লাগে না। ছমারির পরনে ত্যানা ত্যানা শাড়ি। ব্লাউজ-পেটিকোট ওদের প্রায় কোনো সময়েই থাকে না। শাড়ির ওপর একটা কাঁথা জড়ানো। গণেশের পরনে লুঙ্গি, গায়ে জামা একটা আছে। তার উপর অমলবাবুর দেওয়া একটা পুরনো সোয়েটার। একটা কাঁথা জড়িয়ে আছে সে-ও। রীতার শরীরটা

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্বলে প্যাঁচানো। এবার শহরে শীত যখন সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল, তাপমাত্রা নেমেছিল চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে, পেপারে পত্রিকায় নিত্য শীতে মৃত্যুর খবর ছাপা হচ্ছিল, তখন দেশের রানী ওদের এলাকায় এসে নিজের হাতে কম্বল বিলিয়েছিলেন। সারাদিন মাঠের মধ্যে বসে থেকে, দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত একটানা বক্তৃতা শুনে গণেশ পেয়েছিল একখানা কম্বল। সেই কম্বল এখন প্যাঁচানো রীতার শরীরে। রীতার বোধহয় শীতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। রানীর কম্বল বলে কথা! কিন্তু ওকে মেঝেতে শোয়ালেই ঠাণ্ডা শানের সংস্পর্শে কঁকিয়ে উঠছে। ওরা তাই পালাক্রমে বুকে করে রাখছে রীতাকে।

আঁধার একটু একটু করে কাটছে কিন্তু শীত আরো বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি ছমারি ও গণেশের মতো মানুষ, যারা আমাদের চোখে প্রায় জন্তু-পর্যায়ের, তারা পর্যন্ত শীত আর সইতে পারছে না। উপায় কী? ওরা শুনেছে দালানের মধ্যে শীত ঢুকতে পারে না। কিন্তু ওরা ঢুকবে কী করে? কে খুলে দেবে দালানের দরজা?

এর আগে বারদুয়েক পকেট থেকে বিড়ি বের করেছে গণেশ। জ্বালানোর সাহস পায়নি। কে যেন তাকে বলে দিয়েছিল যে হাসপাতালে বিড়ি খাওয়া নিষেধ। কিন্তু আর যে পারা যায় না! গণেশ তার বুকের বোঝা অর্থাৎ রীতাকে তুলে দেয় ছমারির কোলে। তারপর বিড়ি ধরায়। ফুক ফুক করে টান দেয় ঘনঘন। কুয়াশার সাথে ধোঁয়া মিশে তার সামনে একটা পরদা সৃষ্টি হয় কিছুক্ষণের জন্য। সেই পরদার মধ্যে একটু কি উষ্ণতাও অনুভব করে গণেশ! ধোঁয়া ও পরদার ওপার থেকে তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে ছমারি। তার হাত বন্ধ। রীতাকে ধরে থাকতে হচ্ছে। গণেশ নিজেই ছমারির মুখে গুঁজে দিল বিড়িটা। কড়া টান লাগাল ছমারি। মুখ আর বুকভরতি ধোঁয়া টেনে মাথা ঝাঁকাল এপাশ-ওপাশ। বিড়ি সরিয়ে নিল গণেশ। এইভাবে বারতিনেক স্ত্রীকে ধূমপান করাল সে। শীতের কামড়ের মধ্যে ছমারিকে এই প্রথম একটু প্রাণবন্ত দেখাল।

বিড়ির গন্ধই ঘুম ভাঙাল ডাগদর মাইজির। দোতলার বন্ধ জানালায় ঝাপটা লাগাল জোর গন্ধ। আলসেমি-জড়ানো কণ্ঠে হাঁক শোনা যায়—হাসপাতালে বিড়ি টানে কিডারে? কুন ব্যাক্কল।

সাথে সাথে স্বল্পবুদ্ধির গণেশও এই সুযোগ ছাড়ে না। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় ডাকে—রুগি আছে মাইজি। বহুত বিমারি।

সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সদের কাছে সবচেয়ে অপছন্দের জিনিস হচ্ছে রোগী। ডাক্তারনির গলাতেও রাগ গোপন থাকে না—এই শীতের মদ্যিও রুগির আসা লাগবি! মরার আর জায়গা পালে না।

খুব করুণ কণ্ঠে আর্তি জানায় গণেশ—খুব কড়া বিমার মাইজি, আমার বিটিয়ার জান বাঁচান।

কথা শুনে ওপরের মানুষটা বুঝে যায় রোগী হচ্ছে আদিবাসী। তার গরজ আরো কমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। দায়সারা গোছে বলে—বসেক। বেলা উঠতি দে। এই শীতের মদ্যি আমি কেমন করে উঠি। বাপরে যা শীত!

হ্যাঁ মাইজি, খুব জার!

গণেশের এই কথাটা বোধহয় আঘাত করে ওপরের মহিলাটিকে। তা-ই তো! লেপের নিচে বন্ধ ঘরেই এত শীত, বাইরের বারান্দায় উদোম মানুষগুলো নিশ্চয়ই খুবই কষ্ট পাচ্ছে। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। তার পরেই খুলে যায় বিরাট কাঠের পাল্লা। কুয়াশায় ঢাকা অল্প দিনের আলোর মধ্যে গণেশ ভয়ে ভয়ে মহিলার মুখের দিকে তাকায়। না, তেমন রাগের চিহ্ন নেই। মহিলা এগিয়ে এসে গ্রিলের তালা খোলে। পুরোটা না খুলে কিছুটা ফাঁক করে ওদের ভেতরে ঢোকার ইশারা করে।

ঘরের ভেতরটা ওদের কাছে স্বর্গের মতো উষ্ণ মনে হয়। ডাক্তারনি তালা-চাবি ঝনাৎ করে টেবিলের ওপর রেখে ওদের দিকে ফেরে—রুগি কিডা? কার অসুখ?

ছমারি তার বুকের ওপর পুটলি করে রাখা রীতাকে দেখানোর চেষ্টায় নড়ে ওঠে। মুখে বলে—আমার বিটিয়া।

ও। ঐ টেবিলে শুয়ায়ে দে।

নিজেও হাত লাগায় রীতাকে শোয়াতে।

এখন ক দিনি কী হইছে? কী অসুখ? দাঁড়া লাইটটা জ্বালায়ে নি। কারেন্ট আবার আছে কি না কে জানে!

সুইচ টিপতে উজ্জ্বল আলোয় ভরে ওঠে ঘর। ছমারি ততক্ষণে সরিয়ে ফেলেছে রীতার গায়ের কাপড়। কোমরে জড়ানো স্যাতসেঁতে কম্বলটাও সরিয়ে ফেলে। সেদিকে তাকিয়েই আঁতকে ওঠে ডাক্তারনি।

রীতার ছোট যৌনাঙ্গের মুখে, থাইয়ে চাপ চাপ রক্ত। ছমারি সেটা দেখে ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলাতে চায়। আর বাবা গণেশ কান্নার দমকে কাঁপতে কাঁপতে দৃষ্টি ফেরায় অন্যদিকে।

আয়োডিনে তুলো ভিজিয়ে সেই রক্ত পরিষ্কার করতে গিয়ে ডাক্তারনি দেখে ক্ষতবিক্ষত যৌনাঙ্গ। হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে থাকে তাজা রক্ত। সে শিউরে উঠে বলে—কিডা করল?

ছমারি বলল—মানুষ। মরদ মানুষ।

এইটুকু মিয়্যা ছাওয়ালেক!

ডাক্তারনিকে ক্ষুব্ধ-পীড়িত হতে দেখে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না গণেশের, ছমারির। এইরকম তো হরহামেশাই হয়।

চিনিস তাগোরে? ঐ হারামিগুলোরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। নওশের, সমশের আর চান মিয়া।

বাচ্চাটা আখক্ষেতের পাশে ছাগল চরাতে গিয়েছিল। ওরা তাকে আখক্ষেতের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। ভরদুপুরে। কেউ-কেউ হয়তো চিৎকার শুনতে পেয়েছে। কিন্তু এগোয়নি। ওরা নিজেদের পাশবিক উত্তেজনা মিটিয়ে অজ্ঞান মেয়েটিকে আখক্ষেত থেকে বাইরে এনে ফেলে গিয়েছিল। ওদের দয়া। আখক্ষেতের মধ্যে ফেলে রাখলে রীতাকে হয়তো খুঁজেই পাওয়া যেত না।

ডাক্তারনি সব শুনে রাগে কাঁপে। সম্ভবত নিজে নারী বলেই ধর্ষণের ঘটনায় তার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হয়। সে খুব যত্ন করে মেয়েটিকে পরিষ্কার করে। জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। ব্যথার ইনজেকশন দেয়। আলমারি খুলে অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুলের পুরো ডোজ তুলে দেয় ছমারির হাতে। তারপর বলে—আমার য্যাতখানি জ্ঞান, আমি করি দিলাম। এখন তুমারে যাওয়া লাগবি সদরে বড় হাসপাতালে। আমি রিফার্ড লিখি দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, মামলা করা লাগবি কিন্তু। জানোয়ারগুলানেক শিক্ষা দেওয়াই লাগবি।

২

মাঘ-ফাল্গুন কেটে গেছে মাঝখানে। পউষ মাসের এই ঘটনায় আমরা জড়িত হই চোত মাসে।

আমরা জড়িত হই মানে, অ্যাডভোকেট জালালুদ্দিন, আমাদের পাড়াতো দুলাভাই, আমাদের জড়িয়ে নেন। তিনি আবার একটা মানবাধিকার সংস্থার জেলা সমন্বয়কারী। জেলা জুড়ে যে-কোনো ঘটনায় তাঁর বিবৃতি স্থানীয় পত্রিকায় অগ্রাধিকার পায়। বেশ চরে-খাওয়া মানুষ। তাঁর সংস্থা তাঁকে একবার ফিলিপাইন থেকে পর্যন্ত ঘুরিয়ে এনেছে। তো, তিনি চান্স পেলেই আমাদের কাছে ম্যানিলার গল্প শুরু করেন। বিশেষ করে রাতে নাকি হোটেলরুমে দালালের অত্যাচারে ঘুমানো দায়। মেয়েদের পিকচার কার্ড আর মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নিয়ে দরজায় দাঁড়াবে—বিউটিফুল গার্ল স্যার। নো দিজিজ স্যার। নো এইদস স্যার। নো সিফিলিস, নো গনোরিয়া স্যার। ওনলি তু দলার স্যার।

তবে পাড়াতো দুলাভাই ম্যানিলার হোটেলে রাতে শান্তিমতো ঘুমাতে পেরেছিলেন কি না তা অবশ্য বলেন না। তাঁর মানবাধিকার সংস্থা মাঝে মাঝে এই মফস্বল শহরে সেমিনারের আয়োজন করে। একবারের বিষয়বস্তু ছিল : আত্মহত্যার অধিকার। তা যে-বিষয় নিয়েই সেমিনার হোক-না কেন, বক্তৃতাপর্বের পরেই থাকে প্যাকেট বিরিয়ানি আর স্প্রাইটের ব্যবস্থা।

তো অ্যাড জালালুদ্দিন আমাদের জানালেন যে শহর থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে আদিবাসী পল্লিতে আমরা তাঁর সংস্থার ব্যানারে প্রতিবাদসভা করতে যাব। পউষ মাসের ঘটনার প্রতিবাদসভা চোত মাসে কেন জিজ্ঞেস করাতে অ্যাড জালালুদ্দিন জানালেন যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শিশুধর্ষণের ব্যাপারে প্রথমে গ্রাম্য সালিশ বসেছিল। সেখানে তিন ধর্ষক নওশের-সমশের আর চান মিয়া অন্তত ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করেনি। সালিশে রায় হয়েছিল যে মামলা-মোকদ্দমা হবে না। তবে তিন ধর্ষক মিলে তিন তিরিক্কে নয় হাজার টাকা ধরিয়ে দেবে ধর্ষিতার চিকিৎসার জন্য। তারা শ-পাঁচেক দিয়েছিল। চিকিৎসাও ঐ পাঁচশো টাকারই হয়েছে। বাচ্চামেয়েটার কোমর থেকে নিম্নাঙ্গ নাকি অবশ হয়ে গেছে। বস্তিদেশের হাড়গোড় ভেঙে আছে। এখন ঐ অঞ্চলের আদিবাসীরা প্রতিবাদসভা করতে চায়। সেখানে অ্যাড জালালুদ্দিন কেন? কারণ তার হেড অফিস থেকে চাপ এসেছে। কোনো এক ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক নাকি পত্রিকায় সচিত্র নিউজ করে ফেলেছে। অ্যাডকে তাই মাঠে নামতেই হচ্ছে।

কিন্তু এই চোতমাসের গরমে ষোলো কিলোমিটার রাস্তা! তার পরে ঐ গাঁয়ে কারেন্ট-ফারেন্ট আছে কি না কে জানে!

আমরা আশ্বাস পাই। এসি-ফিট-করা মাইক্রো নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবাদসভার জায়গাতে ডাব মজুত থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। বিকেল চারটায় প্রতিবাদসভা। আমরা দুপুরে খেয়েদেয়ে অ্যাড জালালুদ্দিনের বাড়িতে জমায়েত হব। তারপর ছয়জন মিলে এসি গাড়িতে যাত্রা।

AMARBOI.COM

পৌরসভার সীমানা পেরুতে-না-পেরুতেই চোতমাসের খরা সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে। ঘেয়ো লোম-ওঠা কুকুরের চামড়ার মতো এবড়োখেবড়ো রাস্তা। আমরা রাস্তার দুইপাশের মেটেরঙা মাঠ আর মাঝে মাঝে দুই-একটা গাছকে তাপদাহে পুড়তে দেখি। কোনো কোনো মাঠের মধ্যে চালের চাল থেকে ঝলসানো রোদ প্রতিফলিত হয়ে এসি গাড়ির জানালা ভেদ করে আমাদের চোখ ঝলসে দেয়। রাস্তা থেকে অনেকখানি ঢালুতে মাঠ। অনেক দূরে এক-একটা ডোবা চোখে পড়ে। কোনো ডোবায় পানি নেই, শুধুই কাদা। সেই কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে চৈত্র-ত্রাসিত মোষ।

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার চলে এসেছি। রাস্তায় কোনো মানুষ দেখিনি। পথের ধারে যে ছোট বাজার, সেখানেও কোনো দোকান খোলা নেই। একটা বা দুটো কুকুরকে দেখা গেছে। ছায়া খুঁজে নিয়ে সেখানে বসে আট আঙুল সাইজের জিভ বের করে করে হাঁপাচ্ছে। আমাদের একজন কাতরে ওঠে—ইশ্‌রে গরম। ঠেকাত না পড়লি এই গরমে কুত্তাও রাস্তাত বার হয় না।

ঠিক ঐ সময়েই বিপরীত দিক থেকে এক সাইকেল-আরোহীকে আসতে দেখা যায়। খানা-খন্দ-ভরা রাস্তায় ঝাঁকি খেতে-খেতে ছুটে আসছে সাইকেল। আরোহীর গায়ে একটা ইটরঙা জামা। পরনের কালো প্যান্ট দূর থেকেও বোঝা যায়। আমাদের মাইক্রো তখনো তার কাছে পৌঁছেনি, কিন্তু দূর থেকেই সে আমাদের দেখে তার সাইকেল থামিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। আমরা তার নিকটবর্তী হলে দেখা যায় ঘামে-ভেজা একটা কালো মুখ প্রত্যাশায় জ্বলজ্বলে দুই চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে মাইক্রোর দিকে। মাইক্রো তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ অ্যাড জালালুদ্দিন চেঁচিয়ে ওঠেন—আরে থাম্ থাম্, ঐডা প্রদীপ লাকড়া।

মাইক্রো থামে। জানালার কাচ সরিয়ে জালালুদ্দিন মুখ বের করে ডাকেন—ওই প্রদীপ, তুমি কোনে যাচ্চো?

প্রদীপ হাঁচোর-পাঁচোর করে সাইকেল টেনে ছুটে আসে মাইক্রোর পাশে। ঘামগড়ানো মুখের বত্রিশপাটি দাঁত আর লাল মুষলো বের করে হাসে—আপনার ঘরে এগিয়ে আনতে যাচ্ছিলাম। আমাদের লোকেরা সব রেডি করে বসে আছে।

দ্যাখো কাণ্ড, আমাদের আবার আনতি যাওয়া লাগিব ক্যান?

একথার উত্তর দেয় না প্রদীপ। শুধু হাসে।

জালালুদ্দিন আবার বলেন—এই রোদের মধ্যে...

প্রদীপ এবারও শুধু হাসে।

চলো। ঘুরে চলো।

প্রদীপ সাইকেল নিয়ে মাইক্রোর পেছনে পেছনে আসতে থাকে। মাইক্রোর জানালা আবার বন্ধ করা হয়েছে। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই যতটুকু ধুলো এবং গরমের আঁচ ঢুকেছে, তাতেই আমরা বিরক্ত হয়ে উঠি। জালালুদ্দিন বলেন—ঐ ছাওয়ালের নাম প্রদীপ লাকড়া। সাঁতালগের মদ্যি ঐ একখান ছাওয়ালই বিএ পাশ করিছে। ঐ ছোঁড়াডাই এই সভা করার জন্যি ছুটাছুটি করিছে।

একজন বলে—সাঁওতাল না, ওঁরাও। লাকড়া পদবি হচ্ছে ওঁরাওগের।

ঐ একই কথারে বাবা! যাহা সাঁতাল, তাহাও ওঁরাও।

আমাদের এসি মাইক্রোর পেছনে রোদে ভাজা-ভাজা হতে হতে সাইকেল চালিয়ে আসে বিএ পাশ প্রদীপ লাকড়া। রাস্তা এতই খারাপ যে মাইক্রো সাবধানে চালাতেও আমরা ঝাঁকি খাই। বিরক্ত হয়ে একজন বলে—আর কতদূর? আমরা যে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই।

অবশ্য চারটা বাজার আগেই আমরা সভাস্থলে পৌছে যাই। রাস্তার পাশে এক স্কুলমাঠে প্রতিবাদসভা। মঞ্চ তৈরি। মঞ্চ মানে ডেকোরেটরের জোড়া চোকি। মঞ্চের মাথার উপরে শামিয়ানা। দর্শকের মাথার ওপর কোনো আচ্ছাদন নেই। সেই খোলা আগুনবর্ষী আকাশের নিচে জটলা পাকিয়ে বসে আছে কালো-কিষ্টে শ-দুয়েক নারী-পুরুষ। আমাদের নামতে দেখে এগিয়ে আসে একদল নারী। তাদের হাতে পেতলের ঘটিতে বরণজল। তারা এসে আমাদের পা ধুইয়ে দিতে চায়। আমরা হাঁ হাঁ করে উঠি। আরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের পায়ে তো ধুলো নেই।

একজন মোড়লশ্রেণীর বৃদ্ধ এগিয়ে আসে জোড় করে—বাবু এ আমাদের রীতি আছে। আপনারা অত দূর থেকে রোদে পুড়ে তেতে এলেন আমাদের ভালোর জন্যে, আমরা ... আমরা ...

বৃদ্ধ আর কথা খুঁজে পায় না। তার মুখে কৃতার্থের হাসি।

প্রদীপ এসে পড়েছে। মঞ্চের পাশে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে উঠে পড়েছে মঞ্চে। সাত সাত চোদ্দ কিলোমিটার একটানা সাইকেল ঠেলেছে এই রোদের মধ্যে। হাঁপাচ্ছে খুব। কিন্তু পরোয়া না করে মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছে—আপনেরা বসেন। আমাদের মিটিং-সভা এক্ষুণি শুরু হবেক।

আমরা মঞ্চে উঠি। আমার পেটের মধ্যে শিরশির করছে একটু। গতকাল রাত জেগে বক্তৃতা লিখেছি অনেক কাটাকুটি করে। মুখস্থ করতে করতে দুপুর। তবু মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে। অন্তত আয়নার সামনে একবার রিহার্সেল দিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। সেই খুঁতখুঁতানির সঙ্গে সদ্য এসি থেকে বের হবার দরুন একটু জ্বর-জ্বর বোধ। তার সাথে চিড়বিড় করছে চামড়া গরমে। আমরা মঞ্চে বসে এদিক-ওদিক ডাব খুঁজি। জালালুদ্দিনের কথামতো অঢেল সরবরাহ থাকার কথা। কিন্তু কই? ডাব কই?

ডাব দিয়েই শুরু হল আক্রমণ। ধাঁ করে একটা আস্ত ডাব আঘাত করল মাইকে দাঁড়ানো প্রদীপ লাকড়ার পেটে। ছুটে এল জনা-কুড়ি মর্দে-মুমিন। হাতে রামদা, হকিস্টিক, বাঁশের লাঠি। এলোপাথাড়ি পিটাচ্ছে আদিবাসী নারী-পুরুষকে। এতই আচমকা আক্রমণ যে আমরা তখনো পুরোপুরি ভয় পেয়ে পর্যন্ত উঠতে পারিনি। ভয় পেলাম, যখন আমাদের দিকে ধেয়ে এল কয়েকজন। আমার মাথা লক্ষ্য করে বাঁশ তুলেছে একজন। আমি আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছি। পালানোর কথা মনেই নেই। এমনকি ভয়ে যে চোখ বন্ধ করে ফেলব, সেটাও ঘটেনি। বিস্ফারিত চোখে দেখছি, অমোঘ নিয়তির মতো আমার শরীরের দিকে নেমে আসছে বাঁশের আঘাত। কিন্তু রিফ্লেক্স বলে একটা জিনিস আছে। সেই রিফ্লেক্সের বলেই আমি শেষমুহূর্তে ইঞ্চি চারেক সরে যেতে পারলাম—একেবারে শেষমুহূর্তে। লাঠি আক্ষেপে মাথা কুটল মঞ্চের কাঠে। কিন্তু কতক্ষণ বাঁচব আমরা! হঠাৎ পেছন থেকে গলা ভেসে এল—আরে আরে এইসব ভদ্দরলোককে মারিস ক্যা! যা যা অন্যদিক যা।

তাকিয়ে দেখি বক্তা মাঝবয়সী রাশভারী লোক। আমাদের তিনি দুই হাত তুলে অভয়মুদ্রা দেখালেন। তারপর সশস্ত্রদের হুকুম—ঐ হারামি জংলিগুলানেক মার্। ঐ যে প্রদীপ। জংলির বাচ্চা শালা ফুলপ্যান্ট পরিছে। ঐ শালার ফুলপ্যান্ট ছিঁড়ে ফ্যালা। লেংটি পড়ায় দে।

বাহিনী আমাদের ছেড়ে আদিবাসীদের তাড়া করতে ছুটল। মাঝবয়সী বলে—আপনেরা সন্মানী মানুষ। ঐসব ছোটলোকের কথা শুনি বিভ্রান্ত হইছেন। আসলে জানেন না তো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা সব মিথ্যা মামলা করে। এরা সর্বহারার দলে যোগ দিছে। ভালোমানুষের গলা কাটে।

আমরা তখনো কাঁটা হয়ে পাশাপাশি গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। মঞ্চের ঠিক নিচে গড়াগড়ি যাচ্ছে প্রদীপ লাকড়া। তাকে সমানে লাথি মেরে চলেছে তিনজন। বাকি আদিবাসী নারী-পুরুষরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে এদিক-সেদিক। বন্য চিৎকারে তাদের তাড়া করছে সভ্য বাহিনী।

৪

ইউনিয়ন পরিষদে সুস্থির হয়ে বসে আমরা ডাবের ঠাণ্ডা পানিতে চুমুক দিচ্ছি। বক্কর চেয়ারম্যান, সেই মাঝবয়সী লোকটা আমাদের ব্রিফিং দেবার ভঙ্গিতে বলে চলে—এই আপনাদের যা যা কইছে, সব অপপ্রচার বুজলেন। এইগুলান হচ্ছে সরকারকে দুর্বল করার চিষ্টা। জাতিকে বিভক্ত করার অপচিষ্টা। আপনেরা টাউনেত থাকেন, এসব ভিলেজ পলিটিক্স বুঝবার পারবেন না। এখন সরকার যে নারী ও শিশু নির্যাতনবিরোধী আইন করিছে, সিডা খুব কড়া। তা সুযোগসন্ধানীরা এই আইনের খুব অপব্যবহার করে। করে না উকিল সায়েব?

অ্যাড জালালুদ্দিন আচমকা প্রশ্নে থতমত খেয়ে এমনভাবে মাথা দোলালেন, যার মানে হ্যাঁ হতে পারে না-ও হতে পারে। সেটাকেই হ্যাঁ ধরে নিয়ে চেয়ারম্যান বলে চলে—এখন যে-কোনো মানুষির নামে এক্কারাত কেস ঠুকলিও হাজত। হয়রানির আর শ্যাষ নাই। অথচ আমি চিয়ারম্যান। আমি আমার ইউপি-র সব মানুষির নাড়িনক্ষত্র চিনি। আমি চিনি কিডা কেমন, আপনেরা আমার সাথে আগে একটু যোগাযোগ করলি আর বিভ্রান্তি হয় না। এই যাকে বলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটে না। তবে যা-ই হোক, আল্লার কাছে হাজার শুকুর, আপনাদের গায়েত ফুলের টোকা লাগেনি। মানীর মান আল্লাহ বাঁচাইছে। তবে যাই-ই কন উকিল সায়েব, আপনের আগে আমাক খবর দেওয়া উচিত আছিল।

অ্যাড জালালুদ্দিন মিনমিন করে বলেন—আসলে আমাদের হেড অফিস থেকে...

আরে আপনের হেড অফিস! আমাগের লোকাল মিনিস্টারের কথাত আপনাগের হেড অফিস উঠে-বসে। আমি আজই মিনিস্টারের সাথে মোবাইলে আলাপ করব। তাঁই তাবার আমাক খুব সন্মান করে।

ঘরে ঢোকে আরো কয়েকজন মানুষ। হাঁপাচ্ছে। এরা তাড়িয়ে নিয়ে গেছিল আদিবাসীদের। একজন বলে—শালা হারামিগুলানেক আর গাঁয়ে ঢুকতে দেওয়া যাবি না। শালা জংলিরা জঙ্গলে যায়া থাকুক।

থাম্ তোরা। যা করার আমি করব।—চেয়ারম্যান আদরের ধমক লাগায়। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দিকে ফিরে বলে—ওগের মাথা গরম হবি না ক্যা কন। নির্দোষ মানুষির নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া সন্মানহানি করলে কার মিজাজ ঠিক থাকে। এই যে এই তিনজন হচ্ছে নওশের, সমশের আর চান মিয়া। দ্যাখেন তো এই তিনজনাক কি ক্রিমিনাল মনে হয়?

চান মিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি আবার একটু কেঁপে উঠি। আমার মঞ্চের কথা মনে পড়ে। এই লোকটাই বাঁশ তুলেছিল আমার মাথা সই করে। খুব আদুরে গলায় বলি—আর একটু হলে আপনি তো আমাকে মেরেই ফেলেছিলেন।

কী যে বলেন স্যার! চান মিয়া একটু লজ্জিত হাসে—আমি কি আপনেক মারতি পারি? হাজার হলিও আমরা হচ্চি স্বজাতি।

আমরা একটুও দ্বিধা না করে মেনে নিই। কথা তো মিথ্যা নয়! আমরা চান মিয়া-নওশের-সমশেরদের আপনগোত্রের মানুষ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ দি তি ফা ল্গু নী

জয়নালউদ্দিনস্ ট্রাভেলস্

আমার বাড়ি সিলেটের বালাগঞ্জো (বালাগঞ্জ) তানা (থানা)। বয়স সত্তইর থেনে আরো দুই/এক বছর বেশি। আমি বিয়া হ(ক)রছি দ(ধ)রইন আপনার স্বাদীনের (স্বাধীনের) তিন-চার-পাঁচ বছর পর বিয়া করছি—আগে আদমজি চাকরি করছি। আমি বাড়িছাড়া আইজকা পাঁচচল্লিশ বছর বাড়িছাড়া। আমার গুষ্টিরা কুটিকুটিপতি (কোটিপতি), ছয়/সাত কোটি ট্যাকার দৌলত সর্বত্র—জ্ঞাতি চাচার গরত জ্ঞাতি বাইর গরত—জ্ঞাতি বাতিজা তিনজন ছউদি (সৌদি), একজন বাতিজা লন্ডনত, একজন বাতিজি লন্ডনত, তারপরে তারার বাপ খালি আছে বাড়ি আর একটা বাই আছে সবার ছুটো। এক পাও একটু ছুটো এই এখন গিরস্থি করে—দ(ধ)রেন ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্টের মানুষ পনের/ষুলজন মানুষ বছরিয়া রাখছে আর কি কইরা গিরস্থি পারপাসে আর বাকি জমিন যেই আছে এইসব জমিন গ্রামের মানষেরে বর্গা দিছে (হইয়াও অর্ধেক দিব, তারও অর্ধেক দিব), তিন/চাইরটা বাড়ি রইছে ই(হিন্দু)মানুষ তো গ্যাছে গিয়া এইসব বাড়ি তিন/চাইরটা কিইন্যা লইছে। তহোন আমি এই বাড়ি থইনা (থেকে)—আমার বাপ-মা মইরা গেছেনিনি আমারে ছোট থুইয়া—একাক বইন এক বাই—বাবারে দেখছি আমার ঠার নাই—আমার মা আবার একখানে বিয়া বইয়া গেছিল লাগা উত্তরের বাড়ি—তারপরে আমার মামু মুরে (মোরে) নিয়া চলে আমার বইনটা নিয়া পালিয়া বিয়ার বয়স হইছে পর বিয়া দিছে—আর আমি মামুর বাড়ি আছিলাম কতদিন আর মামুর বাড়ি থন বাইর হইলাম আইজকা পাঁচচল্লিশ বছর। তখন আমার বয়স এই সতেরর উপর অইব। আমি তো গেছিলাম আপনার এই তিনবছর আগে আগে দেশে গিছিলাম—আমার মাইয়ারে আর বুবা ইয়া এই হাবা ছেলেরে লইয়া গিছিলাম—আমার তিন ছেলে/মেয়ের মাইয়ারে বিয়া দিছি আর দুই ছেলের এক ছেলে বুবা (বোবা) আর এক ছেলে হাবা (মানসিক প্রতিবন্ধী)—যাওয়ার পরে তখন তারা কইন যে এখন আইছ এতদিন পরে কী লইয়া আইছ—এখন তো চোহে দ্যাখো না এখন গিরস্থিও করতার দেয় নাই—ডা(ঢা)কাতে আছ যে রিকশা চালাও—দ্যাশটা কবে হবে, ইলেকট্রিক বাতির তলে আছ হ্যাঁ—পাহাইতে পারবা—এহন তো গর একটা উঠাইয়া দিলাম—যাইয়ো—আমারে গর উঠাইয়া দিল আর-কি—এই আমার ফুপু তিনজন তে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুপু তিনোজন মারা গেছে তখন ট্রানজেস্টর আমি আনচেলাম—এইটা চাচার গরোর (ঘরের) ভাই, চাচার ভাইগ্গার ছেলে—ছেলের বড়—তারা চাচার গরের বাই হয় তখন ট্রানজিস্টার আমি আনচিলাম—একবার লন্ডন মানুষ নিতে আছে আড়াই হাজার ট্যাকা লাগে তো হেইসময়, আমি কই চেয়ারম্যান যে কাফি, আমার যে কিছু ট্যাহাহরি (টাকাকড়ি) লাগে তো তাইন আমারে কইলা যে তুই এক কাম কর, তুই করাচি যা গিয়া, দুইশ পাঁচ টাকা লাগব পেলেনের ভাড়া—ডা(ঢা)কাত গিয়া দুইশ পাঁচ টাকা লাগব করাচি পেলেনে যাওনের ভাড়া—এ দ(ধ)রইন চল্লিশ বছর আগের কথা—পাকিস্থান আর হিন্দুস্থান হইছে এর পরে গিয়া—তা কাফি চেয়ারম্যান কইন যে করাচি যাও গিয়া—করাচি গেলে গিয়া যেকুনো একটা মানুষের লগে লন্ডনত যাইতে পারবা—তর জমির অংশটা আমার অংশে দিয়া যা—আমার দাদার বাইগ্না (ভাগ্নে) আমার চাচা হয়, তারার ছেলে আমার চাচার গরোর (ঘরের) বাই হয়—তাইন কাফি চেয়ারম্যান—তাইন কইলা আমার মার কাবিনের যে জমিটা—আমার মা'র তো আর এককানে (একখানে) বিয়া অইয়া গেল লাগা উত্তরের বাড়ি—সেই জমি আমারে দিয়া হেইয়ার পর তুই যা গিয়া—তর বইন তো তর মামুই পালতে আছে—তুই দ্যাখ্ কিছু টাকা-পয়সা আনতে পারোস কি না লন্ডন থেইকা পারোস? আমি তখন তার কাছে কইলাম যে, আমার জায়গাটা রাখিয়া আমারে দুইশটা টাকা দেও, আমি করাচি যাই গিয়া—আমি চাইর/পাঁচ বছর পর আইমু। এই কইল, ঠিক আছে, আরো তো চাচার গরো বাই আরো চার-পাঁচ জন তারাও অংশ একটু আছে মাঝখানে—তা কইলা তুই গেলে গিয়া তারা যদি বাধা দ্যায়, হ্যাঁ? আমার এই সুপারি টুপারি একটা পাড়তে তো আমি একটা কি রাস্তা দেখাইতাম পারমু হ্যাঁ? অই একটা সই কইরা দে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়া—তর মায়েরে বইনেরে ফেলাইয়া খাইমু না, তারারেও দিমু—তাইন আরো কইলা যে তুই চাইর/পাঁইচ বছর পর কি যেন সময় পর আস, তোর জিনিস কি তুই কি মনে করস কি তোরে ফেলায় দেবনে—তো তাইনে মানে কাফি চেয়ারম্যান আমারে দুইশ টাকা দিল—দিয়া কয় কি যাই বালাগঞ্জো—তহন তাইন কইলা যে আমি তো আর পালাইতম না—তুই চোদ্দ বছর পরেই যে বালাগঞ্জো তানায় গিয়া একটা কাগজ খরিয়া তারপর এইটার মইদ্যে টিপসই দিয়া আমি তর লইয়া খাই তারার চাচার যে কজন বাই (ভাই) আছে দে আমার কাছে দিয়া গেছে তে তাইন বালাগঞ্জো তানাত (থানাতে) গিয়া, তখন আমার হাতের একটা টিপ লইল একটা কাগজ না কী জানি লাগল কী খইতাম (বলতে) পারি না। এই কাগজের মইদ্যে তানা গিয়া অফিসত গিয়া সেই অফিসত গিয়া আমার হাতের একটা টিপসই লইল। কত বিঘা জমি ছিল আমি কইতাম পারি না। এই বাড়ির মইদ্যে মইদ্যে দরেন অই বসতি আমার চাচা দুইজন—আমার বাপের অংশ, আমার চাচা দুইজনের অংশ তার, তারার দুই বাইয়ের অংশ—দাদার বাইগ্নার অংশ—এই পাঁচ বা(ভা)গ, এ্যাঁ? যে আমার মা'র বাগের অংশ আমার মা'রে দিয়া দেছে জান দেইখ্যা তারপরে এই চাচা দুইজনের অংশ তারা পাইছে দখল কইরা—চাচা মইরা গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনোজন—এখন মাইজোচাচা এক বাড়ি চাকরি করত। তাইন মক্কাশরিফ যাইবো কইয়া বাড়ি গেছে—আমার বাপের ছুটো দুইজন চাচা। আমার বাপেই খালি বিয়া হরছিল। আমার চাচা দুইজন মারা গেছে। একজন ব্রিটিশের লড়াইর সময় গেছে গা আর একজন একটা কম্পানির বিরাট চাকরি করছইন আর এদিকে মানে মিলিটারিকে ট্রেনিং দিত কম্পানি—যে সরকার যে সময় ব্রিটিশে—যে সময় নাকি আপনার এই মানুষমুখো যুদ্ধ... সেইসময় মিলিটারি লাগলে মিলের মানুষ নিয়া যায়। এই আমার চাচা মাইজোজনের ছুটোজন যখন বাড়িত যায়, মাইজোজনে চিঠি দিছেন তো। গিয়া একমাস পরে আমার ছুটো চাচারে ট্রেনিং দিতে দিছে। এই একমাস পরে ছুটো চাচার এই প্যাটে ব্যথা উঠছে। প্যাটে ব্যথা উঠছে পরে হাসপাতাল ভরতি করছে। তাইনে হাসপাতাল ভরতি করছে পরে আমার চাচা ওইখানে মারা গেলেন। তখন আমার চাচা মাইজোজন বাড়ি চিঠি দিলা দাদির কাছে যে এরম মারা গেছে আমার ছুটো বাই—এখন দাদি কয়, নারে, এই চামড়া আমার দাদির জুইলা গেছে, সারা দিনে একবার অজু করতা আর এক অজুই তা(থা)কত সারা দিন। তখন এই চাচা মাইজোজন গেছে মধুপুরবাগ আর দাদি পিছলা খাইয়া বুড়া মানুষ তো মচকাইয়া পইড়া এইখানকার একটা হাড়গোড় ভাইঙ্গা গেল। ভাইঙ্গা যাওনের পরে, অই সময় ডাকতরই (ডাক্তারই) তো আছিল না। সেইসময় কবিরাজি এইসব আছিল। তখন কবিরাজি ঔষধ [illegible] দিছইন, শেষে বুড়া মানুষ, সাত/আট দিন পর মারা গেল। তখন আমার চাচা মাইজোজনের কাছে চিঠি ল্যাখলাম যে দাদি মারা গেছে। তা মাইজো চাচায় খবর পাইয়া আসিয়া কবর দিয়া যে গেল আর দ্যাখা নাই। মাস গুরতে-না-গুরতে আমার মা'র যে বিয়া অইছিল লাগা উত্তরর বাড়ি, মায়েও মরছে। এখন দাদি নাই, মাও নাই, চাচা নাই—তইলে আমি কিতা করব? আমার ফুপু একজন আছিল চিটাগাং। আমার ফুপুর শ্বশুর আমারে আর আমার বইনরে বাড়ি থনে (বাড়ি থেকে) নিয়া কইল যে মা'র কথা হুনত না—ছোট ফুপুর কাছে দিয়া দিব, লেখাপড়া শিখাইব—সেইসময় কাফি চেয়ারম্যান কইলো বালাগঞ্জো তানায় মা'র কাবিনের জমি আর আমার দুই চাচার জমি টিপসই খরিয়া করাচি যাওনের দুইশ টাকা পেলেন ভাড়া লইয়া ডাকা (ঢাকা) আইয়া পড়তে (আসতে)। করাচি থন লন্ডন যাওন যাইব, তাইন মানে কাফি চেয়ারম্যান কইলা। হ্যারপরে দুইশ টাহা দিয়া আইছলাম এই যে ফুলবাড়িয়া স্টেশন আছিল না এই ইস্টিশন আইছি। সেইসময় রাইতে বারোটা না একটায় ট্রেনে আইছে ঘুল্লি (হুইসেল) দিছে—রাইত কইরা—এখন আমার আছে একটা সুটকেস আছিল—যে সুটকেস লইয়া গেছি বোডিং, বোডিংয়ের ভিতরে। ছুটো ছুটো (ছোট ছোট) পুলাপানরা বলতে আছে, 'আসেন—বোডিংয়ে তা(থা)কতে পারবেন—খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন।' এইগুলা কইয়া ক্যানভাস কইরা লইয়া যায়—ছুটো ছুটো পুলাপান। বোডিং গিয়া দেখি সিলেট জেলার মানুষ মেইনলি প্রধান। আর অন্য অন্য জাগার মানুষ তারা পাসপোর্ট করবার আইছে—দারোয়ান দিয়া পাসপোর্ট করতে আছে। এইই। আমি তো আর লন্ডন যাইতাম পারমু না (আমার কাছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়াই হাজার ট্যাহা চাবে। এখন দুইশ ট্যাহা এখন লইয়া আইছি তো)। এখন আমি করাচি যামু। এই একজন নকল দালালে বলে করাচির টিকিট আমি কইর‍্যা দিমু। এইই। এইই কওয়ার পরে কই সকালে তখন এই একটা কাগজ আলগা আইন্যা ক্যামনে কী দেখাইলা না-দেখাইলা। কাগজ বিছাইয়া বলে, এইহানে ট্যাকা জমা দেওয়া লাগবো। এইকথা কইয়া তারপরে তাইন চইলা গেল। পাঁচ-ছয়জন দালাল ঠাইয়া ঠুইয়া ওই বোডিংয়েতেই থায়ে (থাকে)—আর এই দালালি পাসপোর্ট থে তারা ট্যাকা নেয়। এ্যারপরে এই বোডিংয়ে পরে আমার টাকা সুদ্ধা সুটকেস গেছে গা, বুঝলাইন? এই আমি আতাহার রোড সিভিল সাপ্লাই অফিসের পাশে গেছি চাইল কিনমু, একটা বেডা চাইল ধুইয়া তাইনা বেচতে আছে—ইহানো চাউল পাইতে গেছি আপনের—রুম আছে—রুমত খোলা আছিল—তখন এই সুটকেসটাও লইয়া গেল টাকা সুদ্ধা—রুমে ফিরা দেখি এই সুটকেস এই ট্যাকা যে গেল গিয়া—এখন আমার মাথা খারাপ। করাচি ক্যামনে যাইয়ুম? কান্দতে কান্দতে বেহুঁশ হইয়া গেলাম। তখন কুনো ট্যাকা নাই। শুদু একটা ফুলপ্যান্ট আর লুঙ্গি আছিল। এই ফুলপ্যান্ট বিক্রি করিয়া আইলাম—ফুলপ্যান্টটা বেচিয়া টাকা পাওনের পরে এক লেবাররে কইলাম যে, বা(ভা)ই, আমাকে কুনো কাম দে তা(থা)কলে। ওই লেবারেও বোডিংয়ে থাকত। তো ওই লেবারে আমারে লেবারির কাম দিল তেজগাঁওয়ে। তেজগাঁও, এই গুদাম আছে না? গুদামে মানে বস্তা ভরিয়া টেরাকের উপর উঠাইয়া দ্যায় না এই চাল? গুদামে এই কাম খরিয়া রোজ পাঁচ সিকা পাইতাম—রাইতে তেজগাঁও ইস্টিশন এইসব জায়গায় পড়ি তাকতাম—এরকম কইরা দশ-বারো দিন পর খাইয়া-চলিয়া তারপর চিন্তা অখন কই যে, এই কাম করুম যদি তার চেয়ে আসাম যাইয়া ট্যাহা-পয়সা রোজগার করি। এই এই টেরেনে উইঠা সিলেট গেলাম গিয়া রাত্রে। সিলেট গিয়া কুলাউড়া গিয়া নামলাম। কুলাউড়া গিয়া বদরপুর গেলাম, বদরপুর থেনে আসাম গেলাম।

AMARBOI.COM

প্রথম ভাগ
লিলিপুটদের দেশে
প্রথম পরিচ্ছেদ

[লেখক তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের কিছু ইতিহাস দিচ্ছেন। ভ্রমণে তাঁর প্রথম আগ্রহ। জাহাজডুবি হল, প্রাণ বাঁচাতে সাঁতার কাটতে হল, নিরাপদে তীরে পৌঁছলেন কিন্তু দেশটা হল লিলিপুটদের। বন্দি হলেন, লিলিপুটরা তাদের দেশে লেখককে নিয়ে গেল।]

নটিংহ্যামশায়ারে আমার বাবার ছোট একটা জমিদারি ছিল, আমি হলাম বাবার পাঁচ ছেলের মধ্যে তৃতীয়। সেখানে আমি তিন বছর ছিলাম এবং বেশ মন দিয়েই লেখাপড়া করছিলাম। কিন্তু কলেজে পড়ার আমার যে-খরচ (যদিও আমার জন্য বরাদ্দ অর্থ সামান্যই ছিল) বাবার আয়ের তুলনায় বেশি ছিল। অতএব আমার পড়া বন্ধ হল এবং আমাকে বাধ্য হয়েই লন্ডনের বিখ্যাত সার্জন মি. বেটসের কাছে শিক্ষানবিশির কাজ নিতে হলো। মি. বেটসের কাছে আমি চার বছর ছিলাম। বাবা আমাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাতেন। আমি সেই টাকায় জাহাজ চালানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যা এবং দেশভ্রমণে কাজে লাগতে পারে গণিতের সেইসব তথ্য শিখতে লাগলাম কেননা আমি বিশ্বাস করতাম যে, সমুদ্রযাত্রায় কোনো-না-কোনো সময়ে আমার ভাগ্য ফিরবে। মি. বেটসের কাজ ছেড়ে আমি বাবার কাছে ফিরে এলাম। বাবা এবং দুইজন কাকা এবং কয়েকজন আত্মীয়ের কাছ থেকে আমি চল্লিশ পাউন্ড সংগ্রহ করলাম আর বছরে তিরিশ পাউন্ডের প্রতিশ্রুতি পেলাম। আমার উদ্দেশ্য আমি লাইডেন যাব। সেখানে আমার খরচ চালাতে হবে। লাইডেনে দুবছর সাত মাস ধরে আমি ফিজিক্স পড়লাম। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় এ-বিদ্যা খুবই প্রয়োজনীয়।

লাইডেন থেকে ফিরে আসার পর আমার কল্যাণকামী মি. বেটস আমাকে ক্যাপ্টেন আব্রাহাম প্যানেলের কাছে পাঠালেন। তিনি 'সোয়ালো' জাহাজের কমান্ডার। জাহাজের সার্জন পদটি খালি ছিল। মি. বেটস অনুমোদন করায় আমি চাকরিটি পেলাম। ঐ জাহাজে আমি ছিলাম সাড়ে তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে লেভান্ট এবং আরো কয়েকটি বন্দরে বা দেশে যাওয়া-আসা করলাম। দেশে ফিরে স্থির করলাম লন্ডনে বসবাস করব। আমার মনিব মি. বেটস আমাকে উৎসাহ দিলেন এবং তাঁর মারফত আমি কয়েকজন রোগীও পেলাম। ওল্ড জুরি পাড়ায় একটা বাড়ির অংশ ভাড়া নিলাম এবং বন্ধুদের পরামর্শে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে আমি নিউ গেট স্ট্রিটের হোসিয়ারি ব্যসায়ী মি. এডমন্ড বার্টসের মেঝ মেয়ে মিস মেরি বার্টনকে বিয়ে করে যৌতুকস্বরূপ চারশো পাউন্ড পেলাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমার সেই কল্যাণকামী মনিব মি. বেটস দুবছর পরে মারা গেলেন। আমার পরিচিতর সংখ্যা বেশি না থাকায় আমার ব্যবসায়ে ভাটা পড়তে আরম্ভ করল। তা ছাড়া আমার সম-ব্যবসায়ীদের কুনীতি অনুসরণ করতে আমার বিবেকে বাধল। অতএব আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এবং কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার সমুদ্রযাত্রায় যাওয়াই স্থির করলাম। আমি পরপর দুটো জাহাজে সার্জন ছিলাম এবং ছ'বছর ধরে ইস্ট এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ কয়েকবার সমুদ্রযাত্রার ফলে কিছু অর্থ সঞ্চয় করলাম। অবসর সময়ে আমি প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের ভালো ভালো বই পড়তাম। বইয়ের কোনো অভাব ছিল না। তা ছাড়া আমি যখনই কোনো দেশে অবতরণ করতাম তখনই আমি সেই দেশের ভাষা ও মানুষের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি আয়ত্ত করতাম। আমার স্মরণশক্তি প্রখর থাকায় এসব শিখতে আমায় বেগ পেতে হয়নি।

শেষ সমুদ্রযাত্রাটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যজনক হয়নি। আমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, সমুদ্র যেন আর ভালো লাগে না; তাই আমি ঠিক করলাম স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে এবার বাড়িতেই থাকা যাক। ওল্ড জুরি পাড়া থেকে আমি ফেটার লেনে উঠে গেলাম এবং সেখান থেকে ওয়াপিং পল্লি। আশা যে এখানে নাবিকদের মধ্যে আমার পেশা ভালো জমবে। কিন্তু তা হবার নয়। তিন বছর অপেক্ষা করলাম কিন্তু বরাত ফিরল না। তখন ভাগ্যক্রমে একটা চাকরি জুটে গেল। ক্যাপ্টেন উইলিয়ম রিচার্ড তাঁর 'অ্যান্টিলোপ' জাহাজ নিয়ে সাউথ সি যাচ্ছেন। ১৬৯৯ সালের ৪ মে আমরা ব্রিস্টল থেকে যাত্রা করলাম এবং গোড়ার দিকে তরতরিয়ে এগিয়ে চললাম।

এই আসামের গাড়ি গেলাম গিয়া। তখন টিকিটের জন্য দরলো, হ্যাঁ? তহনে না চ্যাকারে (চেকারে) আইয়াই কয় টিকিট কোতায়? বুজলা ননি? তা টেরেন এই গ্যাছে গিয়া আসাম—তিনসিকিয়া। তিনসিকিয়ায় আমি আপনের সিলটেরই একটা মানুষ পাইলাম—জঙ্গলত থায়ে (থাকে)—পাহাড়িরা থায়ে—জঙ্গলত তরিতরকারি তুইল্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনে—এই দুই আনার তরকারি আছে, চাইর আনার তরকারি আছে—তা আমি তিনসিকিয়া ইস্টিশনে গেলাম—একটা চা-দোকানের সামনে খাড়া হইয়া থায়ি—তো ওই চা-দোকানের এক লোক আমারে দ্যাখছে, আমারে দেইখ্যা এই মানুষটা ইশারা করে আমারে, কয়, বাঙালি দেখা যায়। তখন ওই বেডা আমারে নিয়া গেল। নিয়ার পর আমারে একটা চাদর, একটা জামা আর একটা লুঙ্গি দিল। কয়, তোমার বাড়ি কই? আমি কই সিলেট। কয়, সিলেট? দেশের মানুষ পাইছি তয় বালোই। আসামে কত জায়গা! তিনসিকিয়া, ডিগড়, গৌহাটি, হ্যাঁ? সেইসব নানান জিলার নাম। তিনসিকিয়া টাউন হইলেও জঙ্গল আছে। পাহাড়-পর্বত তয় টাউনের জায়গাত টাউন। সেইসময় পাসপোর্ট কুনোতা লাগত না। আসামিরা যখন নাকি বাংলা কথা কয় বুঝা যায়। মুসলমান নাই... কোম... শতকরা দুই/একজন আছে। আর সব পাহাড়িয়া—অন্য জাতি—আমারে মামা ডাকত। তা এই আসামিয়ার বাড়ি—তারা মোসলমান পাইলে খুব আদর করি রাখে। বাড়াবুড়া (ভাড়াটারা) নেয় না। গোরু-ছাগল সব আছে—এরা স্তানীয়ো (স্থানীয়) মানুষ—তখন মোসলমান নানান জাতের হ্যার বাড়ি তাকে, আর ওই যে নাগা-টাগা আছে তারা নামাজ পড়ে। খাসিয়া, আসামি নানাজাতের মোসলমান। তখন সেইখানে কুড়ি/পঁচিশদিন রইছি পরে আমারে বাল্লুকি জ্বরে পাইল। বাল্লুকি জ্বর কাঁপাইয়া উঠত আবার এই ওউসুদ দিত আবার থাকত—ওই সময় খালি কাইতাম গরম পানি—এইরম করতে করতে একদম হুগায় গিছলাম—ইয়ার পরে কইলাম আর থাকতাম না মানে যাই চইলা—যাইতাম গিয়া বাড়ি—আমারে কিছু ট্যাকা দাও—হ্যাঁ? কয়, ঠিক আছে যাও—বালা কইরা আইস্যো—তাইন দিলা আমারে বিশ ট্যাকা। হ্যাঁ? যাও—তহন এই আসাম ছাড়ছি—ছাইড়া এহন চিন্তা করি কই যাইতাম এহন? তহন সীমান্তে আইছি পরে শিলিগুড়ি এইটা জাগা—হেইখানে রায়োট চলছিল—আমার নিয়ত তো বাড়ি যাইতাম—তো শিলিগুড়ি রইছি ইহানে দেহি আর পনের দিন আর কোন জ্বর হয় নাই বিহানে—এই জায়গায় যে জ্বর—শেষে এইখানথন আইয়া গিলাম গিয়া আপনার দার্জিলিং... দারজিলিং.. ওই ট্রেন আছে... আসামের ভিতরেই দারজিলিং... দারজিলিং গিয়া কনট্রাকটরির কাম খরি... মাইনষে গর বানায় না? বিল্ডিং ওঠায়... হেই কনট্রাকটরি... কন্ট্রাক্টরের লগে কাম করলাম... দেড় টাকার নোট দিত... এই হিন্দু-মুসলমান লেবার নিয়া মাটি কাটিতাম... তা কন্ট্রাক্টরি কাজ দরইন (ধরেন) মাসোখানেক করলাম। শিলিগুড়ির আগে গিছিলাম শিলচর, কাছাড় জেলায়। ওইটা হিন্দুস্তানেই পড়ছে—শিলচরের কাছে সুপারিগুড়ি স্টেশনে একদিন বইয়া রইছি—এক ছেলে আমারে কয়, বাড়ি কই? কই, সিলেট বাড়ি। কয় আমাগো বাড়িও সিলেট। তখন এই ছেলেটা লইয়া গেছে এ্যাক ডাক্তোরের (ডাক্তারের) দারে—ডাক্তোরের ওই ছেলে চা-চো বানাইয়া দেয়, তারপরে ভাত পাক করি দেয় তাকে। তখন আমারে বাবুর্চি বানায় নিয়া দেখাইল—এই একটা চা-র চামোচ, মশলা বাটা, একটা বাতের পাতিলা.. সব পাতিলার মইদ্যে রাইকা চাইল দুইয়া পরিষ্কার কইরা রান্না করা শিকাইল—কয়, যে,

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এইটা শিকাইয়া দেই, চাইর-পাঁচদিনের বিতর দেইকো। দেইকা, সব শিক্যা হালাইয়া তুমি ডাক্তাররে পাক কইরা দেবা। তহন আমি এইসব দেইক্যা কই, না—আমি এইসব পারুম না। এইসব পরিষ্কার করতে পারব না, এইরম পাক করতে পারব না—শেষে এইহানথন আইলাম আপনার দারজিলিং। দারজিলিং গিয়া এক মুসলমান কন্ট্রাক্টর—এই আমরার দিশি আর কি আমরার দেশত বাড়ি তার কাছে কাম নিলাম। দার্জিলিং শহরে আসামিরা মানে সব তো আপা আসামের ভিতর হিন্দুই এখন বেশি। আগে মুসলমান আবাদ করছে গিয়া। এই গেরাম দেশ... দুই/একটা আসামি... এর ভিতর সব মুসলমান গিয়া আবাদ করিয়া কিনা ডেরাডোরা বানাইছে থুইয়া। এই যে-সময় হিন্দুরা হিন্দুস্তান-পাকিস্তান রায়ট করল না, এই রায়টের টাইমে মুসলমান অনেক আইয়া পড়ছে। অরা খেদায় দিচ্ছে। এইসব জাগার হিন্দুরা গিয়া আগে মুসলমান যে আছে বড় বড় লোক তারার ইজ্জত কইরা আইয়ে এই হাটে-বাজারে হিন্দুরা—এইরহম আর কি ডরাইয়া চলতে হয়—ডাগাডুগা (ঢাকাঢুকা) এইসব জাগার হিন্দুরা গিয়া। এরপরে একমাস কাম খরিয়া এই কন্ট্রাক্টরি শেষ—তহন আমি গেলাম গিয়া এই গাড়িতে খরিয়া (করিয়া) আমি গেলাম গিয়া খইলখাতা (কলকাতা)—শিয়ালদা স্টেশন আছে—শিয়ালদা স্টেশন হইল গিয়া আপনার এই আসাম লাইন আর হাওড়া স্টেশন হইল হাওড়া নদী পার হইয়া ওইপার—ঐদিকে দিল্লি, বোম্বাই, কুচবিহার এইসব নানান জায়গা আছে—এইটা নদীর ওই পাড়ে ওই ট্রেন যায় আর এই ট্রেন হইল গিয়া শিয়ালদা স্টেশন আর হাওড়া স্টেশন যায়—হাওড়া স্টেশন এইদিক থনা (থেকে) পশ্চিমদিকে যায়, হ্যাঁ? আর ওখানে শিয়ালদা স্টেশন হইয়া নামলাম—নামার পরে এখন ওখানে এই টাউন দিয়া গুরতো গুরতো (ঘুরতে ঘুরতে) দেখি একটা দোকান খাইবার—খাইলাম গিয়া—আমরার অই সিলেট হইতে আছে না—অই যে যারা অই যে টুকরি-মুকরি বানায় না দেখছেন না—তাগো বা(ভা)ষা বুঝা যায় না—হেই রাস্তার বাষা—সেই খাইবার দোকানের বাসনকোসন দুইতাম—খইলখাতার অই জাগার নাম—রাজাবাজার। রাজাবাজার রইলাম পনরোদিন। রওয়ার পরে এইসময় হিন্দু-মুসলমানে রায়ট লাগছে। তখন দোকানদার করতে আছে কর্মচারী যা আছে সকলরে বেতন দিয়া ক্লিয়ার করতে আছে, কয়, আমরা যেরহম পারি জান বাঁচাইব, তোমরা জান বাঁচাও। তখন এই তারা রইছে—এই মোসলমান বাড়িতে—এই বিহারির বাড়িতে তাকত (থাকত)—বিহারির বাড়ি আর-কি দুকান ভাড়া নিছে—আমরা আইলাম এখন—মালিকেরা দুকান ছাড়াই পালাই পড়ল—দুকান যেরকম থাহে কর্মচারীর ওপর দিয়া দিল। আমি গেলাম শিলাইদহ ইস্টিশন। শিলাইদহ ইস্টিশনে গেছি—গেছি পরে আবার দেখি এই পাঁচ মিনিট পরে পরেই ট্রেন আসে—ট্রেন এম্নে আইয়া ঢোকে আবার প্যাসেঞ্জার লাগে যারা আবার এই সেইসব আনকা ইঞ্জিন প্যাসেঞ্জার ভইরা আমরা আইলাম আবার পিছনে ইঞ্জিনটা টান দিয়া বাইর করে। তা লাইন খুব, একশ লাইন হইব কাতারে। এই পাঁচ মিনিট পরে পরে ট্রেন আসে—নানা জায়গা থন আইতাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রায়ট লাগছে দশদিনে হিন্দু-মুসলমান... তা হিন্দুরা ট্রেইনের সামনে খাড়ায় রইছে। রইছে পরে তারপরে ড্যাগার আছে না? মুসলমান দেইখা দেইখা ওই ড্যাগার তাগো পেটে ঢুকাইয়া তারপরে পাক দিয়া দিয়া যায় আবার দুই/তিনটা নিয়া যায় গিয়া—ওদের এই ডাকগাড়ি আছে না লালগাড়ি? চিঠিপত্র লইয়া যায়? ঐসব ডাকগাড়ির মধ্যে মুসলমানদের লাশ নিয়া উঠায়। তখন এই খালি এইরকম দেইখাতন (দেখা থেকে) আমার জান খালি কাঁপতাছে। তা আমি ছুটো তো মুখে দাড়ি-দুড়ি নাই। বয়স আমার সতের-আঠার বছর বয়স। আমারে হিন্দুরা মুসলমান বইলা ঠার করতে পারে নাই। বয়স আমার সতের আঠার বছর বয়স। তখন শিয়ালদা স্টেশন থেইনা টেরাম (ট্রাম) উইঠা—টেরাম আছে—গেলাম গিয়া হাওড়া। উঠলাম গিয়া তারপর ট্রেনে উঠলাম, জান বাঁচাইবার লাইগা তখন এই ট্রেন যাইব গিয়া দিল্লি। দিল্লি যাইবার ট্রেনে এই বড় বড় খোঁপা বান্ধে না শিখরা? শিখ—এই সব প্যাসেঞ্জার। এখন সিট দখল কইরা রাখে বাঙালিরাই। বিহারি দুই/একজন টেরেইনে। দুইদিন দ(ধ)রিয়া টেরেইন যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে এই সন্ধ্যার সময় কটার সময় জানি টেরেইন দিল্লি গিয়া থামছে। দিল্লি গিয়া স্টেশনে নামি। দেখি এক পাঠান, জাতে মোসলমান, লম্বা, শেরওয়ানি পিন্দনে আর বড়া পাগড়ি থাকে মাথায়, হাতে তা(থা)কে লাঠি—লম্বা লাঠি—পাঠান বইয়া রইছে পিছনদিক ইস্টিশনে—অন্যদিক যাব আর কি ইস্টিশনে বইয়া রইছে—তে এইবারে তো এইখানে পুরি-লুচি এইগুনা এখন খাইয়া আমার পেটে ফির খিদা, বাত (ভাত) কুনোদি (কোথাও) নাই! কইলাম, বাত কুনানে দি (ভাত কোথায়)? পাঞ্জাবিরা আবার দোকানদারি করে এই যে পাঁঠার গোশত পাক করে ওই ইয়েরা শিখরা ওরার দোকান আছে। তো ছেলেপেলে আপাইয়া আইয়া কয়, কেয়া সকতা হ্যায়, হ্যাঁ? খাওগে? তখন আমি কই আমারে চাইর আনার খাবার দ্যাও। তখন ঠোঙার মইদ্যে রুটি দিল আর পাঁঠার গোশত দিল। পাঁঠার গোশত জীবনে খাই না—মোশলমানরা খায় না—লন্ডনে খায়। হ্যাশে একজন রুটি দিছে আমারে। আমি কই, না, খানা চাইছি। খানা কইছি পরে একজন রুটি আর গোশত আইন্যা দিছে—কয়, এইটা খানা না হি কিয়া হ্যায়, আমারে গালি দিছে। হ্যাশে আমি দোকান দিয়া আইছি। আমি সেইসব গি(ঘি)ন্নায় আর খাই নাই আমি। রাস্তার মইদ্যে এই আছে—ময়লা ফেলার গাড়ি, কাগজ-টাগজ হাবিজাবি কাগজ-টাগজ ছড়াইয়া পুরা রাস্তায়—এইটার মধ্যে ফেলায় দিছে—তো এক বিহারি রিস্কাঅলা রিস্কা চালায় যাইতে আছে—আমি কইলাম, ভাই, এইখানে মোশলমানের দোকান কোন্হানে পাওয়া যায়? কয়, আপনি আগ্রা যান! আগ্রা গেলে পাইবেন মোশলমান! এখন এই কত ভাড়া—ছয় আনা দিলাম গিয়া—তারপর মোশলমান দোকান পাইলাম—এই বড় বড় মানুষে ভরা। ওই রিসকাঅলা কইল, চাইল কইবা, খানা কইবা না। নাইলে রুটি আইনা দিব। তো কইবা যে চাউল তো হ্যায়? তো কয় হ্যায়। তখন কইবা দ্যাও। এক প্লেট চাউল দ্যাও। তখন গোশ (গোস্ত) লইবা এক প্লেট, ডাইল লইবা, লইয়া তারপর চা খাইলে চা খাইবা এককাপ। বোঝছান নি? তখন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ্রা গেলাম। এই ধরেন ছয় আনায় দিল্লি থেকে আগ্রা রিসকা যায়। দিল্লি থেকে আগ্রা যাইতে ঘোড়ায় টানা টমটম গাড়িই চলে বেশি। এই রিসকা চোড়লাম—মোধ্যখানে অল্প অল্প রিসকা—মানুষও অল্প। পাইলাম না বাত (ভাত), হ্যাঁ? বাতের চল নাই এইদেশে। খালি এই লুচিপুরি, পরোটা, বাজি (ভাজি), সজি, ডাইল, গুস্ত (গোস্ত) আর এই রুটি তন্দুরি রুটি—ওরা বাত খায় না তো—বাত এক্কেরে বাতের চল নাই—বাত না খাইলে তো মরিয়া যাইবাম গিয়া—এই দশদিন গুইরা (ঘুরে) তারপর এইখানথন দিল্লিথন চইলা গেলাম। যে-দেশত বাত নাই এই দেশত যাই গিয়া মইরা যাইবাম গিয়া। রুটি খাইতে আর বাল্ লাগে না। আগ্রা থন তখন আবার টেরেইনে উঠলাম—হাওড়া ইস্টিশনে আইয়া দেখি পশ্চিমা বেহারি হিন্দুরা ওই রেলগাড়ির সামনে ডেগার হাতে খাড়াইয়া আছে। তখন দাড়িঅলা দ্যাকলে পরে তারা ডাক দিয়া দিয়া ঐহান ডাকগাড়িত আছে না—থার্স্টি সিটির লালগাড়ি—ওইসব গাড়ির মধ্যে নিয়া বরে (ভরে) এইরহম—আর ঐ যে নেপালি পুলিশ আছিল না—অরা টেরেনে উইঠ্যা উইঠ্যা মুসলমান দেইখ্যা বন্দুকের, রাইফেলের ঐযেন ছুঁচালো জায়গাটা থাহে না সামনে হেইটা পাক দিয়া মুসলমানদের পেটে ঢুকাইয়া, পাক দিয়া, তারপর লাথি দিয়া ফালায় দিচে। হেগুলা (সেইসব) আমি আর কইতে পারি না। এইগুলা আমি খালি দেখি আর 'আল্লা' 'আল্লা' করতেছি। আর হিন্দুরা—এই ঘেউয়া কুত্তারা খালি কয় 'রাম', 'রাম', 'রাম'—এইসব। তা শিয়ালদা ইস্টিশানে আইয়া তিন/চাইরদিন বইয়া থাকলাম। এহন ডাকার (ঢাকার) গাড়ি, পূর্ব পাকিস্তানের গাড়ি আর আয় না। চাইরদিন পর গাড়ি আইলে ট্রেনে উঠলাম—ট্রেন গোয়ালন্দো নামাইয়া দিল। মানুষ আইব ইস্টিমারে—ডাকা আইব—নানা জায়গা আইব। ইস্টিমারে উইঠা নারায়ণগঞ্জ আদমজির দিকে যাইয়া দেখি চাকরির দরকার।

এইসব সমুদ্রে আমাদের সমুদ্র-অভিযানের বিবরণী দিয়ে পাঠকদের পীড়িত করা ঠিক হবে না। তবে এইটুকু বলে রাখা ভালো যে, ইস্ট ইন্ডিজ পার হবার পর আমরা প্রবল ঝড়ের টানে ভ্যান ডাইমেন আইল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম দিকে ভেসে গেলাম। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে, আমরা ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশ অতিক্রম করে দক্ষিণে খানিকটা চলে এসেছি। কঠোর পরিশ্রম আর খারাপ খাদ্য আমাদের বারোজন নাবিকের মৃত্যুর কারণ হল আর বাকিরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। নভেম্বরে এখানে গ্রীষ্ম আরম্ভ হয়। পাঁচ তারিখে আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের একজন নাবিক জাহাজ থেকে মাত্র আট কেবল মানে তিনশো ফুট আন্দাজ দূরে একটা পাহাড় দেখতে পেল। কিন্তু বাতাস এত প্রবলবেগে বইছিল যে পাহাড়টা কিছুতেই এড়ানো গেল না, জাহাজ সজোরে সেই পাহাড়ে ধাক্কা মারল। আমি এবং আরো পাঁচজন নাবিক সমুদ্রে একটা নৌকো নামাতে পেরেছিলাম তাই কোনোরকমে একটা বাতাসে এসে আমাদের নৌকোটাকে ধাক্কা দিয়ে এলোমেলো করে দিল। আমার নৌকোর সঙ্গীদের কী হল কিংবা যারা পাহাড়টার উপর পালাতে পেরেছিল কিংবা যারা জাহাজে থেকে গিয়েছিল, এদের সকলের ভাগ্যে কী ঘটেছিল আমি কিছুই জানি না, তবে আমার বিশ্বাস তারা সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার ভাগ্য অন্যরকম যেজন্য আমি সাঁতার কেটে বা বাতাস ও জোয়ারের ধাক্কায় এগিয়ে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছিলাম। মাঝে মাঝে আমি পানিতে পা ডুবিয়ে পানির গভীরতা জানবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তল পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, হাতপা আর চলছে না তখনই আমি পায়ের নিচে জমি পেলাম, ইতোমধ্যে ঝড়ও বেশ কমে গেছে। সাগরের গভীরতা কম এখানে। প্রায় মাইলখানেক হেঁটে ডাঙায় উঠলাম। আমার মনে হল এখন সন্ধ্যা আটটা হবে। ডাঙায় উঠে আধ মাইলখানেক হাঁটছিলাম কিন্তু কোনো বাড়ি বা বাসিন্দা চোখে পড়ল না, তবে আমি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে সেগুলো আমার নজরেই পড়েনি। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর বেশ গরম মনে হচ্ছিল, জাহাজ ছাড়ার আগে আধ পাঁইট ব্র্যান্ডিও খেয়েছিলাম, এইসব কারণে ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছিল। আমি ছোট ছোট ও নরম ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। এত গভীরভাবে আমি কখনো ঘুমাইনি। মনে হয় আমি ন ঘণ্টারও বেশি ঘুমিয়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। আমি উঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু একি? আমি নড়তে পারছি না কেন? কারণটা বুঝলাম। আমি চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। আমার দুই হাত ও দুই পা আর আমার মাথার লম্বা চুল কেউ বা কারা জমির সঙ্গে বেশ মজবুত করে বেঁধে দিয়েছে। আমার বুক ও উরুর উপর দিয়েও বেড় দেয়া হয়েছে। পাশ ফিরতে পারছিলাম না তাই উপর দিকেই চেয়ে ছিলাম। রোদ ক্রমশ গরম হচ্ছে, আলো চোখকে পীড়া দিচ্ছে। আমাকে নিয়ে কারা বুঝি কিছু বলাবলি করছে কিন্তু আমি যেভাবে শুয়ে আছি তাতে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটু পরেই আমার মনে হল আমার বাঁ-পায়ের উপর কিছু-একটা জীবন্ত প্রাণী চলে বেড়াচ্ছে এবং সেটা আস্তে আস্তে আমার বুক এসে উঠল এবং প্রায় আমার চিবুকের সামনে এসে থামল। যতটা পারি চোখ নামিয়ে আমি দেখলাম সেটা মনুষ্যাকার একটা প্রাণী, বড়জোড় ছ ইঞ্চি লম্বা, হাতে তীর, ধনুক, পিঠে তীর রাখবার তূণীর। ইতোমধ্যে আমি দেখলাম প্রথম খুদে মানুষটিকে অনুসরণ করে আরো চল্লিশজন (আমার তা-ই মনে হল) এগিয়ে আসছে। আমি তো ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এবং এত জোরে চিৎকার করে উঠলাম যে ওরা ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করল। পরে শুনেছিলাম যে আমার দেহ থেকে নিচে লাফাতে গিয়ে কয়েকজন আহত হয়েছিল। যাহোক একটু পরে তারা আবার ফিরে এল এবং আমার পুরো মুখখানা দেখার জন্য একজন সাহস করে এগিয়ে এল। সে প্রশংসার ভঙ্গিতে দুহাত ও চোখ তুলে পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল 'হেকিনা দেগুল'। তার সঙ্গীরাও শব্দ দুটি সমস্বরে কয়েকবার উচ্চারণ করল কিন্তু তার যে কী অর্থ তা আমি জানি না। কী তারা বলতে চাইছে? পাঠকরা বুঝতেই পারছেন আমি বেশ অস্বস্তিতেই সারাক্ষণ শুয়ে আছি। অবশেষে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টায় আমি বলপ্রয়োগ করলাম ফলে যেসব গোঁজের সঙ্গে সরু দড়ি দিয়ে ওরা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল সেগুলো মাটি থেকে পটাপট উঠে গেল। দড়িও ছিঁড়ল। বাঁহাতটা আগে মুক্ত করলাম। এবার বুঝলাম ওরা আমাকে কীভাবে বেঁধেছে। কিন্তু মাথা তুলতে পারছি না, বাঁদিকের চুলগুলো কোথাও আটকাচ্ছে তবুও জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলাম, বেশ আঘাত লাগল কিন্তু উপায় কী? যাহোক মাথাটা এখন ইঞ্চি দুয়েক ঘোরাতে পারলাম। তাদের একটাকেও ধরবার আগেই তারা আবার পালিয়ে গেল এবং এবারও আগের মতো সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল। চিৎকার থামবার পর শুনলাম একজন জোরে বলছে 'তোলগো ফেনাক'। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম আমার বাঁহাতের ওপরের দিকে শখানেক তীর এসে বিঁধল। মনে হল যেন শত শত সুঁচ ফুটল। তারপর আমরা ইউরোপে যেমন বোমা ছুড়ি ওরাও সেইরকম আকাশের দিকে কিছু ছুঁড়ল এবং তা ফেটে আমার উপর কিছু অংশ পড়তে লাগল কিন্তু যা পড়ল তা এতই হালকা যে আমি কিছুই অনুভব করলাম না। তীরবৃষ্টি শেষ হল, আমি ব্যথা অনুভব করছি, বাঁধন খুলবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করছি। এমন সময় প্রথমবার অপেক্ষা আরো বেশি পরিমাণ একঝাঁক তীর এসে আমাকে বিঁধল।

আদমজি মিলে আইয়াথন রোল হোল্ডিং ডিপার্টমেন্টে কাজ নিলাম। রোল হোল্ডিং ডিপার্টমেন্টে একটা বড় লোহা আছিল। এইটা গরম অইয়ে মিশে আছে তো—কারেন্টের দ্বারা মানে ঐটা গরম অয়—গরম অইলে পরে তখন ঐটা ঐ য্যান ঐ বাঁধন থনে অইন্য আগুনে আরো টাইয়া টুইয়া লইয়া গেছে। সাইট সত্তুর ট্যাকা আশি ট্যাকার তখন ঐ সব সুতা একখানা করিয়া না অইটা অই লোহার রুলারটার মধ্যে জমা না দেইখা ফিট করছে—আর সব তেঁতুল আছে না? তেঁতুল বিচি গুঁড়া করিয়া, পানিতে ভিজাইয়া তখন এই তেঁতুল বিচিরা তখোন এইসব সুতাগুলি তেঁতুল বিচির লগে এম্নে রাখতে আছে। রাখিয়া তখন এই তেঁতুল বিচির লগে কষটা না খুলে টাইট হইয়া যায় বিতরে (ভিতরে)। তেঁতুল বিচি লাগায় তার মইদ্যে তখন এই রুলারটার মইদ্যে সুতা যাইতে আছে এম্নে আর সুতা আ-স্তে-আ-স্তে এই রুলারের লগে লগে। গোরে (ঘোরে), রুলার আ-স্তে-আ-স্তে এম্নে এম্নে এই নড়তে আছে। এই টানা যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এই সুতা করল কি—আর একটার মদ্যে—আর একটা এ-ও বড় রুলার, হেইটার মদ্যে গিয়া প্যাঁচে। তখন হেই রুলার প্যাঁচা হইয়া গেলে এইটা নিয়া তাঁতে লাগায়। তাঁতের মেশিনে তখন সব সুতাগুলি গিট্টু দিয়া দিয়া তারপরে লইয়া যাইয়া তখন ডাইং করতে হয়। এই বস্তা বানায়। এই বস্তা বাইর হইতে আছে ইহান থনে—বস্তা বাইর হইলে আবার একদল বইছে আপনার বস্তা কাইট্যা আপনার এই চট বানায়। চটের বস্তা বানাইতে আছে। মেশিন আছে। মেশিনে সেলাই করিয়া করিয়া যাইতে আছে। এই বস্তা তারপর সব একজাগা নিয়া বড় বান্ডিলো (বান্ডিল) পনের মণ, বিশ মণ এক/একটা গাঁটরি বানায়। এইসময় আবার অই ঠেলাগাড়ি আসে—যে যে লাইনে আছে, সেই সেই লাইনে নিয়া যায়। হেইথন আবার আর এক জাগা নিয়া যায়—নদীর কিনারে। নদীর কিনারে আবার ঐ ক্যানেল আছে না—ক্যানেল দিয়া বার করিয়া স্টিমারে উঠায়—এইরহম কাজ। তা এই হইল রোল হোল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কাজ। আদমজির রোল হোল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কাজ। আদমজির রোল হোল্ডিং সেকশনে আমি কাজ করলাম দশ/এগার বছর। মালিক আছিল পশ্চিমা, বোম্বাইওয়ালা। করিম সাব। লেবারদের দেখার জইন্য ওনি মুনলাইট সিনেমাহল দিছে। মানুষে আগে নারায়ণগঞ্জো যাইত সিনেমা দেখতে বাসভাড়া দিয়া। এইটা হবার পর থেকে আদমজিতেই দেখত। আর নারায়ণগঞ্জো যায় না। মিলের এক সাইটে বিহারিরা তাকত, আর এক সাইটে বাঙালিরা। এহন দ(ধ)রেন মিলে সর্দারি মানে যত বড় বড় কাম, স-ব বিহারি করে। আর নিচের যত কাম, সব বাঙালি করে। তখন একবার এক বিহারি সর্দাররে এক বাঙালি লেবারে মারছিল। তখন অই বিহারিরা কয় কি আইজকে বাঙালিরে শেষ করব। তখন আমরা যে-সময় মানে মিলের গেট দিয়া ঢুকব, ঐসময় বিহারিরা মানে একটা কাপড় আছে না, কালাকাপড়? সেফটিপিন দিয়া কালাকাপড় গাঁথছে বুকের উপর। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবটি ওরা গ্যাছে। তাঁত চালায় না এতটুক ছুরি আছে? আরো অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের ছুরি নাই মানে ওরা ভোজাল (ভোজালি ছুরি) নিয়া গেছে। ই নিয়া গেছে। এখন তিনটার সময় কাজ। ওরা মিলের দরজা বন্ধ কইরা দিছে। বাংগালিরা তো জানে না এইরম যে রায়োট করবে ওরা। মারামারি ...তখন মিলের দরজা বন্ধ কইরা দিছে। তারপর এই লাগল বেহারি-বাঙালি মারামারি কাটাকাটি। নারায়ণগঞ্জো ডাকাডুকা (ঢাকায়) যত হাসপাতাল আছে না—সব জায়গার মদ্যে চট ভইরা, বস্তা ভইরা বাঙালিগো লাশ আনতাছে। আধামরা অনেক। আনার পর মরিয়া গেছে। লাশের অবাব (অভাব) নাই। স্ট্রেচারে তুইল্যা আনতাছে। আমার গায়েও গুলি লাগছিল। পিস্তলের গুলি লাগছিল। হাতোত (হাতে) গুলি লাগছিল, বোজজেন? শার্ট পাড়িয়া (ফাড়িয়া), বান্দিয়া একজনে মিটফোর্ড হাসপাতাল লইয়া গিছিল। তারপরে ভাসানী মৌলানা আইছে আমরারে দেখতে। তা এই মিল বন্ধ হইয়া গেল। বাঙালি-বিহারি কাইজ্যা লাগার পরে মিল বন্ধ হইয়া গেল। স্বাদীনের যুদ্ধের সময় বিহারি-বাঙালি কাটাকাটি আরো বাইড়া গেল। দেশ স্বাদীনের পরে আদমজি ফিরা এক দোকানে আমার আঠারশ টাকা জমা ছিল। জমা টাকা নিয়া শ্যাষে ডাহা (ঢাকা) আইলাম পর রিসকা বানাইলাম। ছয়শ ট্যাহায় একটা রিসকা। অর্ডার দিলাম নাজিরাবাজারে। রিসকা বানাইবার অর্ডার দিয়া তিন/তিনটা রিসকার মালিক হইলাম। তারপরে নাজিরাবাজার ফজলু মাহাজন কইরা এক মাহাজন। তার দুইখান দালান আছে রামপুরা আর সদরঘাট। তাইনের (তার) বারোটা রিসকা আছে। আর মাজেদ সর্দার এমপি আছিল না আগে? ওই এমপি'র বাড়ির পাশে তার বাড়ি। ওনি আগে ট্রাক চালাইতেন। ওনি আমারে পুরানা ঢাকায় রিসকা চালাইবার সব রাস্তা চিনাইলেন। বংশাল, পুরানা পল্টন, নয়াবাজার, বাদামতলি, জিন্দাবার (জিন্দাবাহার)... ম্যালা রাস্তা। অহন আমারে মানুষে বিয়া করায়। কয়, আপনার ববিষ্যৎ (ভবিষ্যৎ)... আমি কই যে, না, আমার বাড়িগর (বাড়িঘর) নাই। তখন মানুষে আমারে কয় আপনার ববিষ্যৎ (ভবিষ্যৎ) তো কোনো সুখ-শান্তি অইব না—আপনি বিয়া করেন—বাড়িগর নাই, আপনি বাড়া (ভাড়া) থাকেন... আপনার সয়-সন্তান (সহায়-সন্তান) হইবে—এমন সোজা মাইয়া যে কোনোদিন কইব না এইটা আনিয়া দাও কি ওইটা আনিয়া দাও—তুমি হারাদিনে যা আনিয়া দিবে তাই খাবে। তা শ্বশুর-সাব দ্যাশে তাকত। আমার শ্বশুরবাড়ি অইল কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিং। বউয়ের বড়বাই (বড় ভাই) অই যে অই সুটকেস বানায়, তারপরে জুতা বানায় এইসব ডাকাত (ঢাকা) শহরে বেচে... সব বাড়ি আর গরে গরে (ঘরে ঘরে), মহল্লায়। এইরহম সময়ের ভিতর বাত (ভাত) দিত—শ্যাষে বাতের (ভাতের) মেস করছিল—তহন এই মেয়ে আইছিল এইখানে। তখন মানুষে আমারে কইল তুমি এরে বিয়া করো। তোমার সুখ-শান্তি হইব, সয়-সন্তান হইব। তোমার অসুখ-বিসুখ হইলে কে দ্যাখবাইন? এইয়া আমারে কয়। তো বিয়ার পর এক বাড়িতে উঠলাম। হেইসময় বিশটাকা গরবাড়া (ঘর ভাড়া)। এই গর (ঘর) বাড়া (ভাড়া) নিলাম কিন্তু নদীর ওপার। মানে কালিগঞ্জো তানার (থানার) ঝাউবাড়ি ওয়ার্ড, গুলামবাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিয়ন। নৌকায় বুড়িগঙ্গা পার অইয়া যাইতে হয়। নদীর ওপার গর। একরুমের গর। বিশ টাকা বাড়া এখন সাতশ টাকা। এক মেয়ে দুই ছেলে। মেয়ের বয়স আঠের/উনিশ। বিয়া দিছি আর পাঁচ কেলাস পড়াইছি। ছোট ছেলেটা বুবা (বোবা), ছোটকালে মানে ঠাণ্ডায় শিশু তাকতে... শীতের দিন আইছে মা'র এক সাইডে গুমায় (ঘুমায়) তাকত—ঠাণ্ডা লাগিয়া নিউমুনিয়া (নিউমোনিয়া) হইল গিয়া—এখন মাইনষেরে দেখাই, কবিরাজরে—হেয় কিছু কইতে পারে না—গিয়া গিয়া মোর টেকা খায় খালি কবিরাজে—শ্যাষে নিয়া গেলাম শিশু হাসপাতাল, মগবাজার—মরবার টাইমে—শিশু হাসপাতাল লইয়া গেলাম এখন বাচ্চা মইরা যাইব গিয়া—তখন এক কিরিস্টান (খ্রিস্টান) হাসপাতাল ছিল—তখন কিরিস্টানরা আছে ডাক্তার। মগবাজার তখন গ্যাছেগি তো'। বিছরাইছি হাসপাতাল। দুইমাস না তিনমাস আমার পরিবার আর পুলারে লইয়া আছিলাম। তখন ডাক্তারগো লগে লগে দানমণ্ডি (ধানমণ্ডি) নিয়া এক্স-রে করাইয়া বাইচ্চারে ওউষুদ দিল। এই মেশিনের মধ্যে যায়া দম আটকা যায় গা, মইরা যায় গা—মেশিনের মধ্যে নিয়া তারপর হাত দিছে। হাসপাতালের কেরেস্টান নার্সরা আছে। তারাই আবার দেখশোন করে, সব করে। এই হাসপাতাল লইলাম, তারপর বাচ্চা বাঁচছে। তিনমাস পর্যন্ত ওউষুদ দিচে, তিনপদের ওউষুদ। সকালে একবার, দুপুরে আর বিকালে এক/একবার। চামচে গুইল্যা খাওয়াইতে হয়। সেই বাচ্চা ভালো হইছে। এখনে যে বাচ্চা বড় হইছে পরে সেই বাচ্চা বোবা। বড় ছেলেটাও বলদ। আর রিসকাও নিজের একখানও নাইক্যা। চুরে (চোরে) লইয়া গেল একটা, অপারেশনে গেছে একটা, অপারেশনের পর মানে হার্নিয়া অপারেশন খরলাম যখন, ওউষদ টৌউষদ লউলাম—তখন কইল তিনমাস কোনো কাম করতে পারবা না—চলা-ফিরা করতে পারবা না—তখন সংসার চালাইতে আর একটা বেচিয়া দিলাম—এইটা বিক্রি কইরা খাইলাম। পুরানা মানে সেকেন্ডহ্যান্ড হইয়া গেছিল তো রিসকা—বেইচা দেড়হাজার টাকা পাইলাম। আজকা দরইন চোদ্দ/পনর বছর আমি রিসকা চালাই। এর মইদ্যে যা আগে তো খামাইতাম (কামাতে) পারছি এহন তো খাওন কইমা গেছে। চোখের পাওয়ার গেছে গা—অহন এই অসুবিদা। আগে তো দুপুরে রিসকা চালায় গেছি গা আবার বিকালে বাইর করছি গাড়ি। আস্তে আস্তে এখন সব সাউন্ড কইমা গেছে—চোখের পাওয়ার গেছে গা—মুখের কথা না পরিষ্কার—চোখের পাওয়ার, দাঁত পইড়া গেছে গা—সাত বছর আগে চশমা ছাড়া দেকতাম—এখন আর দেখি না—আগে অনেক দূর দেখতাম—পাঁচশো পাওয়ারের—পয়লা দিছিল দেড়শো পাওয়ারের—দুইবছর পরে দেলো তিনশো পাওয়ার—আরো দুই বছর পরে দিল পাঁচশো পাওয়ার—এই যে পাওয়ার, এখন ডাক্তারে কয় আপনার চোখে জাল পড়ি গেছে, পরদা মোটা হইয়া গেছে। এখন অপারেশন করলে দেখতাম না। কারণ আমার শরীরে রক্ত নাই, বোঝছেন? তারপরে এহন অন্ধ হইয়া যামু। অহন তো রাইত হইলে বাত্তি জ্বলে না চাইরদিকে? এই বাতিগুলো আইয়া পিছনে, আইয়া কেমুন যেন কম দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। আর গাড়ির বাতি সামনে দিয়া আইনে উলটা দেহা যায় না। সূর্যের দিকে চাইলে সেইরকম সেইরকম। এই দরেন যেইখান আর দেহি না সেইহানে হাত দিয়া দেখি—এই রিসকাটা অহন বাড়া (ভাড়ায়) চালাই। আধাবেলা চালাইলে বাইশ টাকা দিতে হয় আর পুরাদিন চালাইলে চল্লিশ/বেয়াল্লিশ টাহা মাহাজনরে দিতে হয়। আয় ইনকামের ঠিক নাই। রিসকার তো কোনো মাপ নাই। কোনোদিন দশ টাকা বেশি পাই, কোনোদিন বিশ টাকা বেশি। কোনোদিন না-ও পাই। সংসার না চললে তো হাওলাত-উওলতি কইরা খাই। তয় তিন/সাড়ে তিন বচ্ছর আগে একবার দেশের বাড়ি গিছিলাম। হইল কি, একদিন আমার বাড়িথনে আট-দশ মাইল দূর গোয়ালাবাজারে (যেয়াথা মানুষ ব্যাটারি কারবার করে, বালা বালা তারতুর বানায়) রিসকা চালাইতে আছি। তখন আমার এক দেশের মানুষ—আমার বাড়িথনে ছয়/সাত মাইল দূর—গোয়ালাবাজার তাইন বাড়ি—এই তাইন এই খারবার করইন তো আমি গুপীবাগ তাইনরে লইয়া ফালাইছি। গুপীবাগ লইয়া গেছি রাইত দশটা-এগারটার সময়। তখন কয়, যাইবা ভাই? ব্লু ডাকা (ব্লু ঢাকা) হোটেল? তো কই, যাইমু। তো সে আবার জিগায়, তুমি রিসকা চালাও ক্যান? তোমার পোলাপান নাই? কই, আছে, দুটা। জিগায়, বাড়ি কই তোমার? কই, 'সিলেট'। কয়, সিলেট? ইতা কিতা কও? তোমার বাড়ি সিলেটে—হী অভাবে আইছ? আমি কই যে বাড়িগর ছাড়িয়া আইছি কতকাল আগে। জিগায়, তুমি তানা (কোন থানা) বাড়ি? বলি, নয়াপাড়া, বালাগঞ্জো তানা। কইলাম, মুফাজ্জল করিম আমার আত্মীয় লাগে, যার নাকি লন্ডন গ্যাছে পাঁচ ছেলে/মাইয়া। তানে নাম কইলাম। কয়, এই কী বললা তুমি? তারা তো বড়লোক। কুটিকুটিপতি। আর তুমি ক্যান রিসকা চালাও? তুমি জলদি বাড়িত যাও পুলাপান লইয়া। আমি কই, না, আমি এখন বুড়া হইছি—আমি এই অবস্থায় আইছি—অহনে মানে মুখ দেখাইতাম না। শ্যাষে মানে অইল কি মানে আমারে পঞ্চাশ টাকা দিল—দিয়া কয় কি কালকে তুমি এই ইস্টার সিনেমা হল আছে না সদরঘাটের ওইদিকে—ইস্টার সিনেমা হলের ঐখানে দেখবা ওই পানটা ব্যাটারির দোকান—মার্কেট আছে—এই মার্কেটে গিয়া কইবা পানটা ব্যাটারির দোকান কোনটা। মানষে দেখায় দিব। বলল, কাইলকে দশটা বাজে আইতে পারবা এইখানে? বলি, হ্যাঁ, পারমু। আমি তো নদীর এপার থাহি তা বলি আইতে পারমু। পর গেছি। গেছি পরে ঐ দুকানে উনি গেছইন। ঐ দোকানে মাল নাই। তহন কইলা কি এখন তুমি এইহানে বাড়ি চলো না। কই কি, আমি এই বয়সে যাইতাম না। আর পরথমে পারি নাই যুহদ্দে (যৌবনে) পারি নাই এহন এই বুড়াকালে কী করিয়ুম? তেই তাইন কইলা ইখানে কোনহানে তাকো? বলি, অমুক জাগায় তাকি। ইতানি তাইন লেইক্যা নিল। লেইক্যা কয়, চলো। কয়, না গেলে তোমার অপবাদ দিমু। গাইলায়। তো আমি মনে করলাম যে আট-দশ মাইল দূর বেটার বাড়ি আমরার বাড়ি থিয়া। যাইব গিয়া। শ্যাষে এই মানুষটা গ্যাছে গিয়া আমার ওই দাদাজান যে দুইটা বাইগ্না পাইলা জায়গা দিছিল, সেই বাইগ্নার বংশের যারা এখন বড়লোক তারার কাছে। তারার পুয়া-পুড়ি ছউদি লন্ডনত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে না? ট্যাকার অভাব নাই। তাইন একটা বাজার করছে তারার বাড়ি থেইকা সামান্য দূরে, ময়নাবাজার। আগে আছিল গোয়ালগিরর বাজার—অই বাজারও আছে আর ওই সামনে একটা বাজার করছে তারা। ময়নাবাজার। তো এই বাজারে তারা আইয়া আড্ডা দেয়। যে মানুষটার কথা কই আপনারে, উনি আয়। তো তারার তো কুটিকুটিপতি তারার লগে চিনাজানা। তখন উনি আমার দাদার বাইগ্নার পুয়ারে কয়, এইরকম এইরকম আপনার কোনো মানুষ আছে নাকি ডাকাত (ঢাকায়) বুড়া মানুষ যে রিসকা চালায়? যে চোকে দ্যাখে না—বুড়া—আপনার কতা কইল? আপনার কী লাগে? কয় যে, আমার গুষ্টির একজন চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বছর দরিয়া কোনো খোঁজ-পাত্তা নাই! তখন কইলা যে বহুৎ কষ্ট করতাছে তখন উনি আর কিছু ভালো-মন্দ কইলেন না। শ্যাষে লাগা উত্তরর বাড়ি আমার মা'রে যেখানত বিয়া দিছে মা মা'র হেইরো (ঘরে) একটা বইন অইছে—হেই বইনরে বিয়া দিছে—বইনরে বিয়া দিছে পরে কুলাউড়া হেই বইনের বাপ মারা গেছে। বাপের জায়গা পাইছে এই সতালো (সৎ) বইনে। পাইয়া আর জামাই বাড়ি যায় নাই। বাপের বাড়িই থাকতাছে। এই শেষে এই আমার এই সতালো বইনের চাচার বড় বাই, তারার ওনারে আমি দেখি নাই। ওরা যে হইছে তারার বিয়া-উয়া করে নাই হেইসময়—চাচার বড়বাই মানে সতালো বইনের চাচার বড়বাই তারা আগেরে বড়লোক। তহন ময়নাবাজারে আলাপ যখন করতাছে বংশের বাড়ির সেই লোক তখন আমার কতা কইলে তাইলে চিনা কন, হেরে বাড়িত যেরকম পারেন পাঠান, বোজলেন?

আমার মা'র কাবিনের জাগা তারার কাছে আছে। এই কাবিনের দলিল। তখন গেছি পরে তাইন কয় যে, এই টাইমে আইছ? আমি তো মাস পনের দিনের ভেতর আবার লন্ডন যাইতাছি গিয়া।

দাদার বাইগ্নার ছেলে কয়, 'জুয়ানিকালে রেজিস্ট্রি অফিসে টিপসই দিয়া জমি তো বেইচ্যা গেছ। এখন আইছ, অহন কী করবা? চোখে দ্যাখো না, গিরস্থি করতে পারবা না। তাইলে এই আইছ যখন, এই দুইটা পুলাপান লইয়া, এই দুইটা মাদ্রাসায় পড়ুক। তুমি অহন আব্বার লগে আব্বা যেদিকে যায়, সেদিকে তাকো (থাকো)—নামাজনুমাজ পড়ো, খাও আর পুলাপান দুইটারে দিয়া দাও মাদ্রাসায়। তয় তোমার বিবি আর বুবা পুলা ডাকাতে (ঢাকা) আছে, ডাকাতেই তাক (থাক)। যেমনে পারে তেমনে থাক।

বোজজেন? তা তো আর হয় না। আমার বাপ-দাদার জাগা আর তোরা অংশ দিবি না? তোরা তো ভাসানী। তোরা আমারে এই কতা কস? আমার দাদা দুইটা বাইগ্না পাইলা জায়গা দিছিল, এই বাইগ্নার বংশ, আর আমার বাপ-চাচারা তো তিনোবাই (তিনভাই) অল্পবয়সে মরিয়া গেল। ফিরা আইলাম ডাকা। কেরানীগঞ্জো থন নদী পার অইয়া প্রত্যেকদিন নাজিরাবাজার আহি। নাজিরাবাজার থেনে মাহাজনের গদি থন রিসকা লইয়া জিন্দাবার, বংশাল, নয়াবাজার, পুরানা পল্টন হইয়া এই আপনাগো ভার্সিটিত আসি। পুলাপান গো টাইনা লইয়া বেড়াই। ...আমেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজবাহাদুর ও তাঁর মন্ত্রীদের সমর্থন লাভ করে আমি আমার যাত্রার দিন আরো এগিয়ে আনলাম। আমি লক্ষ করলাম যে যাতে আমি তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে পারি সেজন্য সভাসদরাও উদ্যোগী হয়েছে। নৌকোর একটা পাল তৈরি করবার জন্যে পাঁচশত কর্মী নিযুক্ত হল। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে লাগল। দ্বীপে প্রাপ্ত সবচেয়ে মজবুত কাপড় সংগ্রহ করে এবং সেগুলো বারো তেরো ভাঁজ করে কাজচলা গোছের দুটো পাল তৈরি করা গেল। পাল খাটাবার জন্যে মোটা দড়ি দরকার। দশটা, কুড়িটা এমন কি তিরিশটা পর্যন্ত দড়ি পাকিয়ে মোটা ও যতদূর সম্ভব লম্বা দড়ি তৈরি করলাম। দ্বীপে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বড় একটা পাথর সংগ্রহ করলাম যেটা আমার নোঙরের কাজ করবে। নৌকোতে লাগাবার জন্যে এবং অন্য কাজের জন্যে আমাকে তিনশোটি গোরুর চর্বি যোগাড় করে দেয়া হল। মাস্তুল ও দাঁড় তৈরি করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। বড় বড় গাছ কেটে তাও তৈরি করা হল। রাজাবাহাদুরের ছুতোর মিস্ত্রিরা সেগুলো মসৃণ করে দিয়েছিল।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে প্রায় এক মাস সময় লাগল এবং বিদায় নেবার জন্যে আমি রাজাবাহাদুরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। রাজাবাহাদুর এবং রাজপরিবারের সকলে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। রাজাবাহাদুরের হস্ত চুম্বন করবার জন্যে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। অনুগ্রহ করে তিনি ও পরে মহারানি ও রাজকুমাররাও তাঁদের হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাজাবাহাদুর আমাকে পঞ্চাশটি থলি উপহার দিলেন। প্রতি থলিতে ছিল দুইশতটি স্প্রাগ মুদ্রা। তিনি তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব ছবিও দিলেন। এগুলো আমি সযত্নে আমার একটি দস্তানার মধ্যে ভরে রাখলাম। বিদায়-অনুষ্ঠানের দীর্ঘ বিবরণী পাঠকদের পীড়িত করতে পারে এজন্যে আমি বিরত হলাম।

AMARBOI.COM

নৌকোতে আমি একশোটি বলদ ও তিনশো ভেড়ার মৃতদেহ বোঝাই করলাম এবং অনুরূপ পরিমাণে রুটি ও সুরা এবং চারশো বাবুর্চি যত মাংস রান্না করে দিতে পারল তত পরিমাণ মাংস। আমি সঙ্গে নিলাম ছটি জীবন্ত গোরু ও দুটি ষাঁড় এবং অতগুলো মাদি ও পুরুষ ভেড়া। দেশে যদি ফিরতে পারি তো ওদের বাচ্চা উৎপাদন করাব। ওদের খাওয়াবার জন্যে অনেক বোঝা খড় ও দানা নিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল বারোজন স্থানীয় নরনারী সঙ্গে নেভার কিন্তু তাঁদের অনিচ্ছা দেখে আমি বিরত হলাম, তথাপি রাজাবাহাদুরের লোকেরা আমার পকেটগুলো একবার দেখে নিল, কৌতুক করেও আমি কাউকে তুলে নিয়েছি কি না দেখবার জন্যে।

এইভাবে প্রস্তুত হয়ে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের চব্বিশ তারিখে সকাল ছটায় আমি পাল তুলে দিলাম। উত্তর দিকে চার লিগ যাবার পর উত্তর-পুব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসে আমার নৌকোর পাল ফুলে উঠল এবং সন্ধ্যা ছটা নাগাদ উত্তর-পশ্চিম দিকে আধ লিগ আন্দাজ দূরে একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পেলাম। দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং বাতাসের বিপরীত দিকে গিয়ে নোঙর ফেললাম। দ্বীপে নেমে বুঝলাম ওখানে মনুষ্যবাস নেই। কিছু আহার করে বিশ্রাম করতে লাগলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বোধহয় ছঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম কারণ আমি জেগে ওঠার আর দুঘণ্টা পরে ভোর হল। রাত্রিটা বেশ পরিষ্কার ছিল। সূর্য ওঠার আগেই আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম। লক্ষ করলাম বাতাস অনুকূল অতএব নোঙর তুলে নৌকো ছেড়ে দিলাম। আগের দিন যে-দিকে যাচ্ছিলাম সেইদিকেই চললাম। সঙ্গে একটা পকেট-কম্পাস ছিল, সেই ছোট্ট কম্পাস আমায় দিক ঠিক করতে সাহায্য করছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, সম্ভব হলে এমন একটা দ্বীপে পৌছানো যেটা ভ্যান ডাইমন দ্বীপের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। আমার ধারণা এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা দ্বীপ ওদিকে আছে। কিন্তু সারাদিনেও কোনো দ্বীপ আবিষ্কার করতে পারলাম না। পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ আমি হিসেব করে দেখলাম যে ব্রেফুসকু দ্বীপ থেকে চব্বিশ লিগ পর্যন্ত এসেছি আর ঠিক সেই সময়ে আমি দক্ষিণ-পূবদিকে জাহাজের পাল দেখতে পেলাম। আমি তখন যাচ্ছিলাম পূবদিকে। আমি সেই জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে যেতে লাগলাম। তখন বাতাসের বেগ কমে আসছে। তবুও আমি নানাভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। আধঘণ্টা বাদে আমার চেষ্টা সফল হল। ওরা আমাকে দেখতে পেল এবং তা জানিয়ে দেবার জন্যে একটা পতাকা তুলল আর সেইসঙ্গে করল কামানের আওয়াজ। তখন যে আমার কী আনন্দ হল তা কী বলব! আমি আবার স্বদেশে ফিরে যেতে পারব, আবার আমার চেনামুখগুলো দেখতে পাব। জাহাজ তার গতি কমাল। তারিখটা আমার মনে আছে, ২৬ সেপ্টেম্বর। জাহাজের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পাঁচটা বেজে গেছে কিন্তু ছটা বাজেনি। পতাকা দেখে যখন চিনতে পারলাম যে জাহাজটা ব্রিটিশ তখন আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠল। গোরু ও ভেড়াগুলো আমার পকেটে নিলাম এবং খাদ্যদ্রব্যসমেত সমস্ত মালপত্তর জাহাজে তুললাম। জাহাজখানা ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ, উত্তর এবং দক্ষিণ সমুদ্র দিয়ে জাপান থেকে আসছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন মি. জন বিডেল ডেপ্টফোর্ডের মানুষ, অতি সজ্জন ব্যক্তি এবং জাহাজচালনায় দক্ষ। আমরা এখন দক্ষিণে ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশে রয়েছি। জাহাজে প্রায় পঞ্চাশ জন এবং আমার একজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, তার নাম পিটার উইলিয়মস। পিটার আমাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় আমার কিছু বাড়িয়ে বলল। ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে আসছি এবং কোথায় যেতে চাই। আমি যখন সংক্ষেপে সবকিছু বললাম তখন তারা ভাবলেন আমি বাজে কথা বলছি কিংবা সমুদ্রে বিপদে পড়ার ফলে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি পকেট থেকে যখন জীবন্ত গোরু ভেড়াগুলো একে একে বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম তখন তো তারা অবাক। তারা বুঝল আমি ওদের ধোঁকা দিইনি। ব্রেফুসকুর রাজাবাহাদুর আমাকে যে-স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো এবং রাজাবাহাদুরের পূর্ণাবয়ব ছবিটি এবং ঐ দুই দ্বীপের কিছু অদ্ভুত জিনিস ক্যাপ্টেনকে দেখালাম। একশত স্প্রাগভরর্ত দুটি থলি আমি ক্যাপ্টেনকে উপহার দিলাম এবং বললাম যে ইংল্যান্ডে পৌঁছলে আমি তাঁকে বাচ্চাসমেত একটি গোরু ও একটি ভেড়া উপহার দেব।

আমি এই সমুদ্রযাত্রার বিবরণী দিয়ে পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না তবে বাকি যাত্রাপথ বেশ নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল আমরা ইংল্যান্ডের ডাউনস-এ পৌঁছলাম। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ইঁদুর আমার একটি ভেড়া ধরে নিয়ে গিয়েছিল, হাড়গুলো একটা গর্তে পেয়েছিলাম, মাংস পরিষ্কার করে খেয়ে নিয়েছিল। বাকি পশুগুলো সবুজ ঘাসভরতি একটা মাঠে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল ওরা হয়তো এদেশে টিকবে না, কিন্তু আমার সব আশঙ্কা দূর করে ওরা দিব্যি ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জাহাজেও তাদের হয়তো বাঁচিয়ে আনতে পারতাম না যদি নাকি ক্যাপ্টেন আমাকে তাঁর ভাঁড়ার থেকে কিছু বিস্কুট না দিতেন। এই বিস্কুট গুঁড়ো করে জলে গুলে আমি তাদের খাওয়াতাম। তারপর আমি ইংল্যান্ডে যে-কটা দিন ছিলাম আমি আমার ক্ষুদ্র পশুগুলো ইংল্যান্ডে নামিদামি ব্যক্তিদের দেখিয়ে বেশ দুপয়সা আয় করেছিলাম। আমি আমার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করবার পূর্বে পশুগুলো ছশো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাউন্ডে বেচে দিয়েছিলাম। পরের সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে এসে খবর নিতে গিয়ে দেখলাম ভেড়াগুলো ছানাপোনা বিইয়ে সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। ওদের কোমল পশমের নিশ্চয় খুব চাহিদা হবে। আমি আমার স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে দুমাস থাকলাম কিন্তু আরো দূরদেশ দেখবার জন্যে আমার ভ্রমণপিয়াসী মন চঞ্চল হয়ে উঠল। নিশ্চিন্ত পারিবারিক জীবন আমাকে আটকে রাখতে পারল না। আমি আমার স্ত্রীর হাতে দেড় হাজার পাউন্ড দিলাম এবং তাকে রেডরিফ-এ একটি বাড়িতে থিতু করেছিলাম। যে-টাকা বাকি রইল তা থেকে নগদ কিছু সঙ্গে রাখলাম, কিছু জিনিস কিনলাম। সেগুলো বিদেশে বেচে মোটা লাভ করতে পারব। এপিং-এর কাছে আমার বড় আংকল আমাকে খানিকটা জমি দিয়েছিলেন যা থেকে বার্ষিক প্রায় তিরিশ পাউন্ড পাওয়া যেত। এ ছাড়া ফেটার লেনে আমি 'ব্ল্যাকবুল' পানশালা দীর্ঘমেয়াদি লিজে রেখেছিলাম। তা থেকেও ভালো আয় হত। অতএব আমি আমার পরিবারের ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি। পরে ওদের অপরের দয়ায় নির্ভর করতে হবে না। আমার ছেলের নাম জনি, নামকরণ তার আংকলের নামানুসারে, এখন গ্রামের স্কুলে পড়ছে, শান্ত বালক। আমার মেয়ে বেটি (তার বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেপুলেও হয়েছে) সেলাই নিয়ে মেতে আছে। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কাছে বিদায় নিলাম। সকলের চোখেই জল। তারপর জাহাজে গিয়ে উঠলাম। জাহাজটির নাম 'অ্যাডভেঞ্চার', তিনশো টনের মালবাহী জাহাজ, ভারতবর্ষে সুরাট অভিমুখে যাবে। ক্যাপ্টেনের নাম জন নিকোলাস, লিভারপুলবাসী। আমার এই সমুদ্রযাত্রার বৃত্তান্ত আমার ভ্রমণকাহিনীর দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খো ন্দ কা র আ শ রা ফ হো সে ন

বাল্টিক সাগরের হাওয়া

এ স্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া—বাল্টিক এলাকার তিনটি দেশ। অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকারে ছিল দীর্ঘকাল, তারপর স্বাধীনতার রোদে পিঠ মেলে বসেছে তারা কিছুকাল আগে। তাদের যন্ত্রণা ও গ্লানি, তাদের গৌরব ও ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে ভঙ্গিসুলভ মিল। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের সাথে তাদের সাযুজ্য থাকলেও ঔপনিবেশিক ইতিহাস তাদের পৃথক করেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে। বিশেষত এস্তোনিয়া ও ফিনল্যান্ড যেন অনেকটাই যমজ; তবু বাল্টিক সাহিত্যের ইতিহাসে ফিনল্যান্ড বহির্বাসী।

এস্তোনিয়া স্বাধীন দেশই ছিল ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত; রুশরা দখল করে নেয় এদেশ চল্লিশ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কিছুকাল পরেই হিটলারের নাৎসিবাহিনীর হাতে চলে যায় এস্তোনিয়া। ১৯৪৪-এ আবার ফিরে আসে সোভিয়েতবাহিনী; এরপর থেকে আশির দশকের শেষভাগ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চদশতম রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয় এই-অঞ্চল। এতসব উত্থানপতনের মধ্যেও এস্তোনীয়রা তাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভুলে যায়নি। সোভিয়েত-নিগ্রহ থেকে বাঁচতে বহু লেখক-কবি দেশ ছেড়েছেন; ফলে মূলত সুইডেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে প্রবাসী এস্তোনীয় সাহিত্য।

AMARBOI.COM

এস্তোনীয় কবিতার আধুনিক যুগের উন্মেষ যুহান লিলিভ (Juhan Liliv : ১৮৬৪–১৯১৩)-এর কবিতায় ও ফিক্‌শনে। ১৯১৩ সালে তিনি মারা যান যক্ষ্মায়। শেষের বছরগুলোতে ছিলেন মানসিক রুগি, কিন্তু রোগের আক্রমণের মধ্যেও ফাঁকে-ফাঁকে তিনি লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলো। তাঁর শেষদিককার কবিতায় ফরাসি প্রতীকবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এস্তোনীয় কবিতার আধুনিকতাবাদী পর্যায়ের দ্বিতীয় ঢেউ তথাকথিত Noor Esti (তরুণ এস্তোনিয়া) আন্দোলন, যার ব্যাপ্তি ১৯০৫ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন গুস্তাভ সুইটস (Gustav Suits : ১৮৮৩–১৯৫৬)। তরুণ এস্তোনীয় দলের পরে রঙ্গমঞ্চে আসে আরেকটি দল, নবীনতর ও আধুনিকতর; এই দলের নাম সিউরু (Siuru)। সিউরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি পাখি : এস্তোনীয় লোককথার অগ্নিবলাকা। অনেকটা গ্রিক মিথের ফিনিক্স যেন। সিউরু-গ্রুপের বিখ্যাততম কবি মারি আন্ডার (Marie Under : ১৮৮৩–১৯৭৭)। সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় এই মহিলা-কবি পালিয়ে চলে আসেন সুইডেনে। তাঁর কবিতা নব্য-রোমান্টিকতাবাদী; জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট কবিদেরও প্রভাব তাঁর ওপর কার্যকর ছিল। জার্মান কবিদের অনুবাদ করতে যেয়ে তিনি তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরটি আবিষ্কার করেন নতুনভাবে। মারি আন্ডার-ই এস্তোনিয়ার প্রধান কবি হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম Sonnets (১৯১৭), The Bleeding Wound (১৯২০), The Heritage (১৯২৩), এবং On the Brink (১৯৬৩)। তিনি এস্তোনীয় ভাষায় অনুবাদ করেন ডক্টর জিভাগো, রিলকের কবিতা এবং অন্যান্য রচনা।

তিরিশের দশকে আবির্ভাব ঘটে আরো একটি প্রজন্মের : বিখ্যাত সমালোচক ও অনুবাদক আন্ত্স ওরাস (Ants Oras : ১৯০০–৮২) এঁদের কবিতা নিয়ে ১৯৩৮ সালে যে-সংকলনটি বের করেন তার নাম Arbujad (শব্দের জাদুকরগণ)। তখন থেকেই এই দলের নাম হয়ে গেছে আর্বুজাদ বা শব্দের জাদুকরদল। তিনজন বিখ্যাত এঁদের মধ্যে : বেটি আল্ভার (Betti Alver), উকু ম্যাসিঙ (Uku Masing), এবং বার্নার্ড কাঙ্রু (Bernard Kangru)। মারি আন্ডার-এর মৃত্যুর পর জাতীয় কবির শিরোপাটি এখন বেটি আল্ভারের মাথায়। মসিঙ-এর কবিতায় উইলিয়াম ব্লেইক কিংবা হপকিন্সের মতো সন্তসুলভ মরমিতা; কখনো-কখনো সুররিয়ালিজমের প্রান্তস্পর্শী তাঁর কবিতা। অন্যদিকে কাঙরু ইয়ুঙ-কথিত যৌথ অবচেতনার খনিত্র দিয়ে খুঁড়তে চান এস্তোনীয় জাতীয় মানসক্ষেত্রটি। 'শব্দের জাদুকরদের' বেশিরভাগ কবি দেশত্যাগের পরিবর্তে রয়ে যান এস্তোনিয়াতেই; নানা বিধি-নিষেধ ও নির্যাতনের মধ্যেও জ্বালিয়ে রাখেন জাতীয় চেতনার আলো। যাঁরা দেশত্যাগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য আয়রনিক বাস্তববাদী কালিউ লেপিক্ (Kalyu Lepik) উপভাষার কবি রেমন্ড কল্ক (Raymond Kolk) এবং পরাবাস্তববাদী কবি ইলমার লাবান (Ilmar Laaban)। এঁরা নিরীক্ষ্যপ্রবণ ও বিবিধ মানসভঙ্গির প্রতিভূ। এঁদের মধ্যে আছেন ইয়ান ক্রস্ (Jaan Kross : জন্ম–১৯২০) এবং আর্তুর আলিক্সার (Artur Alliksaar : ১৯২৩–১৯৬৬); শেষোক্তজন এস্তোনিয়ার অ্যাবসার্ড থিয়েটারের জনকও বটেন। সমালোচকরা ষাটের দশককে বলেছেন কাব্যিক রেনেসাঁস। প্রধান আরো দুজন : ইরিক রামো (Eeric Rummo) এবং ইয়ান কাপ্লিন্স্কি (Jaan Kaplinski)।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারি আন্ডার
MARIE UNDER (১৮৮৩-১৯৮০)

ভোরের আনন্দ

প্রভাত তার তরুণ চঞ্চল হাতে মুছে দিলো
দড়াম করে বন্ধ করলো রাত্রির দরোজা,
আরো উদার বিস্তৃত ক'রে দিলো
মেঘের পাহাড়ের উপরে নীলের গম্বুজ।

উদ্ভাসিত আকাশ হাঁটু গেড়ে বসে আমার ঘরে।
ফিরে আসে আমার দৃষ্টি, কণ্ঠে আমার স্বর।
রোদেলা এক পাকা আপেলের মতো সময় আমাকে ডাকে :
জীবনবৃক্ষে এসেছে নতুন ফসল কাটার মরসুম।

সকাল হয়ে উঠতে চায় দিন আমার ভেতর।
হে মহান নবাগত, তুমি! রাত্রির ছায়ায় আমি
আই হলাম তোমার নবী। অধীর আমার মন,
চেতনা জাগায় আমার মস্তিষ্ক; চিন্তা হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণধার।
স্ফটিকিত হে আলোক, স্নান করো আমাকে!
তোমার অগ্নিচিহ্নে আমার শরীরে; আনন্দে ভেজা চোখ।

AMARBOI.COM

খসে পড়ে একটি নক্ষত্র

কী অলজ্জ নতুন ঐ পুরনো চাঁদখানি।
ফিরবে না অনেক কিছুই, তবু জানি।

হে আমার হারানো শহর, হায়রে হায়,
তোকে আমি খুঁজেছি কত না জায়গায়!

অসম্ভবের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা যার,
কোথায় পাব তারে? কোথায় স্থান তার?

সব কিছু তবে কিংবদন্তি, মায়া, বাইরের ঝলকানি?
কিচিরমিচির একটি পাখির শুনি কাতরানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর খসে পড়ে একটি নক্ষত্র। জ্বলে ওঠে হৃদয় আমার;
পৃথিবী কী রেখে যাবে আমার জন্য? ধ্বংস করবে কার?

শূন্যতাকে মুঠোতে ভরেছি? সবি কি তবে অনৃতবাচন?
না, এখনও আসল কাজ বাকি—আমার মরণ।

বেটি এল্‌ভার

BETTI ALVER (জন্ম : ১৯০৬)

নক্ষত্র প্রহর

বেয়াড়া ঝড় খুব বেশি প্রশ্ন করে না
জীবনের চৌমাথায়।
শেষ পর্যন্ত তোমাকেই জোগাতে হবে উত্তর
তোমার নিজের কাছে।

যতই দিঘল হোক রাত্রি, যতই অন্ধকার,
তোমার কপাল তবু বয়ে যাবে তোমার নাম।

এমনকি একটি পাতাও অনুসরণ করে আলোক।
তারপর ঝরে পড়ে অন্যদের সাথে। তবু একা।
চমৎকার গন্তব্য নেই তোমার? তাহলে শুধু যাও
শিখে নাও কী করে করতে হয় ভোগ।

তুমি কি জানো না কী মানুষকে নম্র করে ধীরে?
কেন নিষ্ঠুরতা হঠাৎ আসে না?
কেন মর্চে ধরে না ফুলের শিরস্ত্রাণে?
কেন জীবনের নক্ষত্র-প্রহর আসে শুধু একবার?
কেন নিবুনিবু আলো বেঁচে থাকে,
নিভে যায় না ঝোড়ো রাত্রিতেও?

যাও জিগ্যেস করো তাদের যারা তোমার চেয়ে ভালো।
জিগ্যেস করো জীবিতদের। জিগ্যেস করো তাদের যারা মৃত।

কিন্তু চলন্ত সময়কে কখনও জিগ্যেস কোরো না।
তাদের কথা যারা দৈবক্রমে চলে গেছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিথি-প্রান্তরের ঘনকালো অন্ধকারে।

বিশ্বাস করো, তারা পরোয়া করে না,
আপতিক না কি অন্য কোনোভাবে
দাঁড় বেয়ে নিয়ে গেছে বিস্মরণ-মাঝি।

ইয়ান কাপ্লিন্‌স্‌কি
JAAN KAPLINSKI (জন্ম : ১৯৪১)

কালো বনশজারুর মতো

অনন্তকাল নেমে আসে
উপত্যকায়
এক শিশুর কোলে
কাঁটাঅলা বল
গলে গলে খুলে যাচ্ছে
জীবন্ত
পৃথিবীর সীমান্ত
পৃথিবীর কাঁটাতার
এগিয়ে চলেছে
বনশজারুর মতো
সীমান্ত পেরিয়ে

শিশুদের চোখ
প্রজাপতির মতো
পড়ে থাকে
তোমার
সামনে
মাটির ওপর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুহান ভিডিঙ
JUHAN VIDING (জন্ম : ১৯৪৮)

আমি ভূমিদাস

আমি এক ভূমিদাস। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
কাজ করি মনিবের জন্য।
মনিবের জন্য কাজ করা নিশ্চিত খারাপ, আমি জানি।
কাজ সুকঠিন, উপওয়ালারা বিদেশী;
তারা বোঝে না আমিও একজন মানুষ।
আমি পরবের গান কাজের গান গাই, বিশেষ করে
কাজের গান। প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে
মুখে-মুখে বেঁচে থাকে সেই গান,
অংশ হয় লোকসংগীতের।

মাঝে মাঝে ভাবি, জার্মানির কিষানদের কপাল
ভালো কি আমাদের চাইতে? কিন্তু আমি জানি না।
আর জিগ্যেসই-বা করবো কাকে? সামন্তপ্রভুকে?
আমাকে হাসিও না।

সে আমার ভাষা বোঝে না, বুঝবে না আমার প্রশ্ন।
আর যদি সে বুঝতো আমার ভাষা আর আমি তাকে
বলতাম যে, একদিন এস্তোনীয় ভাষায় লেখা হবে বই,
সম্ভবত আমাকে সে খাঁচরের আস্তাবলে বেঁধে
অসংখ্যবার চাবুক মারতো।

আর যদি বলতাম এমনও যে, একদিন দেখো
স্বাধীন এস্তোনীয় নাট্যশালা হবে,
আমার মুখের উপর হেসে উঠতো সে।
কিন্তু না, আমি তাকে তা বলতে যাবো না।
মনে হয় এখনও সময় হয়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উকু মাসিঙ
UKU MASING (জন্ম : ১৯০৯)

কেবল কুয়াশাগুলো সত্য

বাতাস হলো এল্‌ম-কাঠে বানানো মাকু।
আমি হলাম গোধূলি হাওয়ার সুতা।

ঈশ্বর তাঁর য়ুনিকর্নের হাড়ে-গড়া তাঁতটিতে
কী সুতায় গড়েছেন টানা ও পড়েন, জানি না তা।

হয়তো বা কুয়াশার আলোই হবে, যখন তারা মৃত,
কেননা আমার মাথা ছুঁতে পারেনি তো মেঘ।

কালিউ লেপিক
KALJU LEPIK (জন্ম : ১৯২০)

AMARBOI.COM

অভিশাপ

যদি ধ্বংস করো আমার পৃথিবীকে
যদি ধ্বংস করো আমার মানুষকে

তবে তোমার মাথা বৃষ্টির ফোঁটা হোক পাথরে রূপান্তরিত।
তবে পাথর থেকে গজাক পাথরের চারা।
তবে পাথরের রুটি উঠুক তোমার খাবার-টেবিলে।
তবে তোমার পায়ের নিচের মাটি হোক পাথর।
তবে পাথর হোক তোমার মাথার ওপরে আকাশ।
তবে সমুদ্র হোক পাথরে রূপান্তরিত।
পাথর হোক, যেমন তোমার হৃদয় আজ পাথর
আমার মাটি আর মানুষের বিরুদ্ধে।

সাগর

সমুদ্র যখন আমাকে বইতে পারে না
আমি হাঁটি না তার ওপর।
আমাকে দাও কোনো কিছু, সমুদ্র,
যা রাখতে পারি আমার টেবিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা খেয়েছি ঝুলন্ত সাগর লেজ।
ওটি নিশ্চিতই ছিল লোনা।

২
টেবিলে কাঁটাচামচের নিচে সাগর।
কাঁটাচামচের দাঁড়ার নিচে
সমুদ্রের মাথা আর সাতটি চোখ।

সপ্তম চোখটি
ঝোড়ো হাওয়ার আগাম সংবাদ জানায়।

৩
তোমার চোখগুলো সত্যি লোনা, সাগর,
আর তোমার নাকটি নীল।
তোমার রুমালটি সাদা
যাতে তোমার নাক ঝাড়ো।

তোমার কান দুটোতে গর্জন।

হে আমার সমুদ্র
তোমার প্রশস্ত পাছা
আর দোল-খাওয়া উরু।
হা কপাল, তুমি কী করে হাঁটো,
সাগর আমার!

লোনা জিভ দিয়ে
তুমি চাটো আমার পায়ের আঙুল।
তোমার নগ্ন পেটে
আঙুল বোলায় সূর্য!
যখন আমি বসি
রস্‌লাগেন-এর পাথুরে তটে।

কিন্তু তবু কেন হঠাৎ
আমার মুখে থুতু ছিটাও অক্টোবরে,
যখন আমি জন্মেছিলাম?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালে এস্তোনিয়ার মতো লাটভিয়াও স্বাধীনতা অর্জন করে। উনিশশতকের শেষভাগেই প্রবল হয়ে উঠেছিল লাটভীয় জাতীয়তাবাদের চেতনা। এসময় লাটভিয়ার লোকসাহিত্য ও লোকসংগীতের সংগ্রহ চলেছিল জোরে-শোরে। সাম্প্রতিককালের য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে লাটভিয়ার কবিতা সবচেয়ে বেশি লোককথা ও মিথের সম্ভারে ঐশ্বর্যশালী। উনিশশতকের নব্বইয়ের দশকে সামজবাদী চিন্তা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, লাটভীয় ঐতিহ্যচেতনা তার সাথে সমাকৃত হয়। এই পর্বের প্রধান কবি-নাট্যকার-অনুবাদক ইয়ানিস রাইনিস (১৮৬৫–১৯২৯)। রাইনিসকে বলা হয় লাটভিয়ার শ্রেষ্ঠতম কবি; তাঁর Distant Feeling in a Blue Evening (১৯০৩) কাব্যগ্রন্থে নির্জনতা ও নস্টালজিয়ার নব্যরোমান্টিক রূপায়ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শুরু হয় লাটভিয়ার কবিতার আধুনিকতাবাদী পর্ব। আলেকজান্ডার চাক্স্ (Alexander Caks : ১৯০১–১৯৫০) আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মায়াকভস্কির প্রবল প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। তরুণতর কবিরা প্রায় একবাক্যে তাঁকে মেনে নেয় গুরু-কবি হিসেবে, যদিও লাটভিয়ার নানা রাজনৈতিক উত্থানপতনের সময় তাঁর ভূমিকা অনেকটাই আপোসকামী ও সুযোগসন্ধানী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে লাটভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে আসে। বহু কবি পালিয়ে চলে আসেন পাশ্চাত্যে : বিশেষ করে আমেরিকায় গড়ে ওঠে প্রবাসী লাটভীয় সাহিত্য। যাঁরা থেকে যান, গলা মেলান স্তুতি-প্রশংসার কোরাসে। প্রবাসী কবিদের মধ্যে রয়েছেন ভেল্টা স্নিকারে (Velta Snikere : জন্ম–১৯২০), বাস করেন সুইডেনে। অন্যদিকে লিনার্ডস টাউনস (Linards Tauns : ১৯২২–৬৩) এবং গুনারস্ সালিন্স (Gunars Salins : জন্ম–১৯২৪) আমেরিকান লাটভীয় কবিতার প্রধান কুশীলব : Hell's Kitchen নামে ডাকেন নিজেদের দলকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যাঁরা লাটভিয়ায় রয়ে যান তাঁরা স্তালিন-উত্তর যুগে নতুনতর নিরীক্ষায় ব্যাপ্ত হন। কবিতায় নতুন দীপ্রতা যুক্ত করেন ওজারস ভাসিয়েতস্ (Ojars Vacietis : জন্ম–১৯৩৩), মারিস্ চাকলাইস (Maris Caklais : জন্ম–১৯৪০), ভিজ্মা বেলসেভিচা (Vizma Belsevica : জন্ম–১৯৩১), ইমান্টস্ আউজিন্স্ (Imants Auzins : জন্ম–১৯৩৭), য়ানিস্ পিটারস (Janis Peters : জন্ম–১৯৩৯) এবং ইমান্টস জিদোনিস্ (Imants Ziedonis : জন্ম–১৯৩৩)। এঁরা কবিতায় এনেছেন লৌকিক বাগ্ভঙ্গি এবং ভাষিক প্রাখর্য; এঁদের কবিতা একইসঙ্গে ঐতিহ্যস্পৃষ্ট ও সমকালীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুনারস্ সালিন্স
GUNARS SALINS (জন্ম : ১৯২৪)

গান

ঠাণ্ডায় আমার গলা ভেঙে গিয়েছিলো,
আর একদিন আমার গান
জমে হয়েছিলো বরফ।

আমি গরম দুধ খেলাম মধুর সাথে
আর আওড়ালাম এই প্রার্থনা :
ফিরে এসো আমার গান—অন্তত
গোরুর হাম্বা কিংবা মৌমাছির গুঞ্জন হয়ে।

তখনই ঘটলো ঘটনা : একরাত্রে যখন সবাই,
যারা আমার সেবারত, চলে গেলো,
জলমহালের পাশের কসাইখানা থেকে
দল বেঁধে গোরুগুলো নেমে এলো রাস্তায়।

তৃষ্ণার্ত ওরা হাম্বায় ভরে তুললো শহর,
দৌড়ালো তাদের উষ্ণ শ্বাস আর গন্ধ নিয়ে,
আর বরফ গলে জানলা ও গাড়িগুলো থেকে,
আকাশচুম্বী দালান আর স্কোয়ারগুলো থেকে।

AMARBOI.COM

ইমান্টস জিদোনিস
IMANTS ZIEDONIS (জন্ম : ১৯৩৩)

কেমন জ্বলে মোমবাতি

কেমন জ্বলে মোমবাতি।
কী সুন্দর জ্বলে মোমবাতি।
কেমন সাদা আলো ছড়ায়, দোলে
আর পালায় অন্ধকার। পালায় আলো।
আর ঈশ্বর এবং শয়তান বিনিময় করে আমার আত্মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মোমবাতি জ্বলতে থাকে।
কী সুন্দর জ্বলে মোমবাতি।
বাতাস ছুটে আসে, ভয় দেখায় আমার মোমবাতিকে।
মোমের প্রান্ত ঘিরে প্যারাফিন ছড়িয়ে পড়ে
কেউ যেন ইতোমধ্যে আমার প্রস্থানের অপেক্ষায়

কিন্তু মোমবাতি জ্বলতে থাকে।
কী সুন্দর সাদা জ্বলছে মোমবাতি!
আর অবাক হয়ে অন্ধকার নামায় তার মাথা :
শুরু থেকে শেষতক জ্বলতে থাকে সাদা,
যতক্ষণ না সলতেটা ডুবে যায় প্যারাফিনে, ধীরে।

কিন্তু কী যেন নিবুনিবু হয়—
কী যেন মৃদু আরো নিবে আসে।
তবু আমার চোখে চমকায় মোমবাতির শিখা।
আমার চোখের সামনে আকাশের বিশাল বাজার,
যেখানে ঈশ্বর আর শয়তান মিলে
বিনিময় করে মোমবাতির হৃদয়।

AMARBOI.COM

মারিস্ চার্লাইস্
MARIS CHARLAIS (জন্ম : ১৯৪০)

শোকরত রমণী

ধীর শান্ত পদে, চোখ নিয়ে গভীর সুদূর,
তিনি এলেন কালো সমুদ্র-শৈবালের মতো।

সাথে সাথে ফ্রিজ হয়ে গেলো ভাষা :
চোখের পাতা নেমে এলো পাখার মতো।

এক বছর হলো তাঁর ছেলে—এক মৃত আত্মা—
স্বর্গের উদ্যানে আঁকছে জলরঙে ছবি।

কী বলা যায় কৃষ্ণ পোশাকধারিণী মা-কে?
মুখের ভাষা রূপ পাবার আগেই হয়ে যায় ছাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর কী কাজ আমাদের সাথে—যারা বেঁচে আছি?
প্রতিটি জীবিত মানুষ তাঁর ক্ষতস্থান ছেঁড়ে, অনিচ্ছায়।

নীরবতা বুনে চলে জাল, মাকড়সার মতো।
বৃক্ষেরা মাঠে পরে নেয় কালোরং পোশাক।

বেদনা, কী চেয়েছিলে তুমি? কী চাও?
পাঠাওনি কোনো প্রতিনিধি, খুলেছ নিজেকে...

ওজার্‌স্ ভাসিয়েতিস্
OJARS VACIETIES (জন্ম : ১৯৩৩)

ঘোড়া স্বপ্ন

স্বপ্ন দিয়ে যদি কারুর বিচার হয়,
তবে আমার জেলবাস নিশ্চিত—
গতরাত্রে একটি ঘোড়াকে আমি
নিয়ে গিয়েছিলাম
সেন্ট পিটারের টাওয়ারের মাথায়
আর বলেছিলাম :
"দ্যাখো, আমি কীভাবে বেঁচে আছি!"

"এ আর এমন কী?",
উত্তর দেয় ঘোড়া,

"যদিও ম্যালা জটাজাল চাদ্দিকে,
এবং ব্যাপার হলো কী জানো,
তুমি বরং আমার পায়ে ছাঁদনা বাঁধো
কারণ মাঝে মাঝে আমি উড়াল দিই।
যত শক্ত করে ছাঁদনা বাঁধবে
জটাজাল কমবে ততই।"

চিন্তান্বিত হলাম।
"না, তবে, দ্যাখো হে ঘোড়া,
দ্যাখো, আমি কোথায় বেঁচে আছি!"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি দেখছি"—
বললো ঘোড়া,
"কিন্তু আস্তাবল তো আত্মার রং ঠিক করে না।
আমি একটি সরল জন্তু যখন দাঁড়িয়ে থাকি,
আর ঘোড়া, যখন টানি লাঙল।"

ঘোড়াটার পায়ে ছাঁদনা বাঁধলাম
আর তাকে চরালাম
স্যানেটারিয়ামের পাশে
সারারাত।

আর সারারাত ধ'রে
তারাগুলো আমাকে কামড়ালো।

একজোড়া তরুণ-তরুণী যাচ্ছিলো পাশ দিয়ে!
ছেলেটি গম্ভীরভাবে বললো মেয়েটিকে :
"আজকালকার দিনে এটাই ফ্যাশন।"

AMARBOI.COM

এস্তোনিয়া ও লাটভিয়ার মতো লিথুয়ানিয়াও সোভিয়েত দখলে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন থেকে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত লিথুয়ানীয় সাহিত্য দুটো স্পষ্টভাগে বিভক্ত : সোভিয়েত লিথুয়ানীয় সাহিত্য (অর্থাৎ যাঁরা দেশত্যাগ না করে সোভিয়েত আমলটি স্বদেশে পার করেছেন এবং সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের) এবং প্রবাসী লিথুয়ানীয় সাহিত্য (যাঁরা সোভিয়েত আগ্রাসনের পর বিভিন্ন দেশে, বিশেষত ফিনল্যান্ড ও আমেরিকায় হিজরত করেন তাঁদের)। এই দুই ভাগের সাহিত্য, বিশেষত কবিতা—ভাষা, ভঙ্গি, বিষয়সন্নিপাত এবং শৈলীতে পৃথক। স্তালিনের শাসনামলে কঠিন নিয়মকানুনের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল লেখালেখির জগৎ; তাঁর মৃত্যুর পর খ্রুশ্চেভের সময় অনেকটাই শিথিল হয় বাঁধন, এবং ফলে সৃজনশীলতার নতুন স্পন্দন অনুভূত হতে থাকে পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে। সোভিয়েত লিথুয়ানীয় কবিতা ক্রমাগত হতে থাকে ব্যক্তিগত, বিচিত্রবিষয়সন্ধানী। সেইসাথে যুদ্ধকালীন নানা দুঃখ-সন্তাপের বিবরণ; লিথুয়ানীয় লোককথার প্রসঙ্গ এবং রূপক-প্রতীকের ব্যবহার বাড়তে থাকে। জুডিটা ভাইসিউনাইট (Judita Vaiccunaite) এবং সিগিটাস গেডা (Sigitas Geda) দুজন উল্লেখযোগ্য কবি।

অন্যদিকে প্রবাসী লিথুয়ানীয় কবিতা বহুলাংশে নিরীক্ষার পথে হেঁটেছে বরাবর। সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে পালিয়ে প্রবাসী কবিরা পৌঁছে যান ভিন্নতর সংস্কৃতির জগতে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের প্রধান একটি প্রণোদনা ছিল সাংস্কৃতিক বৈবিধতার মধ্যে লিথুয়ানীয় সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা। দেশচ্যুতির বেদনা তাঁদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে একটি স্পর্শযোগ্য জাতীয়বাদী সংবেদনা, প্রতিবাদ ও দুঃখের কলাপের সাথে তাঁরা মেশাতে চেয়েছেন এক আদর্শ লিথুয়ানিয়ার কল্পরূপ। প্রবাসী লিথুয়ানীয় কবিদের নানা গ্রুপ তৎপর, তাদের মধ্যে Zeme (জমিন) গ্রুপটি প্রধান। হেনরিকাস নাগিস্ (Henrikas Nagys) এবং আলফন্সাস্ কায়কা-নিলিউনাস্ (Alfonsas Nyka-Niliunas) উল্লেখযোগ্য কবি। এইসব গ্রুপের বাইরে হেনরিকাস রাদাউস্কাস (Henrikas Radauskas) একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর কবিতা প্রতীকবাদী পরাবাস্তব ধরনের; কবিতার সকল প্রযত্ন তথা মানবিক-সামাজিক সকল বিবেচনাকে তিনি অধীন করেছেন নন্দনতাত্ত্বিকতার। লিথুয়ানীয় কবিতায় ইস্থেটিজমের প্রবক্তা হেন্‌রিকাস রাদাউস্কাসের পাশ্চাত্য অনুবাদকদের মধ্যে আছেন র‍্যান্ডাল জ্যারেল (Randal Jarrell)।

আলফন্সাস্ কায়কা-নিলিউনাস্

ALFONSAS NYKA-NILIUNAS (জন্ম : ১৯১৯)

শীতের ল্যান্ডস্কেপ

AMARBOI.COM

এই শহর, সূর্যাস্তের কালো ধাতুতে আঁকা, আমার জন্মের শহর। এর নাম রেজারেকশন। দারিদ্র্য আর ক্ষুধার এক বিশাল জ্যোতিশ্চক্র একে মোচড়ায় চৌম্বকবৃত্তের মধ্যে আর একটি গ্রহের মতো সে ঘুরতে থাকে আমার মায়ের দৃঢ়নিবদ্ধ চোখের কক্ষপথে।

অনাহারে মুমূর্ষু জীবনবৃক্ষ তার জমে-যাওয়া বাহু দিয়ে ধরতে চায় উড়ন্ত পাখিদের, যারা ফসকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং মরে পড়ে যায় মাটিতে। আর মরে যায় বৃক্ষটি।

সূর্য—কুঞ্চিত ভুরুর পাশে ফুটে-থাকা এনিমোন—বেগনি কূপের পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে। মাটির দাগঅলা উঠানে রক্তের ছোপ; চোখের পাতায় তুষারকণা, জানালা মুখবিহীন। খ্যাপা দরোজাটা ধীরে গান গায় মেয়েটির স্তনযুগল এবং চুলের, যে কুয়োর পাশে মরে পড়ে আছে।

এই শহর, সূর্যাস্তের কালো ধাতুতে আঁকা, এর নাম নিশ্চিহ্নায়ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেনরিকাস্ রাদাউস্কাস্
HENRIKAS RADAUSKAS (১৯১০-১৯৭০)

তীর

এক বালকের ছোড়া তীর আমি—
ছুড়েছে সে নীল সমুদ্রের পাড়ের এক সাদা
আপেলগাছের দিকে তাক করে।
আর নেমে আসে একদল ফুলের মেঘ, যেন রাজহাঁস
ঝকমক করছে ঢেউয়ের উপর।
বালকটি অবাক তাকিয়ে থাকে,
বলতে পারে না কোনটি ফুল, আর কোনটি ফেনা।

আমি এক তীর—বলবান কোনো তরুণ শিকারি
ছুড়েছে এক উড়ন্ত ঈগলের দিকে,
কিন্তু পাখিটি বিদ্ধ হয় না, শুধু চোট লাগে
বিশাল সূর্যের গায়ে, এবং রক্ত ঝরে
সারাটা সন্ধ্যা জুড়ে।
আর মরে যায় দিনটা।

আমি এক তীর—
এক পাগলা সিপাহি ছুড়েছে আমাকে
দুশমনে-ঘেরা কারাপ্রাকার থেকে
রাত্রিকালে বলবান ঈশ্বরকে সে খুঁজেই পায় না—
শীতল নক্ষত্রলোকে ঘুরতে থাকে সে তীর :
ফিরে আসতে ভয় হয় তার।

AMARBOI.COM

ইউজেনিয়াস্ মাতুজেভিচিয়াস্
EUGENIJUS MATUZEVICIUS (জন্ম : ১৯১৭)

আগুনের ভেতর লেখা

আমি জানি না কেন
যখন দেখি একটি জ্বলন্ত আগুন
প্রান্তরে, নদীতীরে, কিংবা বনের কাছাকাছি,
আমি দাঁড়াই, আর সামনে এগুই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর পরে, ঐ আগুনটির পাশে
মনে হয় পেয়ে যাই একটি বার্তা
পুরনো কোনো বন্ধু যেন পাঠিয়েছে আমাকে।

নীরবে ঐ আগুনের শিখা দেখি,
তার তিক্ত ধোঁয়ার স্বাদ নিই...
কেন জানি না মনে হয় আমার
বহুকাল বসে আছি এভাবে
এই জ্বলন্ত আগুনের পাশে
যার কুণ্ডলীর মধ্যে জড়ানো-প্যাঁচানো
বাস্তবতা এবং স্বপ্নেরা
যারা কোনোকালে হয়তো ছিলোই না।

আর এইসব কিছু
এই আগুনের ভেতর লেখা
ধীরে ধীরে মিশে গিয়ে
হয়ে যায় প্রাচীন এক মহাকাব্য,
যা আমি পড়ি
পুরনো কোনো বন্ধুর বার্তা যেনবা।

ততক্ষণে অন্ধকারে, আমার পেছনে
শেকল-বাঁধা রাত্তির ঘাস খায়
আর সময়, যেন ধূসর-কেশর দোলানো
বুড়ো ঘোড়া, মাঠ পেরিয়ে নদীটির তীর ধ'রে ধ'রে
হেঁটে যায়
পিতলের লাগাম বাজাতে বাজাতে...

AMARBOI.COM

হেন্‌রিকাস্ নাগিস্
HENRIKAS NAGYS (জন্ম : ১৯২০)

লেটার্না অবস্‌ক্যুরা

আমরা একসাথে প্রথম তুষারের মধ্যে শিশুটির মুখ খুঁজি।
বুনো জামগাছের নিচে আমার বোন তার পুতুল দোলায়।
গতরাতে মজুরেরা জমাট জমির ওপর মেলে দিয়ে গেছে
পাতলা বরফ, আর এখন তারা আলকাতরা মাখাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার্তুভা নদীর ওপরের কাঠের পুলটিতে।
নবজাত তুষার আমার বোনের চুলের মতো হালকা।

ভয়ার্ত শূন্য সামোগিতিয়ান গ্রামের ভেতর দিয়ে
কস্যাকেরা ঘোড়া চড়ে যায়, খোলা তলোয়ারে
কাটতে কাটতে যায় নীরব সাদা চাঁদের আলো।

আমরা আমাদের মায়ের মুখ খুঁজে পাই পয়লা তুষারে।
দারোয়ানের মৃগীরোগী মেয়েটা শুকনো রুটি গুঁড়ো ক'রে
ছড়িয়ে দেয় কফিনের গর্তে। তুষার বয়ে যায় কৃষক রমণীর
মোমের মুখ আর তার কাগজের-বিনুনি-ঠাসা বালিশের ওপর দিয়ে।
তুষারের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনি শোনা যায় রূঢ় স্তোত্রপাঠের।
এবং হাঁপধরা ঘণ্টার।

নীরব ঘুমন্ত সাদা সামোগিতিয়ান গ্রামের ভেতর দিয়ে
উড়ে যায় কস্যাকেরা, তাদের দীর্ঘ চাবুকে
কাটতে কাটতে যায় নীল শীতের জোছনা, যা
বৃক্ষরাজির মধ্যে চমকায় সারারাত।

কেউ তোমাকে চুমু খায়নি শুভরাত্রি বলে। কেউ কাঁদেনি
তোমার মৃত মায়ের জন্য, তোমার সাথে সাথে।
তোমার ফাঁসি-দেয়া বাবাকে কবর দিতে আসেনি কেউ।
তোমার জমি ছিল শূন্য আর ন্যাড়া। তোমার মাটির কৃষকের
রাজত্বে তোমাকে ঢুকতে দেয়নি কেউ—ধূসর পোশাক শুধু
বাতাসে উড়েছে ভুলে-যাওয়া-শোকের পতাকার মতো—
প্লেগের পোশাক।

দরিদ্র সামোগিতিয়ান গাঁয়ের ভেতর দিয়ে উড়ে যায় কস্যাকেরা,
নীল শীতরাত্রির জোছনার কর্তিত শির বিঁধিয়ে নিয়ে
তাদের দীর্ঘ বর্শায়।

এক উজ্জ্বল রোববারের সকালে ঝলমলে এই দেশে
মজুরেরা আলকাতরা লাগায় বার্তুভা নদীর কাঠের সেতুতে।
বরফের বহুদূর নিচে নদী বয়ে যায় ধীরে সাগর-সঙ্গমে।
জামগাছের শাখার নিচে ঘুম যায় আমার বোনের তুষার-মাখা পুতুলটি।
আমরা দুজনে মিলে আমাদের ঘুমন্ত ভায়ের মুখ খুঁজি নীল তুষারের ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ হ মা দ মো স্ত ফা কা মা ল

সংশয়ীদের ঈশ্বর

এ কজন তরুণ শিল্পীর কণ্ঠে লালনের 'ক্ষম ক্ষম অপরাধ' গানটি শুনতে শুনতে আমি যখন প্রায় মোহমুগ্ধ, তখন পাশে বসে থাকা আমার এক বন্ধু বললেন, এই গানটির মধ্যে তিনি মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পান। আমি নিজে এই গানটির মধ্যে সেরকম কিছু খুঁজে পাই না। বলা বাহুল্য এ আমারই মূর্খতা, নিরেট মূর্খতা; কিন্তু তিনি কীভাবে খুঁজে পেলেন তা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। নিজের মূর্খতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করলাম, বিনয়ে নুইয়ে গিয়ে বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলাম—গানটির ঠিক কোথায় এবং কীভাবে তিনি মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পেলেন? আমার অজ্ঞতায় তিনি অবাক হলেন না, তবে নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, আমি যেন গানটি মনোযোগ দিয়ে আরেকবার শুনি। আমি একবার নয়, অন্তত একশোবার গানটি শুনলাম, কিন্তু কোনো লাভ হল না। মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না, কিন্তু একটা প্রশ্ন মাথায় পাকাপাকিভাবে ঢুকে গেল। যা আমি অনেক চেষ্টায়ও খুঁজে পাচ্ছি না, আমার বন্ধুটি সহজেই সেটা পেলেন কীভাবে? আর কেনই-বা গানটিকে মার্কসবাদী নান্দনিকতা দিয়ে বিচার করতে গেলেন তিনি? সেটা না করলে এর রসাস্বাদনে কি কোনো ক্ষতি হয় তার? আমার তো কোনো অসুবিধা হয় না! বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমার বন্ধুটি গভীরভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন এবং জীবন ও পৃথিবীর সবকিছুই মার্কসবাদের আওতায় এনে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, সেই অনুযায়ী গ্রহণ বর্জনও করে থাকেন। আর সেটাই আমার ভাবনার বিষয়। যাঁরা একটি নির্দিষ্ট দর্শনে গভীরভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন, তাঁরা সেখান থেকে বেরুতে পারেন না কেন, কেনই-বা সবকিছুকে সেই দর্শনের আওতায় নিয়ে আসতে চান এবং মনে করেন যে, এর বাইরে অন্য কোনোকিছু নেই, অন্য কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও গ্রহণযোগ্য নয়? তাঁদের মানসগঠনটি এরকম বদ্ধ কেন?

গানের কথায় ফিরে আসি। যে-শিল্পীর কথা বলছিলাম, তিনি বয়সে তরুণ হলেও তাঁর কণ্ঠটি কারুকার্যময়, গলায় চমৎকার সুর আছে তাঁর, কণ্ঠে গভীর দরদও আছে। সবচেয়ে বেশি আছে যে-জিনিসটি তার নাম মগ্নতা। এমন মগ্ন হয়ে গানটি গাইলেন তিনি যে, মনে হল গান নয়, তিনি প্রার্থনা করছেন। আমরা যারা ওখানে ছিলাম সবাই-ই স্তব্ধ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসেছিলাম, হয়ে উঠেছিলাম আর্দ্র-করুণ, এবং অস্বীকার করব না—খানিকটা ভাববাদী। আমার বন্ধুটির মতো আর কেউ মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতার কথা ভেবে সেরকমটি হয়েছিলেন কি না জানা হয়নি, তবে মনে হয়েছিল একটি প্রার্থনাসংগীত (হ্যাঁ, লালনের ওই গানটিকে আমি প্রার্থনাসংগীতই বলব) শুনলে আমরা সবাই এমন আর্দ্র-করুণ হয়ে উঠি কেন? আর কেনই-বা প্রতিটি মানুষেরই জীবনের কোনো-না-কোনো সময় প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে? তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে—প্রার্থনাটা কার কাছে? প্রার্থনার কথা বললে এই প্রশ্নটি আসবেই। এবং প্রশ্নটির পিছে পিছে অনিবার্যভাবে আসবে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ, তাঁর অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের প্রসঙ্গ, আস্তিকতা-নাস্তিকতার প্রসঙ্গ। এই লেখাটি সেইসব প্রসঙ্গ নিয়েই। নতুন কোনো বিষয় নয়, বলাই বাহুল্য। প্রচুর কথা হয়ে গেছে পৃথিবীতে এ নিয়ে। নতুন কথাও খুব বেশি বলা যাবে না। তবু নিজের উপলব্ধির কথা বলে যেতে দোষ কী?

২

এখন, আমাদের সময়ে, কোনো 'আস্তিক' স্বীকার করতে লজ্জা পান যে, তিনি আস্তিক—কারণ সেক্ষেত্রে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল অভিধা পেতে হতে পারে। অন্যদিকে 'নাস্তিক'রা প্রকাশ্যে বলতে কিঞ্চিৎ 'ভয়' পেলেও আড্ডায় বা ঘরোয়া পরিবেশে বেশ গর্ব করেই বলেন যে, তিনি নাস্তিক। অর্থাৎ নাস্তিকতা গৌরবের আর আস্তিকতা লজ্জার! কিন্তু অদ্ভুত শোনালেও সত্যি যে, এর একটি যদি নেতিবাচক হয় তবে একইভাবে আরেকটিও নেতিবাচক শব্দ। আমাদের এখানে এরকম ধারণা প্রচলিত আছে—এই দুটো শব্দ পরস্পরের বিপরীত অর্থ বহন করে। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে, আস্তিকতার বিপরীত শব্দ নাস্তিকতা নয়, এই দুটো শব্দ দুটো বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, অন্যটি ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাস। যিনি অনস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তিনি আবার ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রকৃতি বা এই ধরনের অন্য কোনোকিছুতে বিশ্বাস করেন। এই শব্দদুটোর বিপরীত শব্দ হচ্ছে সংশয়। একজন সংশয়বাদীকে কি এর যে-কোনো একটি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বা পক্ষে দাঁড় করানো যাবে? যে-কোনো একপক্ষে দাঁড় করালে তার অন্যপক্ষে চলে যাবার সম্ভাবনাটিও পুরোমাত্রায় রয়ে যাবে। সংশয়বাদীদের নিয়ে নাহয় একটু পরে বলি, তার আগে বরং আস্তিক-নাস্তিকদের নিয়েই কিছু চিন্তাভাবনা করা যাক।

আমাদের দেশে আস্তিকতা-নাস্তিকতার ধারণাটি খুবই অদ্ভুত। ব্যাপারটি আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বে বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে নেই; দাঁড়িয়ে গেছে ধর্মে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর। অর্থাৎ যিনি ধর্মে বিশ্বাস করেন তিনি আস্তিক, যিনি করেন না তিনি নাস্তিক। এই কনসেপ্টটিকে পরিপূর্ণ বলা যায় না। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরের প্রতি যার বিশ্বাস নেই অথচ অন্য কোনো মহামহিম ক্ষমতাবান অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আছে আমাদের দেশে তাকে নিশ্চয়ই কেউ আস্তিক বলতে চাইবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তো আস্তিকই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস আছে কি নেই সেটা তো কোনো প্রশ্নই নয়। অন্যদিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারেই কোনো ভাবনাচিন্তা নেই অথচ ধর্ম-প্রণীত আচার-আচরণ মহাসাড়ম্বরে পালন করেন এমন সব ব্যক্তিকে সবাই আস্তিক বলবেন, যদিও তাঁর আস্তিক্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরে আস্থা নেই, এমন লোককে আস্তিক বলা যায় কীভাবে? প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বলতে হবে যে, তিনি আস্তিক নন, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে—ধর্ম মেনে চলা বা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মোটামুটি নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করার পরিবর্তে একজন মানুষ তার নিজের মতো করে একজন ঈশ্বরের কল্পনা করতে পারেন, এবং তাঁকে আস্তিক বললে খুব বেশি ভুল করা হবে না। এ-প্রসঙ্গে আমরা লালনেরই আরেকটি গানের উদাহরণ দিতে পারি। 'পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়' এই গানটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এরকম :

নবী না মানে যারা
মওয়া ছেদ কাফের তারা
আখেরে হয়

এই পঙ্‌ক্তি শুনে যে-কেউ মনে করবেন, লালন ইসলামধর্মে প্রচারিত মতেরই প্রতিধ্বনি করছেন। কিন্তু এর পরের বাক্যগুলো এরকম :

যে মুর্শিদ সেই তো রাসুল ইহাতে নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয়

এই পঙ্‌ক্তি অবশ্যই ইসলামের মূলতত্ত্ব বিরোধী। কারণ এখানে মুর্শিদ অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষকে (হতে পারেন তিনি সাধকপুরুষ) প্রথমত রসুলের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে (রসুল নিজে কোনো সাধারণ পুরুষ নন, ইসলাম ধর্মমতে তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ—মহামানব)। তবু শরিয়তপন্থি লোকেরা হয়তো একথাটি মেনে নিতে আপত্তি করবেন না, কারণ রসুলই বলেছেন—আমি তোমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ, পার্থক্য শুধু এই যে, আমার কাছে আল্লাহর অহি আসে, তোমাদের কাছে আসে না (এটাকে অবশ্য তাঁর অপূর্ব বিনয়ের প্রকাশ বলেই আমার মনে হয় কারণ যাঁর কাছে আল্লাহর অহি আসে তিনি সাধারণ মানুষ হন কীভাবে?)। কিন্তু লালন যখন বলেন *খোদাও সে হয়*—তখন ইসলামধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতিবাদস্বরূপ একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠার কথা। কারণ রসুল উপরোক্ত কথাটি বলেছিলেন যেন তাঁর অনুসারীরা আল্লাহর সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে না ফেলেন এবং তাঁকেই আল্লাহ বলে ভাবার মতো ভুল না করেন। কিন্তু এখানে লালন তা-ই করেছেন। মুর্শিদ (সাধারণ মানুষ), রসুল (মহাপুরুষ) ও খোদা (সৃষ্টিকর্তা)-কে তিনি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন—এবং পঙ্‌ক্তিটি পরিষ্কারভাবে একথাটিই বলতে চায় যে, মানুষ এবং খোদা একই রূপের দ্বিবিধ প্রকাশ অথবা মানুষের মধ্যেই খোদা বিরাজমান—তাঁর আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। এই মত মূল ইসলাম সমর্থন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে না (যদিও এর সঙ্গে সুফিবাদ-কথিত মতের বেশ মিল পাওয়া যায়)। প্রশ্ন হল : লালনের খোদা তা হলে কে, এই ধারণাই-বা তিনি কীভাবে কোত্থেকে পেলেন?

এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও বলা যায়। মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে যতগুলো প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম, আর রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক প্রতিভার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গানে। কি কথায় কি সুরে তিনি এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীতে এমন 'সংগীত-প্রতিভা' আর দেখা যায় না। মানুষের জীবনের এমন কোনো একটা-না-একটা গান রবীন্দ্রনাথের আছে। কিন্তু তাঁর এই বহুবিচিত্র গানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিভার ছোঁয়া পেয়েছে তাঁর প্রার্থনাসংগীতগুলো। মানুষের সমর্পণ ও আত্মনিবেদনের এমন অসামান্য আকুতি ও আর্তি অন্তত আমার জানামতে অন্য কোনোকিছুতে ধরা পড়েনি। তো, তাঁর একটি প্রার্থনাসংগীতের উদাহরণ দিই :

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর স্বামী, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

রবীন্দ্রনাথের আস্তিকতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবেন না, জানি, কিন্তু এই গানের প্রভু কোন ধর্মগ্রন্থের? বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কোনো ঈশ্বর তো তাঁর অনুরাগীর এমন অন্যায় আবদার রাখবেন বলে মনে হয় না। এমন প্রেমময় আহ্বানে তাঁকে পটানো যাবে না, উলটো দ্বার বন্ধ দেখে তিনি রেগে যেতে পারেন। প্রভুর এমন কী দায় পড়েছে, বন্ধ দ্বার ভেঙে অনুরাগীর হৃদয়ে প্রবেশ করবেন?

শুধু কবিদের মধ্যেই নয়, বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কখনো কখনো এমন অদ্ভুত ঈশ্বরবিশ্বাস দেখা যায়। মানব-ইতিহাসের আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা আইনস্টাইন একবার অনিশ্চয়তা তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কে (তিনি ঐ তত্ত্বের বিপক্ষে ছিলেন) যুক্তি দিয়ে সুবিধা করতে না পেরে *দি গড ক্যান নট গ্যাম্বলিং* বা *ঈশ্বর জুয়া খেলতে পারেন না*—বলে অদ্ভুত এক অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য ছুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মন্তব্যটি থেকেই তাঁর মানসজগৎ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় : ১. তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন এবং ২. এই ঈশ্বর কোনো ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর নয়। কেন বলছি একথা? আইনস্টাইন ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ইহুদি ছিলেন। ধরা যাক তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস ইহুদিধর্ম-প্রভাবিত। সেক্ষেত্রে বলতেই হয়, যে-কোনো ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর জুয়া খেলতে খুবই পছন্দ করেন এবং প্রায়শই জুয়া খেলে থাকেন। অর্থাৎ কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন, এবং যা ইচ্ছে তা-ই করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। অতএব ঈশ্বর জুয়া খেলতে *পারেন না* বলে তিনি যেমন তাঁর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিলেন (*পারেন না* শব্দটিই সীমাবদ্ধতার পরিচায়ক), অন্যদিকে ইঙ্গিত করলেন—তাঁর ঈশ্বর অবশ্যই নিয়মকানুন মেনে চলেন, বিজ্ঞানীদের কাজই সেই নিয়মকানুনগুলো আবিষ্কার করা—জুয়াড়িদের মতো কোনো অনিশ্চিত ব্যাপারস্যাপার নিয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। এই কথাটি অনেক পরে স্টিফেন হকিংও বলেছেন। তাঁর মতে—একজন ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ই কিছু নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছেন এবং এইসব নিয়মকানুনে তিনি নতুন করে হস্তক্ষেপ করেন না, কোনো পরিবর্তন করেন না, সত্যি বলতে কি সেই ক্ষমতাই তাঁর নেই। ধার্মিকেরা তো বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না অথচ হকিং বলছেন—মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার সময় নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এর পরে তাঁর আর কোনো ভূমিকা নেই। আইনস্টাইন বা হকিং-এর এই ঈশ্বরই-বা কোন ঈশ্বর? কোনো ধর্মের সঙ্গে কি তা মেলে?

লালনের দয়াল/খোদা, রবীন্দ্রনাথের প্রভু কিংবা আইনস্টাইনের গড কোনো ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর নন, অথচ এঁরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের মতো কোনো-একজনকে কল্পনা করেছেন। এঁদেরকে কি আমরা আস্তিক বলব? আস্তিক বলতে তো আমরা কোনো ধর্মাবলম্বীকে বোঝাই, অথচ প্রচলিত কোনো ধর্মে এঁদের আস্থা ছিল না। সেক্ষেত্রে তাঁরা তো আস্তিকই থাকেন না, আবার নাস্তিকও তো বলা যাচ্ছে না, তাঁরা যে বিশ্বাস করেন! আমি এতক্ষণ ধরে তাঁদেরকে আস্তিকই বলেছি, কিন্তু এখন সম্ভবত বলা যায়—এঁরা প্রত্যেকেই সংশয়ী। প্রচলিত ঈশ্বরধারণার প্রতি এঁদের সকলেরই সংশয় ছিল বলে তাঁরা নতুন এমন একজন ঈশ্বরের প্রকল্প দাঁড় করিয়েছেন যেটা তাঁদের দার্শনিক প্রতীতির সঙ্গে মেলে।

AMARBOI.COM

এই ঈশ্বরের স্বরূপটা কীরকম? এঁরা এই ঈশ্বরের ধারণাই-বা পান কোত্থেকে? কেউ হয়তো লালনের ওপর সুফিবাদের প্রভাব খুঁজে পাবেন, অথবা ভারতবর্ষের প্রেম ভক্তিবাদের এবং বৌদ্ধ সহজিয়াবাদের প্রভাবও খুঁজে দেখতে চাইবেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর তো লালন, কবীর প্রমুখ মরমিদের প্রভাব প্রায় স্পষ্ট। কিন্তু যে-প্রভাবই থাকুক-না কেন, ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরের সঙ্গে যে তাঁদের ঈশ্বরের মিল প্রায় নেই—একথা সবাই বোঝেন। এমনকি ইসলামধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পর্কিত সুফিবাদের ঈশ্বরও ইসলামি ঈশ্বর নন! মানুষ হচ্ছে ঈশ্বরেরই একটি প্রকাশ মাত্র এবং মানুষ সাধনার মাধ্যমে নিজেকে এমন এক স্তরে উন্নীত করতে পারেন যখন মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, তাঁরা একই সত্তায় পরিণত হন—এই হচ্ছে সুফিবাদীদের বক্তব্য। এ-প্রসঙ্গে মনসুর হেল্লাজের উদাহরণ টানা যেতে পারে। কথিত আছে তিনি সাধনার এমন এক উচ্চতর স্তরে আরোহণ করেছিলেন যে, নিজেকে আল্লাহ থেকে পৃথক করতে না পেরে 'আমিই সত্য' (আনাল হক) বলে দাবি করেছিলেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে মনসুর হেল্লাজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। (শরিয়তপন্থিদের মতে, নিজেকে বা অন্য কাউকে, এমনকি নবীকেও, আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, আল্লাহর শরিক বা অংশ হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না। নিজেকে আল্লাহ হিসেবে দাবি করা তো ভয়াবহ অপরাধ। জ্ঞানত ও অজ্ঞানত আল্লাহর কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরিক করা মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ)। তো, তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তাঁর রক্ত থেকেও *আনাল হক* ধ্বনি বেরিয়ে আসতে থাকে, অতঃপর তাঁর সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি টুকরো থেকে *আনাল হক* শব্দটি ধ্বনিত হতে থাকলে টুকরোগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু মাংস-পোড়া ছাই থেকেও এই ধ্বনি নির্গত হতে থাকলে শরিয়তপন্থিরা ভয় পেয়ে ঐ ছাই সাগরে নিক্ষেপ করেন, এবং পরিণামে সাগরের পানি ফুলেফেঁপে উঠে *আনাল হক* ধ্বনিতে সমস্ত শহর ভাসিয়ে নিতে উদ্যত হয়। মনসুর হেল্লাজ নিজের এই পরিণতি আগে থেকেই জানতেন (যিনি নিজেকেই খোদা বলে দাবি করেন, তিনি যে আগে থেকেই নিজের পরিণতি জেনে ফেলবেন সে আর বিস্ময়কর কী!), তাই তাঁর এক অনুসারীকে এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সেটা আগেভাগেই বলে গিয়েছিলেন, ফলে সেবারের মতো শহরটি রক্ষা পায়।

যাহোক, সুফিবাদের এই আল্লাহর সঙ্গে মূল ইসলামের আল্লাহর ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মূল ইসলামের কনসেপ্ট অনুযায়ী আল্লাহ একটি ইউনিক (একক/অদ্বিতীয়) সত্তা, অন্য সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। অর্থাৎ সম্পর্কটা এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির। আর সুফিবাদ বলছে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টজগতের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই, কারণ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন মাত্র। এই ধারণা এখন আর আমাদের কাছে বৈপ্লবিক বলে মনে হয় না, কিন্তু সুফিবাদের জন্মকালে এসব কথাবার্তা কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল ভেবে দেখুন! ইসলামের পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে, ইসলাম-সৃষ্ট আল্লাহকে মেনে নিয়ে এবং নবীকে এবং ইমানের অন্যান্য অনুষঙ্গগুলোকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁরা আল্লাহর ভিন্নতর একটি রূপ দাঁড় করিয়েছিলেন।

এই যে প্রচলিত ধর্মমতসমূহের বাইরে গিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি বা নিজের জন্যই ঈশ্বরের একটি রূপ তৈরি করেন মনীষীরা, তার কারণ কী? সঠিক কারণটি নির্ণয় করাটা খুবই দুরূহ; সম্ভাব্য কারণটি হয়তো এই যে, তাঁরা অনুভব করেন—নিজেকে সমর্পণের জন্য, নিজেকে নিবেদনের জন্য এমন একজনের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। কেমন একজন? প্রেমময়, দয়াময়, ক্ষমাশীল একজন। এমন একজন যিনি কথায়-কথায় নরকের ভয় দেখান না, স্বর্গের লোভও দেখান না, শাস্তি দেবার জন্য উদ্যত হস্তে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন না, অনুরাগীর অপরাধকে তিনি দেখেন ক্ষমাসুন্দরের দৃষ্টিতে, যাঁর কাছে দাবি করা যায়, যাঁর ওপর অভিমান করা যায়, রাগ করা যায়, এমনকি তাঁর কোনো নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে অভিযুক্তও করা যায়। প্রেম নিবেদনে যিনি আনন্দিত হন, অনুরাগীর সমর্পণ যাঁকে খুশি করে তোলে। প্রেমের মাত্রাটা বেশি হয়ে গেলে যিনি নিজের বিরাটত্ব ভুলে গিয়ে অনুরাগীর বন্ধ দুয়ার খুলে ঢুকে পড়েন, নিজেকে প্রকাশ করেন, অনুরাগীর প্রেমের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করেন, তিনি ভয়ংকর নন, বীভৎস নন, বিদ্বেষপরায়ণ নন, শাস্তিদাতা নন, ভীতিকর নন। তিনি প্রেমময় এবং সুন্দরের পূজারি, সমর্পণ আর নিবেদনই তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আর কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

কিন্তু এমন একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেন স্বীকার করে নেন মনীষীরা? প্রচলিত কোনো ধর্মে যাঁদের কোনো আস্থা নেই, তাঁরা কেন এরকম একেকজন নতুন নতুন ঈশ্বরের জন্ম দেন, তিনি না থাকলে তাঁদের এমন কী যায় আসে? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ, উত্তর জানতে হলে এঁদের মনোজগৎটি বুঝতে হবে। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মনোজগৎ বোঝা সহজ কাজ নয়। লেখকের সাহিত্যকর্ম, শিল্পীর শিল্পকর্ম, বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইত্যাদি দিয়ে সংশ্লিষ্টদের দার্শনিক উপলব্ধির জগৎটি খানিকটা বোঝা গেলেও মনোজগৎ বোঝা দুষ্কর। কারণ সৃষ্টিশীল মানুষটি যতই প্রতিভাবান হন না কেন তাঁর উপলব্ধির খুব কম অংশই তিনি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে যেতে পারেন—অধিকাংশটুকুই রয়ে যায় অপ্রকাশিত অবস্থায়। প্রকাশ করার মতো সময়, উপযুক্ত ভাষা বা প্রকরণ খুঁজে পান না তাঁরা। কিন্তু এসবের চেয়ে সত্যিকথাটি হয়তো এই যে, সেই উপলব্ধিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারাটাই এক অসম্ভব ব্যাপার। যে-সুগভীর মগ্নতার ভেতর এঁদের কাছে সেই মহামহিম রূপটি ধরা দেয়, সচেতন হলেই তিনি হারিয়ে যান, কেবল রয়ে যায় তাঁর রেশটুকু। এখানে সেই মগ্নতার কথাটিও একটু বলা দরকার। মানব-ইতিহাসের যেসব মহামানবের সৃষ্টিকর্ম দেখে আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হই, তার অধিকাংশই ওই মগ্নতা থেকে উৎসারিত। সাহিত্যশিল্পীর সাহিত্যকর্ম, বিজ্ঞানীর তত্ত্ব, সঙ্গীতজ্ঞের কথা ও সুর—এ সবকিছুর মধ্যে যেগুলো কালজয়ী হয়, যুগ যুগ ধরে আমাদের আপ্লুত, বিমোহিত ও অভিভূত করে যায়—সেগুলোর জন্ম যেন কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়নি বলে মনে হয় আমাদের, যেন কোনো অজানা-অচেনা সূত্র থেকে সেগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

শহীদ সঙ্গিতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হচ্ছে *আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি* গানটি সুর করা। এই সুরটি যখন বেজে ওঠে তখন শ্রেণী-পেশা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হলেও থমকে দাঁড়ায়, তাদের মন একবারের জন্য হলেও কেঁদে ওঠে; এমনকি ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস জানা না-থাকলেও সুরটির কারুকার্য মানুষের মনকে এক অজানা বেদনাবোধে আক্রান্ত করে। আমার মনে হয়—এদেশের মানুষের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি এমন আদরণীয় হয়ে ওঠার পেছনে এই সুরটির একটি অত্যন্ত গভীর প্রভাব আছে। এর কারণ হয়তো এই যে, এই সুরটির মধ্যে দিয়ে এই জাতির কান্না মূর্ত হয়ে উঠেছে। ধারণা করি আলতাফ মাহমুদ এটিই করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে নিপীড়িত, নির্যাতিত হয়ে এসেছে কিন্তু কোনোদিনই তেমন কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। আর সেটা পারেনি বলেই এই নিরীহ জাতিটি এক সুগভীর বেদনায় নিমজ্জিত হয়েছে, কান্নায় গুমরে মরেছে। আলতাফ মাহমুদ চেয়েছিলেন একটি সুরের মধ্যে দিয়ে তিনি এই জাতির সেই বেদনা দুঃখ কষ্ট কান্না এবং নিপীড়িত-নির্যাতিত হবার ইতিহাসকে মূর্ত করে তুলবেন, এবং তিনি সফল হয়েছেন। এ যে কী বিশাল প্রতিভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় দেয় তা ভাবা যায় না। এই গানটির কথা কিন্তু তেমন শক্তিশালী বা হৃদয়স্পর্শী নয়, সত্যি বলতে কি কথাগুলো যে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, আলতাফ মাহমুদ সুর করার আগে গানটি আবদুল লতিফের সুরে প্রায় এক যুগ ধরে গীত হয়েছে, কিন্তু মানুষের মনে সেটি তেমন কোনো অভিঘাত তৈরি করতে পারেনি। বোঝা যায়—আবদুল লতিফের সুরে আলতাফ মাহমুদ সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তিনি নিজেই এটিতে সুর করার কথা ভেবেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই গানটি রচিত হবার এবং প্রথমবার সুর হয়ে যাবার পর তিনি নতুন সুর করতে এক যুগেরও বেশি সময় নেন। আগেই বলেছি তিনি এমন এক সুর খুঁজছিলেন যা দিয়ে হাজার বছরের বাঙালির চেপে-রাখা কান্নাটাকে মূর্ত করে তোলা যায় এবং তেমন একটি সুর সহসা পাওয়া যায় না—তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সাধনা করতে হয়—এক যুগ ধরে হয়তো তিনি সেটাই করেছিলেন এবং অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সুরটি তাঁকে ধরা দেয়। এই অসামান্য সুরটি তিনি পেয়েছিলেন কোথায়—এ-কি তাঁর সচেতন সৃষ্টি, নাকি গভীর কোনো মগ্নতার ফল যা তাঁকে সুরটি উপহার দিয়েছিল!

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

আইনস্টাইন তার বিখ্যাত *স্পেশাল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি* প্রণয়ন করেন ১৯০৫ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩! এই তত্ত্ব মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের প্রচলিত ধারণাগুলোকে আমূল বদলে দেয়। শুধু বিজ্ঞানেই নয়, এর প্রভাব পড়ে সাহিত্যে, দর্শনে, মনোবিজ্ঞানের আলোচনায়, সংস্কৃতিতে, এমনকি অর্থনীতি এবং রাজনীতিতেও। মানব-ইতিহাসে এমন যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর আসেনি। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটি নয়, আমি শুধু দুএকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করব। এই তত্ত্বের শুরুতেই তিনি দুটো স্বতঃসিদ্ধ (postulates) দেন। এর প্রথমটি আলোর বেগসংক্রান্ত যা পুরো উনিশ শতক জুড়ে চলতে-থাকা ইথার-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিতর্কের অবসান ঘটায়। একটিমাত্র বাক্যে যে-যুবক একশো বছরের বিতর্কের অবসান ঘটান তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করাটাও সাহসের কাজ—সে-সাহস আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানকর্মী করে উঠতে পারেননি। দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে পৃথিবীর সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে মহাবিশ্বের অসীম পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেন। তিনি বলেন—পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো পৃথিবীর মতোই মহাবিশ্বের সর্বত্র এককভাবে প্রযোজ্য হবে। তাঁর এই দুটো স্বতঃসিদ্ধ তাঁর মূল কাজের কণামাত্র নয়, অথচ তিনি যদি কেবল এই দুটো কথা লিখেই মরে যেতেন তা হলেও বিজ্ঞানের জগৎ চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করত—এমনই ছিল এর গুরুত্ব। তাঁর মূল তত্ত্ব ছিল অভূতপূর্ব সব ধারণার সমন্বয় যা মানুষের প্রচলিত ধারণাকে চিরকালের জন্য পালটে দেয়। এর মূল কথাটি হল—পরম বলে কোনোকিছু নেই, সবকিছুই আপেক্ষিক; কোনোকিছুকে বিচার করা যায় কেবল অন্য কোনোকিছুর সাপেক্ষে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে থেকে গাণিতিক শৃঙ্খলা মেনে তিনি যে-তত্ত্ব আবিষ্কার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন তা ঝামেলা পাকাল দর্শনের আলোচনায়। সেখানেও চলে এল আপেক্ষিকতা। সবকিছুই আপেক্ষিক—একথাটি যেন বেদবাক্যের মতো হয়ে উঠল। এমনকি ঈশ্বরও। অর্থাৎ ঈশ্বর কোনো পরম সত্তা নয়, পরম সত্যও নয়। তিনিও আপেক্ষিকভাবে সত্য। বিশ্বাসীদের কাছে তিনি সত্য, অবিশ্বাসীদের কাছে মিথ্যা। আপেক্ষিকতত্ত্বের জন্য ঈশ্বরের এই পরিণতি দেখে আইনস্টাইন ব্যথিত হয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত তত্ত্বই গিয়েছিল ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরচিন্তার বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালে *জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি* তত্ত্বে তিনি আলোর গতিপথ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলেছিলেন—আলো সবসময় সরলরেখায় চলে না, কখনো কখনো বাঁকাপথও অনুসরণ করে। এটিও ছিল অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য প্রস্তাব। কারণ এর আগে পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে আলো কেবলমাত্র সরলরেখাতেই চলে। তাঁর কথা প্রথমে মেনে নেওয়া হয়নি। পরে যখন পরীক্ষা করে তাঁর কথার সত্যতা পাওয়া গেল তখন তিনি বলেছিলেন—আলো যদি না বাঁকত তা হলে ঈশ্বরের জন্য দুঃখ করা ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না, কারণ জানতাম আলো বেঁকেই আসবে, তিনি না-বাঁকালে আমি কী করব! অর্থাৎ ঈশ্বরকে চলতে হবে আইনস্টাইনের নিয়ম মেনে! এ কেমন ঈশ্বর!

আগেই বলেছি, আইনস্টাইনের সমস্ত তত্ত্বই ছিল প্রচলিত ঈশ্বর-ধারণার বিরুদ্ধে, অথচ তিনি নিজে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। এর মানে কী? তিনি কোন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন? এ কি তাঁর নিজের বানানো ঈশ্বর? তাঁর কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়—তাঁর ঈশ্বর বেশ নিয়মকানুন মেনে চলেন এবং কোন কোন নিয়ম তিনি মেনে চলেন বা চলবেন সেটা মানুষের পক্ষেই বলে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা ঈশ্বর নিজে বলবেন না, বলবে মানুষ! তা হলে যেসব গ্রন্থকে ঐশ্বরিক বলে দাবি করা হয় সেসবের আর মর্যাদা রইল কোথায়? রইল না। আইনস্টাইন সেগুলোর তোয়াক্কাও করেননি। তবু যে তিনি একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন তার কারণ হয়তো এই যে, তাঁর সচেতন মন ও অভিব্যক্তি তাঁর তত্ত্বগুলোর জন্ম-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারত না। একজন অল্পবয়সী যুবক যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন কীভাবে তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সেটা বলা সত্যিই দুষ্কর। বিজ্ঞানীরা আত্মভোলা হন, আইনস্টাইন সম্বন্ধেও এমন গল্প অনেক ছড়িয়ে আছে—তার কারণ হয়তো এই যে, এক গভীর মগ্নতা তাঁদেরকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফ্যালে। আর ওই মগ্নতা, সাধনা, ধ্যানই জন্ম দেয় ওরকম অভূতপূর্ব সব বৈজ্ঞানিক ধারণা, অসামান্য সুর, ব্যাখ্যাতীত সাহিত্য ইত্যাদি। মগ্ন থাকেন বলে এঁরা বিচ্ছিন্ন থাকেন দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাত্যহিকতা থেকে আর এইসব শিল্পী মনে করেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জন্ম কোনো অজানা উৎস থেকে, এসবের পেছনে যেন কারো হাত আছে। এইসব যেন তাঁরা সৃষ্টি করেন না, তাঁদেরকে ধরা দেয়। (এদেশের একজন অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক আমাকে একবার বলেছিলেন, *নিজের লেখাগুলো পরে পড়তে গিয়ে মনে হয়—লেখার সময়*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যেন অন্য কারো করতলে ছিলাম, মনে হয় ওগুলো আমি লিখিনি, আমাকে দিয়ে কেউ লিখিয়ে নিয়েছে!) যে-উৎস থেকে এসব আসে তাকেই তাঁরা দয়াল বলেন, প্রভু বলেন, গড বলেন—প্রচলিত ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁর মিল নেই বললেই চলে। এই ঈশ্বর তাঁদের নিজস্ব ঈশ্বর যিনি তাঁদেরকে সৃষ্টিকর্ম উপহার দেন; তাঁর সঙ্গে তাই সম্পর্কটি ভয়ের নয়, প্রেমের ও কৃতজ্ঞতার। আর এই প্রেম ও কৃতজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় সমর্পণ। বিশ্বাসীরাই শুধু তাদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হন—কথাটি ঠিক নয়, অবিশ্বাসী এবং সংশয়ীরাও জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে সমর্পিত হন কারো-না-কারো কাছে; হয়তো কোনো সুনির্দিষ্ট ঈশ্বরের কাছে নয়, তবু তিনি কোনো-না-কোনো অর্থে সমর্পিত ব্যক্তিটির চেয়ে অনেক বড়, মহান এবং দয়াময়। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক বা সংশয়ীদের এই সমর্পণ অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তাদের কোনো সংজ্ঞায়িত ঈশ্বর নেই। আমার তো মনে হয় বিশ্বাসীরা কোনোদিনই আপাদমস্তক সমর্পিত হতে পারেন না, তাদের ঈশ্বর-ধারণা সুনির্দিষ্ট এবং সংজ্ঞায়িত বলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্ত াভাবনা করার সময় এবং প্রয়োজন তাদের নেই, তারা তাই ধর্মের কতগুলো আচার মেনেই সন্তুষ্ট থাকেন। ফলে তাদের নিয়মিত ধর্মচর্চা নিছক আচারসর্বস্বতায় পরিণত হয়।

AMARBOI.COM

লালন, ওমর খৈয়াম, মির্জা গালিব, হাফিজ, কবীর, রবীন্দ্রনাথ, আইস্টাইন—এঁরা কেউই হয়তো প্রথমজীবনে প্রচলিত কোনো ধর্মে পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করেননি; আবার তাঁরা যে নাস্তিক ছিলেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এঁরা ছিলেন সংশয়ী। নিজেদেরকে তাঁরা রেখেছিলেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে। ফলে তাঁদের জীবনে যখন একধরনের সমর্পণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল—নিজেদের মতো করে একজন ঈশ্বরের ধারণা তাঁরা তখন তৈরি করে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা বলা যাক :

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে
অনেক দেরি হয়ে গেল
দোষী অনেক দোষে।

বিধিবিধান-বাঁধন-ডোরে
ধরতে আসে, যাই যে সরে—
তার লাগি যা শাস্তি নেবার
নেব মনের তোষে
তাই রয়েছি বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকে আমায় নিন্দা করে,
নিন্দা সে নয় মিছে—
সকল নিন্দা মাথায় ধরে
রব সবার নীচে।

শেষ হয়ে যে গেল বেলা
ভাঙল বেচা-কেনার মেলা—
ডাকতে যারা এসেছিল
ফিরল তারা রোষে
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

বলা বাহুল্য এ হচ্ছে আচারসর্বস্ব ধর্মের প্রতি একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ। অন্যদিকে এই কবিতাটিকে সংশয়ীদের সমর্পণ সম্বন্ধে একটি চমৎকার উপলব্ধির প্রকাশ বলেও ধরে নেওয়া যায়। বিধিবিধান যখন তাঁদেরকে ধরতে আসে তখন তাঁরা সরে যান, অনেক দোষে দোষী হন, অনেকভাবে নিন্দিত হন—এ সবই তাঁরা মেনেও নেন, তবু প্রেমের হাতে ধরা দেবার জন্য তাঁরা বসে থাকেন। আরেকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

একটি নমস্কারে প্রভু
একটি নমস্কারে,
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।

AMARBOI.COM

হয়তো সংশয়ীদের সমর্পণ এমনই, তাঁরা যখন সমর্পিত হন তখন একবারে লুটিয়ে পড়েন, এমন গভীর তাঁদের সমর্পণ।

৬

এত কথার অবতারণা করতে হত না যদি আমার বন্ধুটি লালনের ঐ গানটি নিয়ে মন্তব্যটি না করতেন। প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের সামনে গানটি তুলে ধরছি, আপনারাও একটু দেখুন এর মধ্যে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পান কি না—

ক্ষম ক্ষম অপরাধ, দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়।
বড় সংকটে পড়িয়া দয়াল বারেবার ডাকি তোমায় ॥
তোমারই ক্ষমতায় আমি
যা করো তাই পারো তুমি
রাখো মারো সে নাম-নামি
তোমার এ জগৎময় ॥
পাপী অধম তরিতে সাঁই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার পাবন নাম শুনতে পাই
সত্য মিথ্যা জানব হে সাঁই
তরাইতে আজ আমায় ॥
কসুর পেয়ে মারো যারে
আবার দয়া হয় তাহারে
লালন বলে এ সংসারে
আমি কি তোর কেহই নয় ॥

আগেই বলেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গানের মধ্যে কোনো দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পাইনি, পেয়েছি সমর্পণ, তুমুল সমর্পণ। দয়ালের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা। বড় সংকটে পড়েছেন তিনি—সে তো বলছেনই, পড়ে দয়ালকে ডাকছেন তার অজানা অপরাধ ক্ষমা করার জন্য। এই গানের মধ্যে আছে প্রেম, আছে ভালোবাসার দাবি—*আমি কি তোর কেহই নয়*—কিন্তু দ্বান্দ্বিকতা কোথায়? এমন অসামান্য এক সমর্পণের মধ্যে আমার বন্ধুটি তা হলে সেটা খুঁজে পান কেন? কেন গানটিকে একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেন? এর কারণ নিহিত আছে আস্তিক ও নাস্তিকদের মানসলোকের মধ্যে। পৃথিবীর সবকিছুকে মার্কসবাদের আওতায় নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আর সবকিছুকে ধর্মের আওতায় নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করা একই ধরনের রোগ বলে মনে হয় আমার। এই দুই ধরনের মানুষই জীবন ও পৃথিবীর সবকিছুকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি ফ্রেম তৈরি করেন—আর ওই ফ্রেমকেই তিনি স্ট্যান্ডার্ড মনে করেন। পৃথিবীর সবকিছুকেই ওই ফ্রেমে বন্দি করে ফেলাটা তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। একান্তই কোনো বিষয় যদি সেই ফ্রেমের মধ্যে না পড়ে তা হলে সেটাকে তীব্রকণ্ঠে অস্বীকার করেন। আস্তিকদের জন্য নাস্তিকতা আর নাস্তিকদের জন্য আস্তিকতা হচ্ছে ফ্রেমের বাইরের ব্যাপার—ফ্রেমে ফেলে বিষয়টিকে তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেন না বলেই অস্বীকার করেন। অন্যদিকে সংশয়ীদের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ফ্রেম থাকে না, ফলে তারা যে-কোনো বিষয়কেই স্বীকার বা অস্বীকার না করে বিবেচনায় নেন, সংশয় প্রকাশ করেন, বিষয়টির ভালো-মন্দ, ইতি ও নেতি খতিয়ে দেখেন আর এইদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় সংশয়ীরা দার্শনিকভাবে অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁদের বিবেচনার আকাশটি অনেক বড়, তাঁদের ভাবনাচিন্তার জগৎটি ফ্রেমবন্দি নয়, আর তা ছাড়া কে না জানে আকাশকে কখনো ফ্রেমবন্দি করা যায় না!

৭

কিন্তু সংশয়ীদের নিয়ে একটি বড় সমস্যাও আছে। সেটি হচ্ছে—দার্শনিকভাবে তাঁদের ওপর কোনো আস্থা রাখা যায় না। তাঁরা যে কখন কোন দলে যাবেন সে-ব্যাপারে আগাম কিছুই বলা যায় না। আপনি আস্তিকদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, পারেন নাস্তিকদের ওপরেও, কারণ তাদের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস আছে। আপনি ধর্মপন্থিদের ওপর আস্থা রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন, পারেন মার্কসবাদীদের ওপরেও—কারণ তাদের মনোজগতের প্যাটার্নটি আপনার মোটামুটিভাবে জানা। কিন্তু সংশয়ীরা কোনদিকে যাবে তা আপনি বুঝবেন কীভাবে? না, বোঝার উপায় নেই। অতএব আপনি যদি কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চান তা হলে ভুলেও সংশয়বাদীদের কথা শুনতে যাবেন না। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে সংশয়বাদী দর্শন এক বিরাট প্রতিবন্ধক। এজন্যই বলেছি, আস্তিকদের শত্রু নাস্তিকরা নয়, নাস্তিকদের শত্রু নয় আস্তিকরা—কারণ এরা পরস্পরের স্বরূপ জানে, এরা বড়জোর পরস্পর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে শত্রু হচ্ছে সংশয়ীরা, কারণ এদের স্বরূপ কেউ জানে না। এদের মোকাবেলা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট আকারের ফ্রেম তৈরি করতে হবে, সবকিছুকে সেই ফ্রেমে বন্দি করে বিচার করতে হবে এবং ফ্রেমের বাইরের সবকিছুকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে, যদিও এরকম করলে আপনি হয়ে উঠবেন একজন ছাঁচে ঢালাই করা মানুষ—তাতে ক্ষতি নেই যদি আপনার লক্ষ্যটি অর্জিত হয়।

সংশয়ীদের ওপর যদি আস্থা না-ই রাখা যায় তা হলে তাদের বিশাল আকাশ থেকে লাভটা কী হল? তারা তো সর্বদা পরিত্যাজ্য। না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো লক্ষ্য অর্জন বা জাতীয় জীবনের কোনো লক্ষ্য অর্জনেও সংশয়ীরা তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না, তারা বরং পরিত্যাজ্যই, কিন্তু জীবন তো শুধু ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় জীবনের বৈষয়িক লক্ষ্য অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মহত্তম কোনো দার্শনিক লক্ষ্যও থাকতে পারে। সেরকম কোনো মহত্তর উপলব্ধি অর্জন করতে হলে আপনাকে সংশয়ীই হতে হবে।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমাদের দেশে যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেন, কিংবা ইসলামি হুকুমত কায়েমের স্বপ্ন দেখেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেন তাঁরা বলতে পারেন না যে, এই লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেলে তাঁদের পরবর্তী করণীয় কাজটি কী হবে! চিন্তাটিকে আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়া যাক। ধরা যাক, সারাবিশ্বই একদিন সামজতান্ত্রিক বিশ্বে রূপান্তরিত হল বা সারাবিশ্বেই একদিন ইসলামি হুকুমত কায়েম হয়ে গেল, এরপর মানুষ কী করবে? ওরকম কোনো অবস্থা যদি সত্যি সত্যি তৈরি হয় তাহলে সেই পৃথিবী কি আর বসবাসযোগ্য থাকবে? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আল্লাহর ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কান্নাকাটি করছে, কিংবা পৃথিবী জুড়ে মানুষ একটি অভিযোগহীন জীবনযাপন করে যাচ্ছে—এরকম পৃথিবী তো ভয়াবহ। ওরকম বৈচিত্র্যহীন পৃথিবীতে আত্মহত্যা করা ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোনো পথ খোলা থাকবে বলে তো মনে হয় না। মুশকিল হল—এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে কেউই সহজে মুখ খুলতে চান না, বরং 'আগে তো সেই সমাজ অর্জিত হোক' এরকম কথা বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। ইসলামপন্থিদের মধ্যে দার্শনিক খুঁজে পাওয়া আর এক সমুদ্রজলে একটি সুই খুঁজে পাওয়া একই কথা—তাই তাদের কাছ থেকে এর সদুত্তর পাওয়ার আশা করাই বৃথা। কিন্তু বামপন্থি দার্শনিকরা কেন এটা নিয়ে কথা বলেন না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন তাঁরা বলেন 'আগে তো সেই সমাজ অর্জিত হোক তারপর দেখা যাবে'! কেন পরে দেখা যাবে? কেন এখনই বলা যাবে না? যাবে না, কারণ তাঁরা জানেন—ওটা একটা ইউটোপীয় সমাজ, ওই সমাজ কোনোদিনই অর্জিত হবে না। জেনেশুনেও কেন তাঁরা অমন একটি অলঙ্ঘনীয় ফ্রেম তৈরি করেন বলা মুশকিল। যাই হোক, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে না-চাওয়া বা প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার আরেকটি কারণ হয়তো এই যে, এই দার্শনিকরা জানেন—ওরকম একটি সমাজ অর্জিত হওয়া পর্যন্তই কেবলমাত্র তাঁদের দর্শন ক্রিয়াশীল থাকতে পারে, এরপর তার আর কোনো ভূমিকা থাকবে না। বলা বাহুল্য কানো দর্শন যদি সত্যি সত্যি এমন একটি সমাজ মানুষকে উপহার দিতে পারে তা হলে সেটি এর বিরাট সাফল্য, এরপর এর মৃত্যু ঘটলেও কিছু যায় আসে না।

কিন্তু এইসব ক্ষেত্রেও সংশয়ীরা ক্রিয়াশীল থাকতে পারেন। সংশয়ীদের কৌতূহলের শেষ নেই, প্রশ্নেরও শেষ নেই—আর তাই অনুসন্ধানেরও শেষ নেই। শেষ নেই বলেই সংশয়ীরা কোথাও দাঁড়ান না, অবিশ্রান্তভাবে এগিয়ে চলেন। ঈশ্বরবিহীন পৃথিবীতে তাঁরা নতুন ঈশ্বরের জন্ম দিতে পারেন—হয়তো এভাবেই কোনো-এক সুদূর অতীতে কোনো এক সংশয়ী মানবসমাজে ঈশ্বর-ধারণার সূচনা করেছিলেন—একইভাবে ঈশ্বরময় পৃথিবীতে তাঁরা সংশয়ী প্রশ্ন করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ কোনো অবস্থাই তাঁদের জন্য শেষ অবস্থা নয়। অন্য যে দর্শন যেখানে হেরে যায়, থেমে যায়—সংশয়ীরা তখনও থাকেন চলমান। এই একটি জায়গায় সংশয়ীরা অন্য সবার থেকে শ্রেষ্ঠ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

বাংলার জাগরণের প্রথম পুরুষ অক্ষয়কুমার দত্ত

'মানবকুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।'

—অক্ষয়কুমার দত্ত

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচারপদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা গিয়েছিল।

আজ থেকে বছর-সাতেক আগে অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাতে আমার মনে হয় বাঙালি জীবনে ও মননে তিনি নতুন চিন্তা ও চেতনার উদ্বোধক। কিন্তু এ-কথা লোকসমাজে বলা ও প্রচার করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। প্রথমত, আজকের তরুণসমাজে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রায়-অপরিচিত; বলা উচিত বিস্মৃত নাম। দ্বিতীয়ত, আমি এদেশের সুপরিচিত যে-কয়জন গুণীব্যক্তির সঙ্গে আলাপকালে তাঁর প্রসঙ্গ তুলেছি—তাঁরা প্রত্যেকেই খুব গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর নাম নিয়েছেন কিন্তু তাঁর গুরুত্ব কেন এবং কী তাঁর অবদান, সে-সম্পর্কে তেমন কিছুই তাঁরা বলতে চাননি বা বলতে পারেননি। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বা বাংলাদেশের কোনো লেখক তাঁকে নিয়ে একটি ভালো ও পূর্ণাঙ্গ বই লেখেননি—যাতে তাঁর সমগ্র জীবনের একটা চিত্র পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন দু-চারটে প্রবন্ধ কোথাও কোথাও দেখেছি। বইও দু-একটা আছে কিন্তু তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তারপর, যে-প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছে সেগুলোও বড় দুর্বল। অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচয় তাতে সামান্যই পাওয়া যায়। যথার্থ পরিচয় নেই বলাই চলে। উল্লেখ্য যে, সে-লেখাগুলো প্রায় সবই পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের। আমার কাছে মনে হয়েছে, এতবড় প্রতিভার প্রতি এ আমাদের নিতান্ত অবহেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন অবহেলা ও বিস্মৃতিকে ক্ষমা করাও মুশকিল! কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের এই বিস্মৃতি ও অবহেলার কারণ কী?

প্রতিনিয়ত দেখি, কত ছোট ছোট মানুষকে নিয়ে এখানে কতকিছু করা হয়! অথচ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষয়কুমার দত্তের মতো এতবড় মানুষকে লোকে চেনে না! কেন? ব্যাপারটা আমার কাছে অন্যরকম মনে হয়। আমি তাঁর জীবন ও কর্মের পরিচয় আরও গভীরভাবে জানা ও বোঝার জন্য অগ্রসর হতে থাকি এবং সে-সঙ্গে তাঁর রচনাবলিও সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। নানা তথ্য থেকে জানা যায়, তাঁর কিছু বই বেরিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বড় লাইব্রেরি খুঁজে আমি সে-সব বইয়ের সন্ধান পাইনি। এ থেকে বুঝতে পারি, তাঁর বই এ-মুহূর্তে বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য।

এরই মধ্যে পেয়ে যাই তাঁর সম্পর্কে তিনটি জীবনীগ্রন্থ। তার মধ্যে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত' বইটি নানা দিক থেকে মূল্যবান। কেননা এ-বই অক্ষয়কুমারের জীবনকালে তাঁর অনুমোদন নিয়ে লেখা। এ-বই খুলে দেখি প্রায় শুরুতেই তিনি লিখেছেন :

> আমি স্বদেশীয় অসামান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার মানস করি।...অক্ষয়বাবু আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, প্রথমত ইহাতে অসম্মত হন। পরে একান্ত যত্ন ও নিতান্ত আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ... অগত্যা সম্মত হইলেন।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন :

> লোকে যত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে, ততই স্ব স্ব দেশের চিরস্মরণীয় মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শিক্ষা করিবে ও তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পাঠে বিশেষ শিক্ষা পাইবে, এই বিবেচনায় মহানুভব অক্ষয়কুমার দত্তের এই ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হইল।

রাজকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন :

> মানুষ আপন চেষ্টায় কতদূর রেখাপড়া শিখিতে এবং জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহার একটা অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইচ্ছা করিলেই মানুষ যে জগতে বড় হইতে পারে—জ্ঞানী হইতে পারে, অক্ষয়কুমার নিজের কার্যদ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত স্বদেশীয় মনীষীদের মধ্যে 'অসামান্য ব্যক্তি'—তিনজন জীবনীকারের ভাষ্য অনুযায়ী তা বুঝতে পারি। কিন্তু কতখানি 'অসামান্য'? কারণ বাংলাভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এঁরা তিনজনই প্রায় অপরিচিত—যদিও মহেন্দ্রনাথ রায় রামমোহন রায়ের আত্মীয়। তিনি যে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রামাণ্য জীবনী লিখেছেন, এ-খবর ক'জন জানেন? অপরদিকে আমার মনে এ-প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তিনি বিশেষভাবে অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী লিখতে গেলেন কেন? কেননা সে-সময় তো রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও তাঁর সামনে ছিল!

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ মনীষীবৃন্দের কথায় বুঝতে পারি যে, মহেন্দ্রনাথ রায়ের অক্ষয়কুমার দত্ত কতখানি 'অসামান্য ব্যক্তি'। এসবের কিছু পরিচয় নেয়া যাক।

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভার আলোয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন কবি ঈশ্চরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্চরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন :

> হে পাঠকপুঞ্জ! এই সময়ে এই স্থলে মৃতবৎ হইয়া লিখিতেছি যে, আমার অতি স্নেহান্বিত প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধু *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদক ও কলিকাতার নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, যাঁহাকে অদ্বিতীয় লেখক বলা যায়, যিনি আপনার রচনামৃত বৃষ্টি করিয়া বহু ব্যক্তির মানসনেত্র আর্দ্র করিয়াছেন, আমি যাঁহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এইক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করি। ... অক্ষয় যে কি গুণের মানুষ, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া কি জানাইব? তাঁহার ন্যায় সর্বগুণান্বিত দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রায় বিদ্যমানাভাব, আমি তাঁহাকে কি বাক্যে সম্বোধন করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। 'প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা'—এই বাক্য হইতে মধুর বাক্য এবং এই সম্বোধন হইতে মধুর সম্বোধন আর কিছুই প্রাপ্ত হই না। অতএব ধাতা-পাতা-ত্রাতা আমার ঐ অক্ষয় ভ্রাতার কুশল দাতা হউন, এই স্থলে আর অধিক লিপি বাহুল্যকরণের প্রয়োজন করে না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে অক্ষয়কুমার তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর'-এ নিয়মিত লিখতেন। সেই লেখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কাছে তাঁর খোঁজ করেন এবং তাঁকে দেখতে চান। একদিন অক্ষয়কুমার দত্তকে নিয়ে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিচয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে 'সৌভাগ্যবান' বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য এ-কথার প্রমাণ তাঁর আত্মজীবনীতেও আছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক। 'প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচারপদ্ধতির সম্মিলনে' যে-যুগের আবির্ভাব—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত সে-যুগের অধিনায়কত্ব করেছেন। সে-অধিনায়কত্বের সাক্ষী স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি লিখেছেন :

> *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে, এতদ্দেশীয় লোকদিগের যে নানা গুরুত্বতর উপকার হইয়াছে, ইহা বোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা সৃষ্টির এক প্রধান উদ্‌যোগী এবং এই মহোপকারিণী পত্রিকার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি-লাভের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহার যত্নে ও পরিশ্রমে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা সর্বত্র এরূপ আদর-ভাজন ও সর্বসাধারণের এরূপ উপকার-সাধন হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠিয়াছে। বস্তুত তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া কেবল *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া, অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট পরিশ্রম দ্বারা শরীরপাত করিয়াছেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার নিমিত্ত শরীরপাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক; না করিলে, *তত্ত্ববোধিনী* সভার সভ্যদিগের কর্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়।

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয়ও 'গুরুতর' ঘটনা ছিল, সে-কথা বলেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৮০০ সনে কলকাতায় ফোর্ট উইলয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন :

> বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে ইহার প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই প্রদপ্রাপ্তি হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সৌভাগ্য-গৌরব সূচিত হয়। ... বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের এই অংশ কতকগুলি বিশেষ গুরুতর ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয়। তাঁহাকে এই সময় কতিপয় বিশিষ্ট ইংরেজ ও কয়েকজন দেশীয় কর্মবীরের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ... এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু সমাজের তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট পরিচিত হন ও এই সময়েই অসাধারণ প্রতিভাশালী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত।

অপরদিকে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের পথপ্রদর্শক রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন :

> অক্ষয়কুমার সমগ্র শিক্ষিত সমাজের বরণীয় মহাপুরুষ; সাহিত্যরূপ কর্মক্ষেত্রে একজন অসাধারণ কর্মবীর। যখন বাঙ্গালা সাহিত্যে কুরুচির প্রাদুর্ভাব ছিল; কুবিষয়ের রচনা, কুভাবের উত্তেজনা, কুকথার আলোচনা, যখন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; তখন অক্ষয়কুমার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। এবং পরিশুদ্ধ রুচিতে, পরিশুদ্ধ রচনায়, পরিশুদ্ধ ভাবে উহার সমগ্র জঞ্জাল দূরে নিক্ষেপ-পূর্বক উহাকে পবিত্র করিয়া তোলেন। এখন সেই পবিত্রতার প্রদীপ্ত জ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। সংযতচিত্ত তীর্থযাত্রীগণ এখন ঐ পবিত্র ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, উহার অনন্ত পবিত্র ভাবে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতেছেন। এই মহাপুরুষের ঈদৃশ মহীয়সী কীর্তির কখনও বিলয় হইবে না। পৃথিবীর যে কোনো সভ্যদেশ এই মহাপুরুষকে পাইলে, আপনাকে সম্মানিত করিতে পারে। পৃথিবীর যে কোনো সভ্যজাতি এই মহাপুরুষের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদের গৌরববোধ করিতে পারে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য যে, তাহার ক্রোড়দেশে ঈদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের একান্ত সৌভাগ্য যে ঈদৃশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> মহাপুরুষের অনুরাগ, যত্নে ও অধ্যবসায়ে তাহার পরিশুদ্ধির সহিত পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল।

উল্লিখিত মতামত থেকে বুঝতে পারা যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত উনিশ শতকের বাঙলার ভাব-আন্দোলনের (Renaisance) একজন প্রধান পথপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "যে যুগের বাণী চিন্তায় ও কর্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নূতন পথে বাহির করে তাকেই বলি নবযুগ।" শোনা যায়, প্রাচীন ভারতের মানুষের মন কর্ম থেকে জ্ঞানের পথে নেমে এসেছিল। সেটা ছিল প্রাচীন ভারতের মানুষের আত্মার নতুন উদ্বোধনের যুগ। দর্শনের পরিভাষায় বলা হয়েছে, এ হচ্ছে পরাবিদ্যার যুগ। এ-যুগের বিশেষত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, মানুষের পক্ষে "চিরন্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হল বেঁচে যাওয়া।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> আর একদিন ভারতে উদ্‌বোধনের বাণী এল। সমস্ত মানুষকে ডাক পড়ল, বিশেষ সঙ্কীর্ণ পরামর্শ নিয়ে নয়, যে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে যায় তারই বাণী নিয়ে। সেই বাণী মানুষের চিত্তকে তার সমগ্র উদ্‌বোধিত শক্তির যোগে বিপুল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করলে।

বলা বাহুল্য, এ-যুগ ঊনবিংশ শতাব্দী—যে-শতাব্দীর শুরুতে অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিপুল সৃষ্টি' আর মহৎ কর্মের উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে বাঙালির "চিত্তকে মুক্তির নূতন পথে বাহির" করেছিলেন।

AMARBOI.COM

২

১৮২০ সনের ১৫ জুলাই অক্ষয়কুমার দত্ত নবদ্বীপের চুপি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পীতাম্বর দত্ত ও মাতা দয়াময়ী। পিতামাতার পঞ্চম সন্তান তিনি। দয়াময়ীর পরপর চার সন্তান জন্মে এবং মারা যায়। এতে পীতাম্বর দত্তের চেয়ে দয়াময়ীর মাতৃহৃদয় সন্তানের জন্য বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অবশেষে অক্ষয়কুমারের যখন জন্ম হল, তখন পীতাম্বর দত্ত বয়সের তৃতীয়ভাগে এসে পড়েছেন। তবু অক্ষয়কুমারকে দেখে তাঁদের বুক ভরে উঠল। দয়াময়ীর একমাত্র আদরের ধন অক্ষয়কুমার। মাত্র চার বছর বয়সে, পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে অক্ষয়কুমার পাঠশালায় যেতে চাইলে, দয়াময়ী তাঁকে যেতে দেননি। মায়ের এ-বারণ অবুঝ ছেলের অভিমানের কারণ হয়। অক্ষয়কুমার বড় ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন : "সকল ছেলের মা-বাপ ছেলেকে বলে পাঠশালায় যা, আর আমার মা আমাকে বলে ঘরে থাক!" মা দয়াময়ী, অভিমানী ছেলের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করেছেন আরও একটি বছরের জন্য। কেননা সে-সময়ের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী পাঁচ বছরের পূর্বে সন্তানের 'হাতেখড়ি' দেয়া হত না। সন্তানের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে 'হাতেখড়ি' দিয়ে পাঠশালায় দেয়া হত। অক্ষয়কুমারের বেলায়ও তা-ই হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮২৫-এ অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষা আরম্ভ হয় চুপি গ্রামের গুরুচরণ সরকারের পাঠশালায়। ফারসি ও সংস্কৃতশিক্ষাও তখন থেকে শুরু। অক্ষয়কুমার সংস্কৃত শিখতেন দুর্গাচারণ ন্যায়রত্ন ও গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের নিকট। ফারসি শিখতেন আমিনউদদীন মুনশীর নিকট। বছর-পাঁচেক গ্রামে এভাবে লেখাপড়া শেখার পর ১৮৩০-এ তিনি কলকাতায় আসেন। তখন তাঁর বয়স নয় বছর।

অক্ষয়কুমার দত্তকে কলকাতায় নিয়ে আসেন হরমোহন দত্ত। এই হরমোহন দত্ত পীতাম্বর দত্তের বড়ভাইয়ের ছেলে। পীতাম্বর দত্ত তাঁর চার সন্তান হারাবার পর এই হরমোহনকে পুত্রস্নেহে মানুষ করেন। হরমোহন দত্ত তখনকার কলকাতার "সুপ্রিমকোর্টের মাস্টার অফিসের বড়বাবু ছিলেন।" অনেক টাকা আয় করতেন। তিনি পিতৃব্যের ঋণের কথা ভোলেননি। কাজেই হরমোহন অক্ষয়কুমারকে কলকাতায় নিয়ে এসে প্রথমে সেকালের বিখ্যাত 'জয় মাস্টার' ও 'গঙ্গানারায়ণ মাস্টার'-এর নিকট ইংরেজি পড়তে দেন। অক্ষয়কুমারের জ্ঞানের পিপাসা 'মাস্টার'দ্বয় মেটাতে পারেননি। শেষে, লেখাপড়ার প্রতি তাঁর অতিশয় আগ্রহ ও অনুরাগ দেখে, হরমোহন দত্ত গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভরতি করে দেন। তখন এই সেমিনারির প্রধান ছিলেন হার্ডম্যান জেফ্রর নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত। তাঁর কাছে অক্ষয়কুমার গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, জার্মান ও ফরাসি ভাষা শেখেন। পরিচিত হন গ্রিকসভ্যতার জ্ঞান-গরিমার সঙ্গে। গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়েন পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণোমিতি, উচ্চতর গণিত, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের ভালো ভালো গ্রন্থগুলি গভীর অনুরাগ নিয়ে পড়েন। তাঁর জীবনীকার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, এ-সময় তিনি হোমার ও ভার্জিল পড়ে বুঝতে পারেন যে, গ্রিকরা পূর্বে পৌত্তলিক ছিল। ফলে তিনি তাদের দেবদেবীর প্রতি যেমন, হিন্দুধর্মের প্রতিও তেমনি বীতরাগ হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল ছাত্রজীবনের শুরুতেই।

অক্ষয়কুমারের বয়স যখন পনেরো বছর তখনই মা-বাবা তাঁর বিয়ে দেন। স্ত্রীর নাম শ্যামামণি। এ-বিয়ের পর সংসারের কাজ শেষে করে পীতাম্বর দত্ত কাশীতে চলে যান এবং বছর-চারেক পর সেখানে মারা যান। অক্ষয়কুমার দত্তের বয়স তখন উনিশ। অক্ষয়কুমার তখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির দ্বিতীয় অর্থাৎ একালের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আর্থিক টানাপড়েন শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। স্কুলের বেতন দিতে পারছিলেন না। সে-কারণে পরীক্ষাও দেওয়া হয়ে ওঠেনি। এমনি সময়ে পীতাম্বর দত্তের মৃত্যু হয়। হরিমোহন দত্ত অক্ষয়কুমারের লেখাপড়ার ব্যয় ও সংসারের ভার নিতে চাইলেন। কিন্তু দয়াময়ী ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহীয়সী নারী; তিনি তাতে স্বীকৃত হননি।

মায়ের নির্দেশে অক্ষয়কুমারকে লেখাপড়া ছাড়তে হয়—কেননা সংসারের ভার তাঁকে নিতে হবে। তিনি ভেতরে নতুন করে প্রস্তুতি নিলেন অ্যাকাডেমির বাইরের লেখাপড়ার দিকে। শৈশব থেকেই লেখাপড়ার ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। সংসারের দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ায় তিনি বিচলিত হননি; যেমন হননি পিতার মৃত্যুতে। হরমোহন দত্তের মুখে পিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুসংবাদ শুনে অক্ষয়কুমার বলেছিলেন : "দাদা, এজন্য আর দুঃখ করিয়া লাভ কী—কাপড় পুরনো হইলে আমরা যেমন তাহা পরিত্যাগ করি—পিতারও তেমনি সময় হইয়াছে, তিনিও পুরাতন শরীর ছাড়িয়া দিয়াছেন—সেজন্য আর দুঃখ কেন!"

পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব যখন তাঁর ওপর পড়ল, যখন জ্ঞান-পিপাসাতেও তাঁর চিত্ত উদ্গ্রীব—এমনি সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। ঈশ্বর গুপ্ত সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন নেওয়ার জন্য হরমোহন দত্তের কাছে মাঝেমাঝে আসতেন। এখানেই ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচয়। কথায়-বার্তায় অক্ষয়কুমারের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান ঈশ্বর গুপ্ত। দুজনের মধ্যে প্রীতিময় সম্পর্ক তৈরি হয়। একদিন 'সংবাদ প্রভাকর' অফিসে গেলে অক্ষয়কুমার দত্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কাছ থেকে তখনকার ইংলিশম্যান পত্রিকার কিছু অংশ অনুবাদ করিয়ে নেন এবং সেই অনুবাদের খুব প্রশংসা করেন। শোনা যায়, অক্ষয়কুমার দত্তের সেটাই প্রথম গদ্যরচনা। এরপর নিয়মিত তিনি 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লিখতেন।

১৮৩৯ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন এ-সভার একজন সভ্য। আগেই বলেছি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লেখা পড়ে ঈশ্বর গুপ্তের নিকট অক্ষয়কুমারের খোঁজ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমার দত্তকে একদিন এই সভা দেখাতে নিয়ে যান এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৪০-এ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আট টাকা বেতনে অক্ষয়কুমার দত্তকে সে-পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। শিক্ষক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিলে তাঁর বেতন হয় দশ টাকা ও পরে চোদ্দ টাকা। অক্ষয়কুমার দত্ত পড়াতেন ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা।

শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত দেখলেন যে, পাঠশালায় ছাত্র-উপযোগী বাংলা বই নেই। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্ন করে একটি ভূগোল বই লিখে ফেলেন। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে 'ভূগোল' বইটি বেরোয় ১৮৪১ সনে। অক্ষয়কুমার দত্তের এই 'ভূগোল' বই বাংলাগদ্যের একটা নতুন ও যুগান্তকারী পথ তৈরি করে দেয়। অক্ষয়কুমার দত্ত এই 'ভূগোল'-এর মধ্য দিয়ে বাংলা যতিচিহ্নের প্রবর্তন করেন। প্রবর্তন করেন 'ভূগোল'-এর পরিভাষা। বিষয়টিতে পরে আসতে হবে।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতাকালেই প্রসন্নকুমার ঘোষের সহায়তায় অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২) নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। পত্রিকার ছয় সংখ্যা বের হবার পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি এই পত্রিকার মধ্যে 'বহুবিদ্যার' অবতারণা করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর বাসনা পূর্ণ হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে। তাঁর সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বেরোয় ১৮৪৩-এ। দীর্ঘ বারো বছর তিনি এ-পত্রিকা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। এ-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও 'বহুবিদ্যার' জ্ঞানের গতিপথ নির্দেশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন, এ-পত্রিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ করতে করতেই তিনি 'শিরোরোগে' আক্রান্ত হন। অক্ষয়কুমার দত্তের এই 'শিরোরোগ' আর ভালো হয়নি। এ-রোগ নিয়েই তিনি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর মতো দু-খণ্ডে একটি 'মহাগ্রন্থ' লেখেন। উপাসক সম্প্রদায়ের তৃতীয় খণ্ড লেখার কথা থাকলেও তিনি আর তা শেষ করতে পারেননি। পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তৃতীয় খণ্ডের কিছু-কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। বই আকারে এ কখনো বেরোয়নি। ১৮৮৬ সনের ২৭ মে অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু হয়।

৩

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন নতুন বাঙালি জাতির একজন প্রধান নির্মাতা-পুরুষ। ভারতবর্ষের মানুষ ছিল বহু দেবদেবী-শাসিত ও নানা আচারের শৃঙ্খলে বাঁধা চিরায়ত অধ্যাত্মবাদী জাতি। মানুষ তার নিজের সমাজ ও ভাগ্য নিজে গড়তে পারে—এমন ধারণা অন্তত উনিশ শতকের পূর্বে এখানে ছিল না। ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য তখনকার ভারতবর্ষের মানুষ নানারকম পন্থা অবলম্বন করেছে। কেউ সন্ন্যাসব্রত, কেউ যোগ-সাধনা, কেউবা তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে দিশেহারা হয়ে বেরিয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত সেখানে নতুন যুগের নতুন চিন্তা নিয়ে এলেন—নতুন করে জাতিটাকে গড়বার জন্য। ভারতবর্ষ তখন কোন্ চিন্তার মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল আর অক্ষয়কুমার সেখানে কী নতুন 'বাণী' নিয়ে এসেছিলেন, সে-কথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শোনা যাক। তিনি বলেছেন :

> আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না, আমি কোথায় আর তিনি কোথায়, আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ পাতাল প্রভেদ।

AMARBOI.COM

ঈশ্বরের ধারণা থেকে মানুষকেন্দ্রিক চিন্তা আধুনিক ভারতবর্ষে অক্ষয়কুমার থেকেই শুরু। তিনিই সর্বপ্রথম এ-ভাবুকতার পরিচয় দেন যে, মানুষই নানা দিক থেকে শক্তিসম্পন্ন প্রাণী। এমন প্রাণী—যে তার নিজের জীবনরচনার ভার নিজের হাতে নিতে পারে। কিন্তু উনিশ শতকের পূর্বে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এ-চেতনা ছিল না। ভারতবর্ষের 'ভক্তির পলিমাটির দেশে' অক্ষয়কুমার প্রথম সেই চিন্তার প্রতিষ্ঠা করেন।

উনিশ শতকের সমস্ত বাঙালি মনীষীর মুখে যে 'মানবতাবাদ' কথাটি নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দেয়, তা আমাদের ঐতিহ্যে ছিল না। এ-শব্দ ইংরেজি 'হিউম্যানিজম'-এর বাংলা তরজমা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব আছে—এ-কথা আমাদের নিজস্ব। যেমন মহাভারতে আছে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন : "গুহ্য একটি তত্ত্ব তোমাকে বলছি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।" মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা তার ভালো-মন্দ নিয়েই যে তার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যা তার আপন চেষ্টাতেই করতে হবে—এখানে কেবল এই চেতনার অভাব ছিল। এই চেতনারই প্রতিষ্ঠা করেন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর দুটি বইতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই দুটি 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'ধর্মনীতি'। ভবতোষ দত্ত লিখেছেন :

> উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সাহিত্যে তার প্রথম প্রকাশ অক্ষয়কুমার দত্তের এই বইতে। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীন স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যে বুদ্ধির প্রমাণ প্রাকৃতিক নিয়মতত্ত্বে বিশ্বাস অর্জন। আমাদের মনের জগৎ থেকে সব রকম ধোঁয়াটে ভাব ও অলৌকিক ভাবনাকে দূরীভূত করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা। এই প্রবণতা উনিশ শতকের মনীষীদের চিন্তার সাধারণ প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল, অক্ষয়কুমার দত্তেই তার প্রথম অভিব্যক্তি। অক্ষয়কুমার ব্যবহৃত 'মানবপ্রকৃতি' কথাটা এই নতুন মানবত্ববোধের ইঙ্গিতবহ। অক্ষয়কুমার এমন মানুষের কথা বলেছেন, যার আভাস চণ্ডিদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই উক্তির মধ্যেও নেই। এই মানুষের কথা বলেই, ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক পর্যায়গুলি বিশদভাবে তিনি বলেছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই মানুষের প্রাত্যহিক এবং সামাজিক কর্তব্য করতে হবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্ত্রীয় মিথ্যা কর্মের অন্ধ অনুষ্ঠানের কথা তিনি বলেননি।

আধুনিক মানবধর্মের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমরা অক্ষয়কুমার দত্ত থেকেই পাই। ভবতোষ দত্ত সেজন্য বলেছেন : "অক্ষয়কুমার দত্ত আমাদের মানবধর্মের প্রথম প্রবক্তা।" বাঙালির ভাববিলাসিতা ও আবেগপ্রবণতা প্রায় প্রবাদতুল্য। সে-জায়গায় অক্ষয়কুমার যে শুভবুদ্ধির (pure reason) পথপ্রদর্শন করেন সেও এক বিস্ময়কর ঘটনা। রামমোহন রায় তাঁর বিচারমূলক বইগুলিতে প্রায়শ বৃহস্পতির একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন : "কেবলমাত্র শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে কোনোকিছু সম্পর্কে স্থিরসিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। বিচার যুক্তিহীন হলে ধর্মহানি ঘটে।" কিন্তু ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক বাস্তবতা ছিল প্রায় এর বিপরীত। অক্ষয়কুমার এই যুক্তিবাদকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর যুক্তিবাদের দ্বারা স্বয়ং বিদ্যাসাগর থেকে ডিরোজিয়োপন্থীরা কী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার সাক্ষী কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার জাগরণ'। তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রমাণ মেলে তাঁর একটি বিস্ময়কর সমীকরণে—

পরিশ্রম	=	শস্য
পরিশ্রম+প্রার্থনা	=	শস্য
অতএব প্রার্থনা	=	০

কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন : "সমীকরণটি বাংলার চিন্তার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ... বাংলাদেশের সাধারণ পরিচয় এই যে তা ভক্তির পলিমাটির দেশ। সে-দেশে যে এমন কঠিন-দেহ যুক্তিদ্রুমও গজায় এটি মনে রাখার মতো ঘটনা।" অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন : "এই সমীকরণ ব্যাপার লইয়া ছাত্রমহলে মহা তোলপাড় হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভক্তিমান' রাজানারায়ণ বসু এই সমীকরণের বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রতিবাদ করেছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> অক্ষয়কুমার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী পুরুষ নিঃসন্দেহে বলা চলে। অপ্রামাণ্য অনুভূতির প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করেননি চিন্তার ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত অনুভূতির দোহাই দিয়ে বিচারকে ঠেকিয়ে রাখার যে রেওয়াজ বহুকাল থেকে চলে আসছিল চিন্তার জগতে, অক্ষয়কুমার রুখে দাঁড়ালেন তার বিরুদ্ধে। অনুভূতির প্রামাণ্যকে বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপসারিত করবার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্যে আত্মোপলব্ধিতে বিশ্বাসবান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ ঘটেছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদের পথ থেকে মুহূর্তের জন্যেও সরে যাননি।

অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন—

> বাস্তবিক বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অক্ষয়কুমারের মত যুক্তিপন্থী ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয়, ফরাসী leeumination সম্প্রদায়ের ডিডিরো, ডি আলেমবার্ট প্রভৃতির মত তাঁহারো Encyclopaedic একটা বিশ্বগ্রাসী জ্ঞানানুশীলনের ইচ্ছা ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করিতে করিতে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে তিনি মেডিক্যাল কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়ন (ও) পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সহায়তায় বিস্তর গ্রন্থ তিনি পড়িতেন এবং পত্রিকায় নানা জ্ঞানবিজ্ঞান ইতিহাসের তত্ত্বসকল প্রকাশ করিতেন। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অক্ষয়কুমারের এক প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাতে পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশলের মধ্যে স্রষ্টার অসীম জ্ঞানের পরিচয়ের কথার আলোচনা ছিল। বিজ্ঞানের তত্ত্ব এই বোধ হয় প্রথম বাংলা ভাষাতে প্রকাশের চেষ্টা।

AMARBOI.COM

১৮৪৮-এ ইউরোপে মার্কস-এঙ্গেলস যখন কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার লিখতে ব্যস্ত, তখন অক্ষয়কুমার ভারতবর্ষে প্রার্থনার নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে পরিশ্রম অর্থাৎ মানুষকে বস্তুবাদের সামনে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছেন। কেননা তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা আর ইউরোপীয় জ্ঞানের বিচারপদ্ধতির মাধ্যমেই বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষের চেতনা বস্তু-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হয়। উলটোটা কদাপি নয়। উলটোটা সত্য হলে মানুষ কেবলই বনে যাবে।

অক্ষয়কুমার রসসাহিত্যের চর্চা করেননি; করলে তা যে কত অপূর্ব রূপ নিয়ে বেরোত, তার প্রমাণ পাই তাঁর 'চারুপাঠ'-এর 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ে 'বিদ্যা-বিষয়ক', 'কীর্তি-বিষয়ক' ও 'ন্যায়-বিষয়ক' তিনটি অদ্ভুত সুন্দর রচনায়। এ-তিনটি রচনার প্রভাব আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ওপর। বিশেষভাবে 'কীর্তি-বিষয়ক' রচনাটির প্রভাব আছে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'বড় বাজার' নামক রচনার মধ্যে। অক্ষয়কুমারের রচনা তিনটির গঠনসৌন্দর্য একেবারে অভিনব। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে রসসাহিত্য হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন অনির্বচনীয় রচনা কীভাবে যে লেখা সম্ভব হয়েছিল, তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। ভাষার লালিত্য ও মধুরতা যে কী জিনিস, অক্ষয়কুমার হাতে-কলমে তা ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। এজন্যই হয়তো বিনয়কুমার সরকার বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাষাটা 'চারুপাঠে'র 'নিকট-আত্মীয়'। ভবতোষ দত্তের মতে বাংলাভাষায় এ-ধরনের রূপক-রচনার প্রবর্তন অক্ষয়কুমার দত্তই করেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার রসসাহিত্যে আগ্রহ দেখাননি। তার কারণ হয়তো এই ছিল যে, যার উপসংহার নেই তা দিয়ে আর যা-ই হোক, জাতির নির্মাণকাজ চলতে পারে না।

শৈশবেই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন : গদ্যে মানুষের বেশি উপকার হয়, নাকি পদ্যে? চোদ্দ বছর বয়সে তিনি 'অনঙ্গমোহন' (১৮৩৪) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ বের করেছিলেন কিন্তু ঐ জিজ্ঞাসা তাঁকে আর সেদিকে নিয়ে যেতে পারেনি। অজিতকুমার চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, "তাঁহার মাথাটি ছিল নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যার একটি মৌচাক বিশেষ। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির যে কত রকমের সম্বন্ধ, তাহারি বিচার লইয়া তিনি ব্যস্ত।" কাজেই তাঁর পক্ষে রসসাহিত্য করা সম্ভব ছিল না। রসসাহিত্যের বাইরেও তাঁর লেখার বিষয় ছিল বহু এবং বিচিত্র। ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান থেকে শব্দতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, শিক্ষা, সভ্যতা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, দর্শন—এরকম 'বিশ্বগ্রাসী' বিদ্যার অবতারণা তিনি করেছেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নানা জ্ঞানের এত বিচিত্র বিদ্যার এমন অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ যে তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে—তা সত্যি বিস্ময়কর! এমন অচল গতিহীন সংকীর্ণ দেশে, একটা দুর্গম সময়ে, সঙ্গহীনভাবে একা একাই তিনি এসব গুরুতর ভাবনাগুলোকে রূপ দিয়েছেন কেমন করে! তিনি যেসব বিষয়ে ভেবেছেন এবং যেসব বিষয়ে লিখেছেন, তার কোনো একটিও তখন কারো হাতে গড়ে ওঠেনি। বাংলায় যে কিছু লেখা চলে—এ-কথা কেউ তখন বিশ্বাস করত না। ডিরোজিয়োর দল এই দুঃখে ইংরেজির দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এ-জায়গায় অক্ষয়কুমার বাংলাকে তার আপন পায়ের উপর দাঁড় করালেন। দেখিয়ে দিলেন যে, এ-ভাষায় নানা জ্ঞানের সুশৃঙ্খল চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সম্ভব। একা একা তিনি এইসব কাজে দিনের পর দিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। অথচ তাঁর লেখা এই দুরূহ বিষয়গুলো বুঝতে যেমন সহজ তেমনই স্পষ্ট। এ-প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীর কথা পুনরায় শোনা যাক। তিনি লিখেছেন :

> অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের তথ্য ও তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই দেখিতে দেখিতে বাংলা ভাষা সকল রকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া আর একটি বড় লাভ হইল এই যে, বাংলায় গদ্যের ভাষা বেশ শৃঙ্খলিত ও সুবিন্যাস্ত হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের চর্চা করিতে গেলে কোন ভাবকে অস্পষ্ট রাখা চলে না। এবং একটি সুবিহিত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে মনোভাবগুলিকে বাঁধিয়া তুলিতে হয়। এইসব কারণেই নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী তখন একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ... এক একদিন বই পড়ায় ও তত্ত্ববোধিনীর জন্য প্রবন্ধ লেখায় সমস্ত রাত্রি অক্ষয়বাবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> জাগিয়া কাটাইতেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে—তখন সাহিত্য ইঁহাদের কাছে তপস্যার বিষয় ছিল—ইঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টির গোড়ায় ছিল তপস্যার ছাপ। সে তপস্যা জীবনের বিচিত্র চেষ্টা হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া একটা নিভৃত কলাভবন গড়িয়া তাহার মধ্যে বসিয়া বিরলে সাহিত্যসৃজনের তপস্যা নয়—তাহা জীবনকেই নানা দিক হইতে প্রকাশ করিবার তপস্যা। এই জন্যই বাংলা ভাষায় অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত গতিবেগ দেখা দিয়াছিল। পৃথিবীর সামান্য বালুকণা হইতে আকাশের দূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত তখন বাংলা ভাষার দৌড়।

বুদ্ধির মুক্তি যদি বাংলাদেশে বাংলাভাষার চিন্তাধারায় কারো মধ্যে সর্বপ্রথম ঘটে থাকে তবে তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। মুক্ত ভাবের নতুন চিন্তায়, নতুন চেতনায়, নতুন ভাষায়, নতুন পথের গৌরবস্পৃহায় বাঙালি জাতিকে সমস্ত দিক থেকে নির্মাণ করার তীব্র বাসনা প্রথম তাঁর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এটা হবার কতকগুলি গুরুতর কারণ ছিল। প্রথম কারণ, তিনি গরিব ছিলেন; দ্বিতীয় কারণ, তিনি পরাধীন দেশের মানুষ ছিলেন; তৃতীয় কারণ, তিনি প্রতিভাবান ছিলেন। পৃথিবীর বড় কর্মীরা আপন প্রতিভার আলোতেই বর্তমানকে চিনে নেন; ইতিহাসের অপেক্ষায় তাঁদের থাকতে হয় না। অক্ষয়কুমারকেও থাকতে হয়নি। কিন্তু দারিদ্য?

দারিদ্য মানুষকে ভালো ও মন্দ দুই-ই করতে পারে। মানুষের জীবনে এ এমন একটি দুর্দৈব যা প্রতিভাবানের পক্ষেও অতিক্রম করা সহজ নয়। কাজেই যাঁর টাকা নেই, তাঁর প্রতিভা থাকাও বিড়ম্বনা—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কবি মধুসূদন ও কবি নজরুল। এই দুই কবির জীবন যিনি নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন, কেবল তিনিই বুঝবেন যে, টাকা না-থাকা প্রতিভার পক্ষে শুধু বিড়ম্বনা নয়—অভিশাপ।

অক্ষয়কুমার দত্তের পঁচাত্তর বছর পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় চাকরি করে ভারতচন্দ্র মাইনে পেতেন চল্লিশ টাকা। আর পঁচাত্তর বছর পর অক্ষয়কুমার জমিদার দেবেন্দ্রনাথের স্কুলে চাকরি করে মাইনে পান আট টাকা। অপরদিকে একই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করে বিদ্যাসাগর পান পঞ্চাশ টাকা। বিদ্যাসাগরের মাসিক আয় যখন পাঁচশত টাকা, অক্ষয়কুমারের মাসিক আয় তখন মাত্র ষাট টাকা। বিদ্যাসাগর যখন অঢেল টাকার মালিক, অক্ষয়কুমার তখন দুই মহাশত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছেন। একদিকে তাঁর কঠিন 'শিরোরোগ', অন্যদিকে দারিদ্র্য। এমন অবস্থায় পড়লে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক দুই-ই বিষাক্ত ও বিকৃত হয়ে পড়ে। যাঁরা যৌবনে মধুর রস পান করে বিলাসিতা করেছেন, তাঁরা যদি হঠাৎ এমন অবস্থায় পড়েন, তা হলে তাঁদের অবস্থা যে কেমন হবে, সে-কথা না-বললেও চলে।

লেখকজীবনে অক্ষয়কুমার তাঁর ব্যাধির জন্য দুঃখ করলেও সাংসারিক জীবনে তাঁর সে-দুঃখ ছিল না। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তাঁর ব্যক্তিত্বের পক্ষে বড় অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। 'অবিচার' প্রবন্ধে তিনি সে-কথা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> আর কোনো বিষয়ে আমাদের ভদ্রস্থতা নাই। কেবল মিশনারিদিগের উপদ্রবেই লোকে সর্বদা সশঙ্কিত, তাহাতে রাজপুরুষেরা তাহারদিগের যেরূপ সহায় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুদিগের দুঃখস্রোত ক্রমাগত প্রবল হইতেই চলিল। যে দেশে রাজা ও রাজনিয়ম আছে, সে দেশের প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। যে রাজা প্রজাদিগের ধর্ম রক্ষা করিবেন ও তাহাতে অনাদর করিবেন না এমত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকারস্থ বিচারালয়ে এ প্রকার ন্যায়বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি হইয়া পূর্বপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়া অত্যন্ত অধর্মজনক তাহার সন্দেহ নাই। রাজপুরুষেরা যেরূপ অসঙ্গত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। অন্যদেশে এ প্রকার ঘটনা হইলে একটা খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা যেমন দুর্দান্ত, ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে তেমনি মৃদুস্বভাব পাইয়াছেন।

তাঁর কালের অন্যান্য মনীষী—যেমন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রিটিশ-রাজত্বকে ভারতবর্ষের বাস্তব প্রেক্ষাপটে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

> রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য সাধন বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্ন, নৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সমস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে সমুদয় বাংলাদেশ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়;—যেখানে কোনো নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই;—যেখানে নৃশংসস্বভাব হিংস্র জীবসকল নিরুপদ্রব নির্বিরোধ প্রাণীদিগের প্রাণ নাশার্থেই সর্বদা সচেষ্ট আছে।

ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে এমন কথা বলার সাহস তখন বেশি লোকের ছিল না। বরঞ্চ তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন অনেক বিখ্যাত বাঙালি। তাতে করে তাঁরা লাভবান হয়েছেন দুইরকম। এক. আর্থিক লাভ; দুই. খ্যাতির সুযোগ। এ-কথা দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বইতে। অক্ষয়কুমার জেনে-বুঝেই এ দুইদিকে যাননি। অক্ষয়কুমার আজ যে আমাদের কাছে অপরিচিত ও বিস্মৃত—তার একটা প্রধান কারণ ইংরেজের সঙ্গে তাঁর এই অসংযোগ। ইংরেজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল গভীর, ইংরেজের সঙ্গেও। ইংরেজিভাষায় জ্ঞানের যা-কিছু প্রকাশ, তার ভালোত্বটুকু ভারতবর্ষের মানুষের উপযোগী করে নিতে তিনি দ্বিধা করেননি। সে-সময়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক রেভারেন্ড জন এন্ডারসন বলেন : "Akshayakumar is Indianishing European Science" ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে তিনি ভারতীয় করেছিলেন এ-কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথার্থ, কিন্তু তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও বণিকসুলভ মানসিকতাকে মেনে নিতে পারেননি। এদেশের শিক্ষিত লোকদের চাকরি দেবার বেলায়ও তাঁরা এই বণিকবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এক ব্যক্তি ইংরাজ যে কর্ম সম্পাদন করিয়া সাদরে সহস্র মুদ্রার অধিক মাসিক বেতন প্রাপ্ত হয়, এদেশীয় লোকে সেই কার্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়াও ১০০/১৫০ টাকার অধিক বেতন পায় না।

একই প্রবন্ধে আছে :

> এদেশীয় লোকে সুচারুরূপে রাজনিয়ম পরিচিত হউন বা এক্ষণকার অপেক্ষা সহস্রগুণে কর্মক্ষম ও বিষয়দক্ষ হউন, তাঁহাদিগকে চিরদিনই অধঃশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া এইরূপে, অল্পবেতনে রাজকর্ম নির্বাহ করিতে হইবে।

তিনি বুঝেছিলেন যে, 'বঙ্গদেশে'র 'অধঃশ্রেণীভুক্ত' অর্থাৎ উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্য 'ডেপুটি'র সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিনয় ঘোষ বলেছেন, এ-কারণে 'ডেপুটিত্বে'র প্রতি তাঁর একটা ধিক্কার ছিল। সেজন্য দেখা যায়, তৎকালীন 'বঙ্গদেশে' যখন শিক্ষাবিভাগে ডেপুটি ইনসপেক্টরের পদ প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন 'বন্ধুবৎসল' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে সেই পদ দিতে চাইলে তিনি তাতে রাজি হননি। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশেষ করে ডেপুটি ইনসপেক্টরের পদটি অক্ষয়কুমার দত্তের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন। সেকালে বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্য সে-পদ ছিল লোভনীয়। কেননা আর্থিক লাভের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার যোগ ছিল তাতে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের নিকট ব্যক্তিগত লাভ ও সম্মানের চেয়ে বড় ছিল 'সর্বসাধারণের হিতকরী' কাজের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি। তাঁর সে-দৃষ্টি যেমন অনন্য, তেমনই অপূর্ব।

এ-পর্যন্ত অক্ষয়কুমার দত্তের সমস্ত জীবন, চিন্তা ও কর্মধারা নিয়ে একটিও বই লেখা হয়নি। লেখা হলে দেখা যাবে অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা ঊনবিংশ শতাব্দীর মনন ও মনীষাকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত ও গতিশীল করে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে অনেকখানি আলাদা। কাজেই এ-শতাব্দীকে উনিশ শতক কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার বিচার ঐতিহাসিকভাবে হওয়া উচিত। এ-কথা বলবার একটা গুরুতর কারণ এই যে, অক্ষয়কুমারের বস্তুবাদী চিন্তার ধারা তাঁর শতাব্দীকে খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও সে-ধারা খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি। তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে প্রায় সমস্ত বাঙালি মনীষীর মধ্যে যৌবনে একটা অপরিমেয় উত্তাপ দেখা গেলেও বার্ধক্যে সে-উত্তাপে ভাটা পড়েছে এবং তাঁদের দ্বারা পুনরায় একটা ভক্তিবাদী ধারা প্রবর্তিত হয়েছে—যা অক্ষয়-পরবর্তী ধারার একটি দুঃখজনক রূপ। এখন জিজ্ঞাসা এই : অক্ষয়কুমার-আনীত বাঙালির বস্তুবাদী ধারার সুতো কেটে গেল কেন? এ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে হলে সেকালের বাঙালির মননজগতের খোঁজ নিতে হবে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে। এবং সেইসঙ্গে আমাদের আর্থিক জীবনের পরিচয়।

৪

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয়কুমার দত্তের একটা মোটা দাগের পরিচয় আছে। সেখানে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তক। তাঁর এ-পরিচয়ও খুব সহজ ব্যাপার নয় অবশ্যই। কেননা তাঁর সামনে তো বাংলাগদ্যের কোনো আদর্শ রূপ বা রীতি ছিল না। তবু তিনি বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। অজিত চক্রবর্তী বলেছেন : "বিজ্ঞানের চর্চা করিতে গেলে কোন ভাবকে অস্পষ্ট রাখা চলে না। এবং একটি সুবিহিত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে মনোভাবগুলিকে বাঁধিয়া তুলিতে হয়।" এ-কথা যথার্থ। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন :

> বাংলা গদ্যরীতি পরিণত হয়ে ওঠবার পরে জন্মগ্রহণ করলে অক্ষয় দত্ত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লেখক হতে পারতেন। কিন্তু তখন অনেক অবান্তর কাজ তাঁকে করতে হয়েছে; বাংলা গদ্যরীতি তৈরি করে নিতে হচ্ছে, অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে—পুরো মনটা তিনি দিতে পারেননি বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনার কাজে। তবু তাঁর প্রধান কীর্তি এই যে তিনি সর্বপ্রথম হাতে-কলমে দেখিয়ে গিয়েছেন যে, বাংলা ভাষাতে যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সম্ভব।

প্রমথনাথ বিশীর কথা সত্য ধরে নিয়েও বলা যায় তাঁর পক্ষে এ-সত্যের আরও গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। কেননা প্রথমত, তিনি অক্ষয়কুমারের পথে হাঁটেননি; দ্বিতীয়ত, তাঁর দৃষ্টি ও কল্পনাকে তিনি প্রসারিত করতে পারেননি। তা পারলে তিনি দেখতে পেতেন যে, 'বাংলা গদ্যরীতি পরিণত' হওয়ার পর যে-সমস্ত মনীষী বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁদের প্রত্যেকেরই শিক্ষক। কেবল তা-ই নয়, এরই মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত মননশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যের আরও একটি অপূর্ব রাজপথ তৈরি করে গেছেন, যা প্রমথনাথ বিশীর নজর পড়েনি। অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতে, রচনার সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে কোনো বিষয়ে লেখকের বক্তব্যের আলোচনা ও মীমাংসার প্রকাশ প্রবন্ধের মূল ও আদিরূপ। অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে প্রবন্ধ সর্বপ্রথম এই রূপলাভ করে। এ-বিষয়ে চমৎকার কথা বলেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন :

> রামমোহন রায় ধর্মীয় তত্ত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচানর যে-ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যস্থতায় এক সম্পূর্ণ নূতন ধারা এসে যুক্ত হলো। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, বাংলা প্রবন্ধের সাহিত্যধর্ম রক্ষা করেও তিনি তার মধ্যে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করেছেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, তিনি বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসাধনার অগ্রদূত। সেই সূত্রেই সে-যুগে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের তিনি ভবিষ্যৎ পথপ্রদর্শক। রামমোহন ধর্ম ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> সমাজ বিষয়ে সেদিন যে-প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের তপস্যা কেবলমাত্র উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনাগত যুগের মধ্যেও তার সম্ভাবনা রেখে গিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্র যে কত বিস্তৃত, তার বিষয়ের মধ্যে যে অন্তহীন বৈচিত্র্য আছে, তা আমরা তাঁর মধ্যেই প্রথম দেখতে পেলাম। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ও যে সেই যুগের বাংলা গদ্যভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবার যোগ্য ছিল, তা অক্ষয়কুমারই প্রথম প্রত্যক্ষ করালেন।

একটা জাতির নির্মাণে বাংলাভাষায় বাঙালিকে যতগুলো পথ দেখানো সম্ভব, তিনি তার প্রত্যেকটি পথ অসামান্য শক্তিমত্তার সঙ্গে খুলে দিয়েছেন। দুরূহ বিষয়ের অপূর্ব প্রকাশ সহজ নয়। তার জন্য ভাষাকে হতে হয় ভারমুক্ত—যা রচনাকে দেয় গতি আর চিন্তাকে মুক্তি। ভাষার ওপর দখল না থাকলে শব্দ খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় চিন্তা হারিয়ে যায় এবং যা প্রকাশিত হয় তাও হয়ে পড়ে অস্পষ্ট ও আড়ষ্ট। এজন্য যথার্থ চিন্তার প্রকাশে যথার্থ ভাষাজ্ঞান আবশ্যক। অক্ষয়কুমারের এ-জ্ঞান ছিল বলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার প্রকাশে ভাষা তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অক্ষয়কুমার এই সত্যের প্রথম প্রকাশ দেখিয়েছেন তাঁর 'ভূগোল' বইতে। এর মধ্য দিয়েই তিনি বাংলাগদ্যের একটি যুগান্তকারী পথ খুলে দিয়েছিলেন। সে-কথাটা এখানে বলে নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> বিদ্যাসগর বাঙ্গালা লেখার সর্বপ্রথম কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদ চিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। ... বাস্তবিক একটার সমভূম বাঙ্গালা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্তন। এতদ্দ্বারা যাহা জড় ছিল তা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

নবেন্দু সেন লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির জন্যেই সম্ভবত বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে একধরনের ভ্রান্ত ধারণা চলে আসছে। বস্তুত বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যের সর্বপ্রথম ছেদচিহ্নের প্রবর্তক নন। ১৮৪১-এ প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভূগোল' গ্রন্থে সুসম যতিচিহ্নের প্রয়োগ দেখা যায়।

শিশিরকুমার দাশ 'বাংলা যতিচিহ্ন ১৮০১–১৮৫০' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা উদ্ধৃত করে বলেন যে, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলা যতিচিহ্ন ব্যবহারের সর্বপ্রথম সচেতনতা অবলম্বন করেন।" বলা বাহুল্য 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক ও প্রধান লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। তা ছাড়া শিশিরকুমার দাশ উদ্ধৃত করেছেন অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা কিন্তু সিদ্ধান্ত টেনেছেন 'তত্ত্ববোধিনী'কে দিয়ে। কাজেই সিদ্ধান্ত -টায় একটা গূঢ়ৈষণা থেকে যায়। হয়তো শিশিরকুমার দাশ যতিচিহ্নের প্রবর্তকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মান একা অক্ষয়কুমারকে দিতে চান না। হয়তো তাঁর দাবি, এ-সম্মান দেবেন্দ্রনাথেরও প্রাপ্য। এ-কারণে তিনি সরাসরি অক্ষয়কুমার দত্তের সচেতনতার কথা না বলে, লিখেছেন তত্ত্ববোধিনীর কথা। দেবেন্দ্রনাথের লেখা তত্ত্ববোধিনীতে যা প্রকাশ হত, তা বিভিন্ন উৎসব বা সভা উপলক্ষে দেওয়া তাঁর বক্তৃতা। বক্তৃতায় সচেতন ছেদচিহ্নের ব্যবহার থাকা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। তা ছাড়া তাঁর আত্মজীবনী এও প্রমাণ করে যে, কোনো বিষয়ে লেখা জরুরি হলে তিনি অক্ষয়কুমারকে কাছে বসাতেন। তিনি বলতেন, অক্ষয়কুমার তা লিখতেন। এ-অবস্থায় যতিচিহ্নের ব্যবহার করার সুযোগ তাঁর কোথায়? কাজেই শিশিরকুমার দাশের এ-দাবি খারিজ করে দিয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন :

> 'সুষ্ঠু' যতিচিহ্নের প্রয়োগ ইতিপূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্তের লেখায় দেখা দিয়েছিল। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ছাপা 'ভূগোল' বইটিতে তার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়ত অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ছেদচিহ্নের সুব্যবস্থা যে সম্পাদকের করা নয় তাই বা জোর করে বলি কী করে! 'ভূগোল' বইটির প্রমাণে অক্ষয়কুমারের দাবি তো অগ্রগণ্য।

এরপর সুকুমার সেন লিখেছেন :

> অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম নিয়মিতভাবে ছেদচিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছেদচিহ্নের ব্যবহার দীর্ঘ বাক্যের 'সিনট্যাকস'-এর সঙ্গে সমতাল করে দিয়েছিলেন।

"বিদ্যাসাগর ছেদচিহ্নের ব্যবহারে দীর্ঘ বাক্যের 'সিনট্যাকস'-এর সঙ্গে সমতাল করে দিয়েছিলেন"—ঐতিহাসিকভাবে এ কথাও সত্য নয় বলে নবেন্দু সেন প্রমাণ করেছেন। নবেন্দু সেন অক্ষয়কুমার দত্তের ১৮৪৫-এ প্রকাশিত ডেভিড হেয়ার সাহেবের বক্তৃতা উদ্ধৃত করে লিখেছেন :

> ঐতিহাসিক দিক থেকে এই সমতাল দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগ-নৈপুণ্যও অক্ষয়কুমারের হাতেই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা ১৮৪৭'র পূর্বেই।

আজও এমন অনেক মেধাবী 'ক্রিটিক' আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সামনে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারেন না! সেকালেও বিদ্যাসাগরের গুণে মুগ্ধ হয়ে অনেক মনীষীও সত্যের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। নবেন্দু সেন খুব দুঃখ করে লিখেছেন :

> 'বাংলা গদ্যের জনক', 'প্রথম যতিচিহ্নের প্রবর্তক' ইত্যাদি স্তুতিবাচক 'ফ্রেজ'-এর ব্যবহারে বিদ্যাসাগর বা বাংলাগদ্য, কোনো বিষয়েই সঠিক কিছু বলা হয় না। বরং সত্য ও তথ্যের বিকৃতি হয় বলে ভারতবর্ষের এত বড় এক অনন্যসাধারণ পুরুষের অবমাননাই করা হয়। জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এ ভ্রান্তি অপরাধ; এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের উচিত এই পাপের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীশচন্দ্র দাশের 'সাহিত্য-সন্দর্শন' বইটি এই বিভ্রান্তিতে সহায়তা করেছে প্রবলভাবে। কেননা এ-বই ছাত্রপাঠ্য। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বই পড়ানো হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বাংলা গদ্যের জনক', 'প্রথম যতিচিহ্নের প্রবর্তক' ইত্যাদি 'ফ্রেজ'গুলো এ-বইয়ে উল্লেখ থাকায় বিভ্রান্তিটা প্রায় স্থায়ীরূপ নিয়েছে। কেবল তা-ই নয়, আমাদের শিক্ষকরাও তো অনেকে বাংলাগদ্যের যথার্থ ইতিহাস জানেন না। তাঁদের মুখে-মুখেও এ-বিভ্রান্তি বেড়ে গেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের পরে কোনো-কোনো পণ্ডিত—যেমন, বদরুদ্দীন উমর তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' (১৯৭৬) বইতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে উল্লিখিত 'ফ্রেজ'গুলোই ব্যবহার করেছেন! অপরদিকে গোপাল হালদার এ-দাবিও করেছেন যে, বিদ্যাসাগর "বাঙলা গদ্যের ছন্দ ও ভারসাম্য প্রথম আবিষ্কার করেন।" কিন্তু এ-দাবি তো সুকুমার সেন ও নবেন্দু সেনের যুক্তির সামনে টেকে না। কেননা যে-গদ্য, ছেদচিহ্নের ব্যবহারের ফলে 'সুষ্ঠু', 'সুনিয়মিত' ও 'সমতাল'-বিশিষ্ট হবে, সে-গদ্য ছন্দহীন ও ভারসাম্যহীন হওয়া সম্ভব কি? মোহিতলাল মজুমদারের মতে অক্ষয়কুমার দত্তই "সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ও সুচ্ছন্দ আকারে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন।" অক্ষয়কুমার দত্ত গদ্যভাষার এমন একটি রীতি আবিষ্কার করেছিলেন, আজও যে-রীতির বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন যা হয়েছে তা বিনয়কুমার সরকারের মুখে শোনা যাক। তিনি বলেছেন :

> প্রবীণতম অক্ষয় দত্তের রচনায় আর নবীনতম আনন্দবাজার পত্রিকার রচনায় পার্থক্য কি নেই? নিশ্চয়ই আছে। তফাৎটা লক্ষ্য যাবে প্রধানত বা একমাত্র চলতি, দেশী অর্থাৎ সোজা শব্দের শতকরা সংখ্যায়। তাছাড়া আর কোনো বড় প্রভেদ আছে কিনা সন্দেহ।

AMARBOI.COM

একালের বাংলা গদ্য রচনায় আর-একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ছোট বাক্য তৈরি এবং তাতে ভাবের স্পষ্টতা দান। ব্যাপারটা চোখে পড়ে লেখকের সর্বনাম, বিশেষ্য ও ক্রিয়ার ব্যবহারের নৈপুণ্যের দিকে তাকালে। কিন্তু এও গদ্যরীতির ক্রমবিকাশের ফল। কেননা দেখা যাচ্ছে গত দু-দেড়শো বছরের যে ভাষা-সাধনা, তাতে পাঁচ থেকে বিশটি শব্দে বাক্যরচনার ঐতিহ্যই বলবৎ। ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই।

রাজনারায়ণ বসু বলেছেন : "অক্ষয়কুমার বর্তমান বাংলাভাষার একজন প্রধান নির্মাতা।" পরবর্তী পণ্ডিতদের আলোচনা থেকে দেখা যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত যথার্থ বাংলাগদ্যের প্রথম নির্মাতা, 'প্রধান' তো বটেই। কেননা বাংলাগদ্য রচনার যে-বৈশিষ্ট্য—তার তাল, লয়, ছন্দ—এককথায় আধুনিক যথার্থ গদ্যরীতি, অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে তৈরি, পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে এ-গদ্য যে কলানৈপুণ্যের গৌরব অর্জন করেছিল, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা প্রথমত, তিনি ছিলেন প্রতিভাবান পুরুষ; দ্বিতীয়ত, অ্যাকাডেমিকভাবে তিনি তখনকার উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি; তৃতীয়ত, ইতিমধ্যেই অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে বাংলা গদ্যরীতি গড়ে উঠেছে এবং তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুশৃঙ্খল ও সুচ্ছন্দ রূপ নিয়ে। এ-গদ্য তাঁর সামনে ছিল। সেজন্য বলেছি, যে-গদ্যের ভিত্তি এত মজবুত ও গতিশীল, যথার্থ প্রতিভাবানের পক্ষে তাতে কলানৈপুণ্যের অপূর্বত্ব নিয়ে আসা স্বাভাবিক। তার পরও ঐতিহাসিক সত্য এই যে, বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র (১৮৪৭) প্রথম সংস্করণের ভাষা মোটেও ভালো ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণের বেলায় ও-বইয়ের ভাষা মোটামুটি সুন্দর হয়ে ওঠে। অক্ষয়কুমার 'সুশৃঙ্খল' ও 'সুচ্ছন্দ' গদ্য পাননি। তাঁকে বাংলাগদ্যের যথার্থরূপ আবিষ্কার করতে হয়েছে। অক্ষয়কুমারের প্রথমজীবনের লেখা গদ্য দেখে দুজন বাঙালি লেখক আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। এঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনা দেখে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন : "যে ব্যক্তি বহু দিবসাবধি এই কার্য করিয়া আসিতেছে, তিনি এমত সুন্দর লিখিতে পারেন না।" অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন তাঁর ভাষা 'অতিশয় হৃদয়গ্রাহী' ও 'মধুর'। এ-কারণেই তিনি অক্ষয়কুমারকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমারের অসাধারণ প্রতিভাকে দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন—কেউ-কেউ এমন কথা বলেছেন। এ-কথায় সত্য আছে কিন্তু এরই ফলে বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বুদ্ধির যে সুবিস্তৃত পথ খুলে গিয়েছিল, কেবল সে-কারণেও দেবেন্দ্রনাথের কাছে বাঙালির ঋণ স্বীকার করা উচিত।

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য জটিলতা। এ না হলে 'মৃত' ও 'পতিত' বাঙালির এত বিচিত্র চিন্তার দ্বার খুলে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত কি না সন্দেহ। সম্ভব হত না এ-জাতিকে স্বাধীন চিন্তায় দীক্ষিত করা। তাঁর ভাষা, তাঁর রচনা, তাঁর চিন্তা, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর হৃদয় সবই ছিল তাঁর চরিত্রের মতোই সুঠাম ও সুগঠিত। জ্ঞানের পথ সহজ নয়। সে-পথের নির্দেশনা আরও কঠিন। সে-পথে চলা তার চেয়েও কঠিন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলা বিদ্বানের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। এমনকি সে-পদ্ধতিতে চিন্তা প্রকাশ করাও দুরূহ। তাই তা সবার সাধ্যের বাইরে। অক্ষয়কুমার নিজে এমনই একটি পথে চলেছেন। তাঁর চিন্তাও তাঁকে অনুসরণ করেছে। জ্ঞান তাঁর হাতে সহজেই ধরা দিয়েছে। পাণ্ডিত্য তাঁর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়নি। সেজন্য দেখা যায়, তাঁর হাতে বিচিত্র চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে সহজে কিন্তু তা যেমন সুশৃঙ্খল তেমনই সাবলীল।

যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত, তাঁরা কেবল বিদ্যাসংগ্রহ করেন না। সে-বিদ্যাকে তাঁরা প্রথমে নিজের মনে, পরে অন্যের মনে সহজ করে তোলার ব্যাপারে স্বচ্ছ ও অনন্যদৃষ্টির পরিচয় দেন। এ-কাজ প্রতিভাবানের জন্য সত্য। আজকাল লোকে পাণ্ডিত্য বলতে বোঝে দৃষ্টিহীন বিদ্যার বুজরুকিকে। কিন্তু পাণ্ডিত্য আসলে প্রজ্ঞার নির্মল প্রকাশ—যার গভীরে বোধ আছে, বুদ্ধি আছে, দৃষ্টি আছে কিন্তু বোধের বিকার ও বুদ্ধির শাণিত ঔদ্ধত্য সেখানে বোধির শাসনে সংযত, শান্ত, সমাহিত; সংশয় ও সংগ্রামের তীব্র বাসনাও সেখানে প্রবল, কিন্তু বহুশ্রুতি ও নানা অভিজ্ঞতার সংখ্যাহীন উপাদান-উপকরণে সেখানে সৃষ্টি হয় এক অনন্য আলোর বিচ্ছুরণ; সে-আলোর নামই প্রজ্ঞান। এমন আলোতে জীবন ও জগৎকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখার নামই দর্শন। দর্শনের কাজ কেবল এই নয় যে, সে নতুন নতুন নিয়ম আবিষ্কার করবে। দর্শনের কাজ এও যে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে যে-তথ্য আছে এবং মানবজীবন সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত আছে, তা সে নতুনতর যুক্তির আলোকে বিচার ও বিশ্লেষণ করবে। এই বিচার ও বিশ্লেষণে দর্শনের নতুন নিয়ম উদ্ভাবিত নাও হতে পারে কিন্তু এর ফল অর্জিত জ্ঞান সত্য আকারে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এমনিভাবেই বড় সভ্যতা গড়ে ওঠে। এদিক থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙালির প্রথম দার্শনিক পুরুষ—যাঁর হাতে জ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানের বিষয় ও মননের বিষয় বাংলাভাষায় বাঙালি জীবনে ও মননে নতুন উপযোগিতা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। বিবেক, বুদ্ধি, নিষ্ঠা, বিবেচনা, যুক্তি ও নৈতিকতার এক মহৎ সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে ও চিন্তায়। এর ফলে বাঙালির বহুদিনের 'ছানি পড়া' চোখের পরদা খুলে গিয়েছিল।

অক্ষয়কুমার 'বহুবিদ্যা'র অধ্যয়ন আর আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে বাঙালির রক্তের মধ্যে আছে এক অস্বাভাবিক আবেগ-ব্যাকুলতা। ফলে যথার্থ বুদ্ধির মুক্তি এখানে ঘটেনি। শিল্পীসুলভ ভান-ভণ্ডামিও এঁদের স্বভাবজাত। এমন অবস্থায় অতুল গুপ্তের ভাষায়, অক্ষয়কুমার "বিজ্ঞানের চর্মে ঢাকা অজ্ঞানের বুকে সোজাসুজি ছুরি বসিয়েছেন। সে ছুরির ধার ও ঔজ্জ্বল্য চোখে ধাঁধা লাগায়, কিন্তু সে চুরি যে খুন করার ছুরি তাতে সন্দেহ থাকে না।"

আমাদের আবেগ-ব্যাকুলতা আমাদের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙে দিয়েছে। মানুষ হতে গেলে মেরুদণ্ড চাই। মেরুদণ্ড ছাড়া মানুষ খেয়েপরে বেঁচে থাকতে পারে হয়তো কিন্তু যথার্থ মানুষের জন্য প্রয়োজন মেরুদণ্ড। আমাদের অনেক কিছুই আছে অথচ আমাদের দৈন্য ঘোচে না! কেন? রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সে-ই যথার্থ গরিব—যার সম্পদ আছে কিন্তু সে-বিষয়ে জ্ঞান নেই। মূল্যবোধহীনতার জন্ম এখানেই। আমাদের বুদ্ধি আছে কিন্তু তার যথার্থ ব্যবহার নেই; বিদ্যা আছে কিন্তু তার গভীরতা নেই; কল্পনা আছে কিন্তু তার বাস্তবতা নেই; যুক্তি আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই; নীতি আছে কিন্তু নৈতিক হওয়ার গরজ নেই; জ্ঞান আছে কিন্তু বিজ্ঞান নেই। সর্বোপরি সত্য এই : অক্ষয়কুমারের কাল থেকে আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রশ্নে আমরা পরনির্ভরশীল। বিদেশী সাহায্য ছাড়া আমরা আজও নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারিনি। অক্ষয়কুমারের এ-জ্ঞান ছিল বলে তিনি তাঁর কালের অগৌরব মানতে পারেননি। কেননা স্বদেশের ব্যাপারে হীনম্মন্যতা, আপন শক্তি ও জ্ঞানের উপর অবিশ্বাস, চরিত্রের নানা দুর্বলতা—এসব নিয়ে তো মানুষের সমাজে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায় না। কাজেই অগৌরবকে অতিক্রম করতে হবে জ্ঞানে, মনে, চরিত্রে—এই ছিল অক্ষয়কুমারের জীবনের পরম তপস্যা। এজন্য দেখা যায়—যা বিচারবুদ্ধির অধীন, তার বিচার-বিশ্লেষণে ও উপস্থাপনায় তাঁর মন একেবারে নির্বিকার। আর সে-নির্বিকারত্ব এতবেশি প্রবল যে, আমরা তাঁর মনের ঐশ্বর্য আর হৃদয়ের বিরাটত্বকে আজও পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারিনি। এর ফলে সমগ্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর যথার্থ উত্তরসূরি তালাশ করে পাওয়া কঠিন। তাঁর সমকক্ষতা অর্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারিনি বলে সর্বতোভাবে আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছি। তাঁর কীর্তিকে আমরা ভুলতে পারি কিন্তু অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ হয় না। সূর্যের আলোকে ঠেকায় কে! অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞানে ও বিদ্যায় বিশ্বপথিক; মনে ও হৃদয়ে স্বদেশী এবং চিন্তায় ও চরিত্রে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি।

৫

এবার বলে নেয়া যাক অক্ষয়কুমারের রচনাবলি ও আমাদের সঙ্কলন বিষয়ে কিছু জরুরি কথা। গ্রন্থ আকারে অক্ষয়কুমারের বেরিয়েছিল নিম্নলিখিত বইগুলো :

> *অনঙ্গমোহন কাব্য* (১৮৩৪); *ভূগোল* (১৮৪১); *শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা* (১৮৪৫); *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (প্রথম খণ্ড, ১৮৫১ ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৫৩); *চারুপাঠ* (প্রথম খণ্ড, ১৮৫৩; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৫৪; তৃতীয় খণ্ড, ১৮৫৯), *বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ* (১৮৫৫); *ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫); *ধর্ম্মনীতি* (১৮৫৬); *পদার্থবিদ্যা* (১৮৫৬); *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (প্রথম খণ্ড, ১৮৭০; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৮৩); *প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার* (১৯০১); *বিবিধ পাঠ* (১৮৪৮)।

অক্ষয়কুমারের এমন অনেক রচনা সে-সময়ের পত্রিকার পাতায় রয়ে গেছে যেগুলো সংকলন করলে দু-তিনটি বই হতে পারে। এমনকি তাঁর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতেও রয়েছে অনেক লেখা। এ ছাড়াও তিনি যে দীর্ঘ বারো বছর 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, সেগুলো একেকটি মূল্যবান ছোট প্রবন্ধবিশেষ। সেগুলো তাঁর রচনাবলিতে সংযোজন করা বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে-পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলি প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা দেখি না। অথচ বাংলাদেশ থেকে তাঁর রচনাবলি প্রকাশ করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে অনেক বড় বড় প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান আছে। দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা কেউ এগিয়ে এলে হয়তো বাঙালি জাতি অক্ষয়কুমার দত্তকে নতুন করে বুঝতে-শিখতে পারত। এ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বৎসমাজের কাছেও আমাদের নিবেদন তাঁরা যেন অক্ষয়কুমার দত্তের বিলুপ্তপ্রায় রচনাবলি প্রকাশে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেন। নানা দিক থেকে তাঁর রচনাবলির গুরুত্ব আজ সীমাহীন। আজও যে তাঁর সমগ্র রচনাবলি বের হয়নি এবং বাজারে সুলভ করা যায়ানি—এটা আমাদের লজ্জার বিষয়; এ আমাদের বিস্মৃতিপ্রবণ মনের প্রমাণও। আমরা গভীরভাবে অনুভব করি যে, তাঁর সমস্ত লেখা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রকাশ হওয়া দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মু শ ফি কু র র হ মা ন

বিশ্বের উষ্ণায়ন এবং আমাদের অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ

আমাদের চারপাশে সারাক্ষণ যে-কথাগুলো আলোচিত হয় তার অনেকটুকু জুড়েই হতাশা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আবর্তিত আলোচনা। রাজনীতি, অর্থনীতির দুরবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধের সংকট, রাষ্ট্র ও জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকার হুমকি, আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব এ-সবই প্রতিমুহূর্তের আলোচনার উপাদান। হয়তো আমরা কাজ করার চেয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করি বেশি, আলোচনা করার মতো পর্যাপ্ত এবং দায়ভারমুক্ত সময় আছে বলেও তা করি। এবং মজার ব্যাপার হল, দেশের ভেতরে যেমন, তেমনি দেশ থেকে যারা দূরদেশে গিয়ে বসত গড়েছেন তাদের মধ্যেও এর খুব বেশি ব্যতিক্রম নেই।

গত সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে যেতে হয়েছিল। আরও কয়েকবার অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য শহরে গেলেও এই প্রথমবার সিডনি গিয়েছিলাম। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনেক বন্ধু এখন সিডনিতে, মেলবোর্নে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। পুরোনো দিনের নস্টালজিয়া বন্ধুদের কাছে দ্রুতই টেনে নেয়। দেশের কথা, রাজনীতির কথা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতির আলোচনা প্রায় রুটিন-উপাদানের মতোই আলোচিত হয় দ্রুত। একপর্যায়ে নিজেদের কর্মক্ষেত্র, পরিবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আলোচনাও এসে পড়ে। বন্ধুপত্নী—সেও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের একজন। যথেষ্ট মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছে। হয়তো জাগতিক নিয়মে আমাদের চেয়ে ঘর সংসারের ব্যাপারটা সে ভালো বোঝে। আমার দেশে পড়ে থাকার কারণটা সে বোঝার চেষ্টা করে। যতই বলি দেশ ছেড়ে যেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়-পর্ব শেষে যাওয়াই উত্তম ছিল। এখন এই বয়সে প্রবাসে শূন্য থেকে শুরু করা কঠিন। তাছাড়া নানা দেশে পরিচিত বন্ধুদের জীবনসংগ্রামের শুরুর বছরগুলোর কষ্ট নিয়মিত শুনি, মাঝে মাঝে কাছ থেকে দেখি বলে বিষয়গুলো বুঝবার খানিক বুদ্ধি আমার হয়েছে। আমি উৎসাহ দেখাতে চাই না। বন্ধুপত্নী আমাকে আশ্বাস দেয়—যত কঠিন মনে হচ্ছে সবার জন্য তা নাও হতে পারে। আমি বলি, যে কষ্ট বিদেশে এসে করতে হবে সেটি দেশে করলে খেয়ে পরে তো চলে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুপত্নী আমাকে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ, লেখাপড়া, চিকিৎসার সুযোগগুলোর কথা মনে করিয়ে দেন। আমি আশাবাদী মানুষ বলে দেশের পরিবর্তন-সম্ভাবনাগুলোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। ইঙ্গিত করি, ধনসম্পদ ও পুঁজি সঞ্চয়নের প্রাথমিক পর্ব তো লুটপাট আর বর্বরপ্রক্রিয়া। যুগে যুগে দেশে দেশে পৃথিবীতে তাই-ই হয়ে এসেছে। আমাদের দেশই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন। খোদ অস্ট্রেলিয়াও তো তার ব্যতিক্রম ছিল না। এখন এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলেও একটি সম্পদশালী ধনিকশ্রেণী দেশে গড়ে উঠেছে। তাদের সম্পদের সঞ্চিত পরিমাণও নগণ্য নয়। পুঁজি বিকাশের নিয়মে এই সঞ্চিত পুঁজির মালিকগণ রাষ্ট্রকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার, অবকাঠামোগুলো দাঁড় করাতে মনোযোগী হবে। একই প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত কার্যকর আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ, গতিশীল প্রশাসন যন্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকাঠামো গড়ে উঠবে।

আমার আশাবাদী এ সকল বিশ্লেষণ বন্ধুপত্নীকে খুব প্রভাবিত করে বলে মনে হয় না। সে তখন অন্য পথ ধরে। ভৌগোলিক ও পরিবেশগতভাবে বাংলাদেশের অবস্থান, ঐতিহাসিকভাবে প্রায় ১৪-১৫ কোটি জনসংখ্যার বিশাল ভারে ন্যূজ এই দেশের জন্য প্রকৃতির বৈরী আচরণ কীভাবে আমাদের ভবিষ্যৎকে সংকটাপন্ন করতে পারে—সেদিকে সে দৃষ্টি মেলে। এ-প্রসঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের উষ্ণায়ন, সমুদ্রপৃষ্ঠের স্ফীতি, প্লাবনভূমির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বিপন্ন অস্তিত্বের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তাছাড়া সীমিত সম্পদের ওপর বিপুল জনসংখ্যার ক্রমাগত চাপ যেভাবে বাড়ছে, তাতে সম্পদের বণ্টনব্যবস্থার সাম্য এলেও তাতে কেবল 'দৈন্য' ও 'হাহাকার' বণ্টিত হবে বলেও সে সতর্ক করে। সুতরাং দেশের মায়া কাটিয়ে দূরদেশে পাড়ি দিলে অন্তত দুটো লাভ হবে। এক : দেশের সীমিত সম্পদের অন্তত কিছু ভাগীদার কমবে। দুই : প্রকৃতি নির্ধারিত বন্যা, খরা, সাইক্লোন, জলাবদ্ধতা, মহামারী, ভূমিকম্প আশঙ্কাতাড়িত প্রতিদিনের চাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। তাছাড়া প্রযুক্তি-বিপ্লব যেভাবে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে তাতে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে থেকেও দেশের জন্য কিছু করা প্রতিমুহূর্তেই সম্ভব এবং অনেকেই তা করছে, সে কথা বন্ধুটি মনে করিয়ে দিল। আমার বন্ধুটি এতক্ষণের আলোচনায় মনোযোগী শ্রোতা থেকে সরব অংশগ্রহণকারী হয়ে আবির্ভূত হল। তার ইঙ্গিত স্পষ্টত বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে প্রবাসে চাকুরিরতদের আয়ের পাঠানো রেমিটেন্স অঙ্কের প্রতি। অর্থনীতির ছাত্র বলেই হয়তো তার মাথায় তৈরি-পোশাক রপ্তানির পরবর্তী প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের খাত হিসেবে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের অর্জিত আয়-এর প্রসঙ্গ উঠে এল। বন্ধুটি আরও মনে করিয়ে দিল, ২০০৫ সনে কোটা-সুবিধে উঠে গেলে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিখাত হিসেবে চিহ্নিত তৈরি-পোশাক-শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ে পড়বে।

আমি প্রবাসী হবার প্রলুব্ধ আহ্বানে সাড়া না-দেবার যুক্তিতে হারতে চাই না। সুতরাং মনে করিয়ে দিই—স্থায়ীভাবে যারা প্রবাসী, দেশে তাদের অর্জিত আয়ের সামান্যই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। তাছাড়া যতদিন যাবে, প্রবাসী পরিবারের সদস্যরা তত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। যে মানুষ যে দেশে বসবাস করছে সেখানকার নাগরিক হিসেবেই তার ভাবনাগুলো আবর্তিত হবে। বিশেষত দ্বিতীয় প্রজন্মের ইমিগ্রান্টদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'দেশের' পিছুটান আর তাদের তাড়া করবে না। সুতরাং সেভাবে বিষয়গুলো দেখা উচিত। অন্যদিকে দেশের রপ্তানিখাত, অভ্যন্তরীণ শিল্পখাত বাস্তব কারণেই তার ফোকাস পরিবর্তন করছে। ২০০৫ সনের কোটা-সুবিধে উঠে যাবার কারণে তৈরি-পোশাকখাতের অস্তিত্ব পুরো বিপর্যস্ত হবে এমনটা ভাবা অতিসরলীকরণ বলেই আমার মনে হয়। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা ঘুরে দাঁড়াতে পারে বলেও আমি আশাবাদ প্রকাশ করি।

আমাদের এ সকল আলোচনা একসময় শেষ হয়। কেউই আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করি না। তাতে অবশ্য আমাদের বন্ধুত্বে কোনো চিড় ধরে না। একসময় সিডনির দ্রুত-পরিবর্তনশীল সবুজ পার্কগুলো, শহরতলির বাড়ির সামনে সুশোভিত ক্যামেলিয়া ও ম্যাগনোলিয়ার সৌন্দর্যের পিছুটান ফেলে ঢাকার পথে পাড়ি দিতে হয়। দীর্ঘ বিমানভ্রমণে সময় কাটানোর উপাদান প্রচুর, সরবরাহকৃত পত্রপত্রিকা এর মধ্যে একটি। আমি সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' হাতে টেনে নিই। এ-সংখ্যার কভার-স্টোরি 'বৈশ্বিক উষ্ণায়ন'।

কিছু পুড়ে যাওয়া বন আমি অস্ট্রেলিয়ায় সিডনি থেকে হান্টারভ্যালিতে যাবার পথে দেখে এসেছি। অস্ট্রেলিয়ার প্রলম্বিত খরা হাজার হাজার হেকটর বনে প্রায়শই দাবানল উস্কে দেয়। ইন্দোনেশিয়ার কালিমানতান দ্বীপের সবুজ বনে ছড়িয়ে পড়া দাবানলের ধোঁয়ায় সিঙ্গাপুরের আকাশ আচ্ছন্ন হতে আমি দেখেছি আরও আগে। 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বাংলাদেশের উপকূলে ফুলে-ওঠা সমুদ্রের পাশে বিপন্ন 'নূরজাহান বিবির ধানক্ষেত' এবং প্রবল বৃষ্টির ভেতর একই গামছার নিচে আশ্রয় নেওয়া দুই বাংলাদেশী তরুণের ছবি বিশ্বের উষ্ণায়ন ও তার প্রতিক্রিয়ার অনেক চিত্রের একটি।

বিশ্বের দশকোটিরও বেশি মানুষ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার খুবই কাছাকাছি, মাত্র তিনফুট উঁচু জমিতে বসবাস করে। বাংলাদেশের বিপুল অংশ এমন উচ্চতার। একই সাথে এদেশের ঘনবসতির কারণে প্লাবনভূমির নিয়মিত প্লাবিত হবার কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের পরিমাণ বিপুল। যেসব মহাজাগতিক পরিবর্তন বা ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন একসময় দীর্ঘ সময়-পরিসর ধরে ঘটত, সেই পরিবর্তনগুলো এখন আমাদের এক-জীবনের সময়কালেই ঘটছে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশের এ-ধরনের পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাইয়ে নেবার মতো সময় ও সুযোগ কমে আসছে। মানুষের জাগতিক সামর্থ্যও পরিবর্তনের ব্যাপ্তির সাথে তাল মেলাতে পারছে না। এতে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগের ঘনঘটা ক্রমেই বেশি হবার সাথে সাথে সম্পদ ও মানুষের জীবনহানি বেশি ঘটছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল ইন্ধন আবহাওয়ামণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের দ্রুত এবং ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ। যতবেশি কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হচ্ছে গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়ায় আবহাওয়ামণ্ডলীর তাপমাত্রা তত বাড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। পর্বতমালার উপর সঞ্চিত হিমবাহ দ্রুততর গতিতে গলে যাচ্ছে, মেরুঅঞ্চলের সমুদ্রের উপর বরফস্তবের আচ্ছাদন দ্রুত গলে মিশে যাচ্ছে মহাসমুদ্রের জলে। সমুদ্রের উপর ভাসমান বরফস্তর পুরুত্ব হারাচ্ছে। মেরুঅঞ্চলে শতকোটি বছর ধরে জমে থাকা বরফস্তর গলে যাচ্ছে, সমুদ্রতল স্ফীত হচ্ছে, বৃষ্টিপাত বাড়ছে, নদীর অববাহিকায় বন্যা ও প্লাবন বিস্তৃততর হচ্ছে; ভূপৃষ্ঠের উপর জলের সঞ্চয়ক্ষেত্র যেমন, প্রাকৃতিক হ্রদ নদীগুলোতে পানি জমছে বেশি এবং সেগুলোর পানি ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। হ্রদ এবং বর্ষায় বিস্তৃত হলেও শুকনো মৌসুমে দ্রুত সংকুচিত হয়ে পড়ছে। কম-জলাধার-সমৃদ্ধ অঞ্চলে আবহাওয়ামণ্ডলীয় উষ্ণায়নের পরিণতিতে খরা প্রলম্বিত হচ্ছে। শীতকাল তার তীব্রতা হারাচ্ছে। বসন্ত যখন আসবার কথা তার আগেই এসে পড়ছে। শরৎ আসছে অনেক দেরিতে। জলবায়ুর এই দ্রুত পরিবর্তনে আমাদের চারপাশে পরিবর্তনগুলো সব এলোমেলো করে দিচ্ছে। গাছে স্বাভাবিক সময়ের আগেই ফুল ফুটছে। পাখিদের পরিব্রাজন সময় বদলে যাচ্ছে। প্রাণীকুলের বসবাসের অভ্যস্ত এলাকাগুলো অনুকূল বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। নতুন বসতি গড়ে উঠছে। উপকূলের প্রবাল গুচ্ছগুলোর চারপাশে শেওলার আচ্ছাদন সরে যাচ্ছে। ঝক্‌ঝকে প্রবালপুঞ্জ মাছের ঝাঁকের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় আড়াল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে মাছ হয় দূরে সরে যাচ্ছে অথবা তাদের স্বাভাবিক জীবনচক্র, বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। একইভাবে বসবাসের জায়গাগুলোর বদলে যাওয়ায় প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। দ্রুত অভিযোজিত হতে ব্যর্থ প্রজাতি বিলুপ্ত বা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। উভচর প্রাণীগুলো দ্রুততর গতিতে হারিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হয়ে চেনাজানা সমুদ্রতটরেখা দ্রুত সরে আসছে। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে এককালের নিরাপদ লোকালয়ের আঙিনায়। জলবায়ুর পরিবর্তন এভাবেই বদলে দিচ্ছে আমাদের চেনা পৃথিবী, এর ভৌগোলিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য।

এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশের মতো সমুদ্রতীরবর্তী অত্যন্ত নিচুভূমি দেশের অনেকটুকু তলিয়ে যাওয়ার বিপদ ক্রমেই বাড়ছে। ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশের বিশাল জনসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে ঘনঘন আক্রান্ত হতে থাকলে সম্পদের অপচয়ে প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ মোকাবেলার সামর্থ্য আমরা হারিয়ে ফেলব। এ অবস্থা অবধারিত যদি যেমন চলছে তেমন অবস্থা চলতেই থাকে।

মানুষের সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের সামর্থ্য বেড়েছে। গত কয়েক দশকে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষের বর্ধিত সামর্থ্যের কারণে প্রকৃতির বাধাগুলো জয় করে টিকে থাকার এবং বিকশিত হবার সুযোগও সৃষ্টি করেছে। বস্তুত পৃথিবীর সমৃদ্ধ অঞ্চলের মানুষ ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে বৈরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তনগুলো অবধারিত, সেগুলো মানুষের সামনে চলার সামর্থ্যকে প্রতিহত করতে পারবে না। প্রকৃতির, পরিবেশের পরিবর্তনগুলো এবং মানুষের উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষার সাথে তাকে মেলানোর, প্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপনের সাফল্যের উপরই টেকসইভাবে টিকে থাকার বিষয়টি সম্পর্কিত। এখন সত্যি সত্যিই মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশ বনাম উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকে আর ভাবে না। প্রতিমুহূর্তে বরং ভাবনার বিষয় এ দুটো বিষয়কে একীভূত করা যায় কীভাবে। ১৯৯২ সনে রিও-ডি-জেনিরোতে ধরিত্রী সম্মেলনের পর মানুষ যে-রকম উন্নয়ন ও সমঝোতার আশা করেছিল—পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগগুলো তার চেয়ে অনেক ঢিলে তালে এগিয়েছে। বিশেষত উন্নত দেশ ও সবল অর্থনীতির দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অনেক কম বিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যকে অর্জনের জন্য এখন সম্মিলিত স্বার্থ, বৈশ্বিক বিপর্যয়গুলোর প্রতি সমবেত অঙ্গীকার ও তা থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধানে মানবসমাজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পৃথিবীর একক বৃহত্তম অর্থনীতি এবং সর্বোচ্চ ভোক্তার দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উষ্ণায়নের প্রধান দূষক কার্বনডাইঅক্সাইডের সবচেয়ে বেশি উদ্গীরণকারী। যুক্তরাষ্ট্র একাই পৃথিবীর মোট কার্বনডাইঅক্সাইড উদ্গীরণের ২৫% জন্য দায়ী। এর পরের অবস্থান চীন এবং রাশিয়ার। যদি মাথাপ্রতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তাহলেও যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় দূষণকারী দেশ। প্রতি একজন মার্কিনি এককভাবে বছরে প্রায় ৬ টন কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করছে। বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের বিবেচনাতেও মার্কিনিরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী দেশ (বছরে মাথাপ্রতি প্রায় ১০ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা)। তুলনা হিসেবে বাংলাদেশে মাথাপ্রতি বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার বছরে মাত্র ১১০ কিলোওয়াট ঘণ্টা।

১৯৯৭ সনে জাপানের কিয়োটো নগরীতে বিস্তারিত আলোচনার পর ২০০৮-২০১২ সনের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা ১৯৯০ সনের পর্যায়ে সীমিত করার আলোচিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। 'কিয়োটো প্রটোকল' নামের ঐ চুক্তি মানতে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ সম্মত হলেও সম্মতি-দেওয়া দেশগুলোর সম্মিলিত কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসের নিঃসরণমাত্রা পৃথিবীতে বছরে মোট উদ্গীরণকৃত কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসের মাত্রার অর্ধেকেরও কম। এর ফলে কিয়োটো প্রটোকল মুখ থুবড়ে পড়তে বসেছে। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ সমৃদ্ধ অর্থনীতির এবং দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতির অনেক দেশই নিজেদের ভোগবিলাসী জীবনাচার থেকে পিছিয়ে আসতে আগ্রহী নয়। ফলে ক্রমবর্ধমান হারে জ্বালানির দহন, শিল্পের দূষণ বাড়ছে। এখন কিয়োটো প্রটোকল সংশোধন অথবা বাতিলের স্পষ্ট দাবি উঠেছে।

এক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আছে কিয়োটো প্রটোকল নিয়ে আলোচনা/চাপ বন্ধ করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর প্রায় ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে ২০০ কোটি মানুষ এখনও প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের প্রায় ৬৫% মানুষ যেমন ঘুঁটে, পাতা, বর্জ্য জ্বালিয়ে কোনোরকমে রান্না আর খাবার মধ্যদিয়ে প্রতিদিনের জীবনযাপনে বাধ্য হয়, প্রাথমিক জ্বালানি সুবিধা বঞ্চিত মানুষের বিপুল অংশ কার্যত তেমনি এক বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জান্তব জীবনযাপন করে। অথচ এরই বিপরীতে প্রচুর অপচয় আর অহেতুক আয়োজনে নিঃশেষিত হয় বিপুল সম্পদ, জ্বালানি। এর মূল্য দিতে হয় পরিবেশকে—বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে যেমন, একইভাবে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়েও, সে কথা সঠিক।

টেকসই ও পরিবশেগত বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়ন করার তাগিদে ১৯৭০ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এবং পরবর্তীতে পৃথিবীতে দ্রুত উন্নয়ন তৎপরতা, প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে তার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের সমীক্ষা চালানো হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালন পর্যায়ে ইতিপূর্বে পরিচালিত সমীক্ষার আলোকে পরিবেশের বিরূপ প্রভাব প্রতিরোধ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল অনুসৃত হয়ে আসছে।

১৯৯৭ সনের বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এ কৌশল ব্যাপকভাবে প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

দক্ষিণএশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে সাথে বাংলাদেশেও এ উদ্যোগ অনেকটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সবুজ, কমলা ও লাল শ্রেণীভুক্ত করে তা বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের আইনি বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়েছে। প্রকল্পভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কৌশল দূষণরোধের সীমাবদ্ধ কৌশল। এ কৌশল তার অন্তর্গত দুর্বলতার কারণেই সম্মুখমুখী নয়। কিন্তু এই সীমিত ও প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনকেন্দ্রিক কৌশলও আমাদের দেশে সিংহভাগ ক্ষেত্রে নেহাত কাগুজে বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরোধে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যাভিমুখী দ্বিতীয় প্রজন্মের কৌশল প্রয়োগ করা শুরু করেছে। মূলত রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সমবেত সংলাপ ও নীতিনির্ধারণী কৌশল প্রয়াস ও কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষার মাধ্যমে এখন পরিবেশের বৈরী প্রভাব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক নীতি ও কৌশলের সকল সমন্বয় ও সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যদিয়ে সৃষ্ট পরিবেশগত বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি গ্রহণীয় উন্নয়ন কৌশল যে-কোনো স্থানিক বা সুনির্দিষ্ট প্রকল্পভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কৌশলের চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ ও ব্যাপকতার প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। তবে এক্ষেত্রে সাফল্যের মূল সূর সামষ্টিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া, বিশ্বব্যাপী সংঘাত পরিহার করে সংলাপ ও সহযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করার মধ্যে নিহিত।

একটি উদাহারণে বিষয়টি বলা যেতে পারে। ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটানের আঞ্চলিক নদীগুলো পরস্পর সম্পর্কিত ও অভিন্ন স্বার্থের জলধারা ও জলাধার। এই সম্পদ ও গতিময় নদীগুলোর সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার, আঞ্চলিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ বোঝাপড়া ও নিবিড় বন্ধুত্বের পরিবেশেই সবচেয়ে ভালোভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব। যে-কোনো একক দেশ তার সংকীর্ণ ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিলে যে অচলাবস্থা দেখা দেবে তাতে সম্পদের ব্যবহার যেমন তার সম্ভাবনার সামান্য অংশ স্পর্শ করতে ব্যর্থ হবে, একইভাবে এই সম্পদের ভাগাভাগি পুরো অঞ্চলে পরিবেশগত, রাজনীতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে অস্থিরতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতার ইন্ধন হতে পারে। সেক্ষেত্রে সহযোগিতার ও সংলাপের পরিবেশে যে সম্ভাবনাগুলো অঙ্কুরিত হয়ে দ্রুত বিকশিত হতে পারত তা হয়ে উঠতে পারে বিষময় এক বিরোধের উপাদান।

বিশ্বজুড়েই যেহেতু পরিবেশের সংকটগুলো প্রলয়ঙ্করী হবার সংকেত দিচ্ছে, তাই পরস্পর নির্ভরতার ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা সমাধানেও মানবজাতিকে আজ এগোতে হবে। এক্ষেত্রে যাদের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাদের যেমন আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করতে হবে, একইভাবে বঞ্চিত ও স্বল্প-সামর্থ্যের দেশগুলোকে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি সহায়তা দিয়ে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিপর্যয় মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান সংকট ও অস্থিরতা কাটিয়ে শান্তি ও সমন্বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিত করার অনুকূল শর্ত সৃষ্টির জন্যও তা জরুরি।

আমাদের মতো দেশের জন্য প্রতিপদে অন্তত এতটুকু প্রজ্ঞা দেখাতে শিখতে হবে যেন বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সমঝোতার সেতুবন্ধন রচনায় আমরা অনুকূল ইন্ধন হই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শো য়া ই ব জি ব রা ন

নব্বইদশকের কবিতা প্রসঙ্গে

'দশক' 'শতাব্দী' 'সহস্রাব্দী' এ অভিধানগুলো একইসাথে অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা যেখানে সময়ের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ প্রকাশ করছে সেখানে এ বিবেচনাসমূহ প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই পারে। তথাপি, গুহাযুগ থেকেই মানুষ সময়ের ধারণা পোষণ করেছে, অখণ্ড অথবা অস্তিত্বহীন সময়কে খণ্ড করেছে, সুবিধাজনক প্রেক্ষিতে বিভাজন করেছে। সাহিত্য বিবেচনায়ও এ সময় বিভাজনকে কাজে লাগানো হয়েছে। যদিও-প্রকল্পনাটি ইউরোপীয়; বুদ্ধদেব বসু পশ্চিমের সাহিত্যতত্ত্ব আমদানীর সাথে এ বিবেচনাবোধটিও বাংলাসাহিত্যে আমদানী করেছিলেন। তারপর বাংলাসাহিত্যে দশকভিত্তিক বিভাজন কৌশল একটি প্রচলতায় পরিণত হয়েছে।

যে সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের সে সাহিত্যে দশ-বৎসর সময়টি খুবই অল্প। তথাপি, একটি ভাষাগোষ্ঠী যেমন দশমাইল অন্তর তাদের ভাষারেজিষ্ট্রার বদলে ফেলে তেমনি, দ্রুত পরিবর্তমান সময় কাঠামোতে দশবৎসরে সাহিত্যও তার আকর ও আকরণ—অনেকটা বদলে ফেলছে। এ-বদলটা হয়ত একেবারেই নয় উত্তরাধীকারহীন—আনকোরা তথাপি বিবেচ্যণীয়।

বিশশতকের নব্বইদশক বলতে আমরা ১৯৯০–১৯৯৯ পর্যন্ত সময়খণ্ডকে বুঝি। কিন্তু নব্বইদশকের কবিতা বলতে কী বুঝি? এ সময়খণ্ডের মধ্যে লেখা কবিতা? কিন্তু, এ-সময়ের মধ্যে যেমন শামসুর রাহমান কবিতা লিখেছেন তেমনি লিখেছেন টোকন ঠাকুর। সুফিয়া কামাল যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন সেলিনা শিরিন শিকদার। সুতরাং এ-সময়খণ্ডের ভেতর কবিতা রচনা বা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেই তাঁকে এ-দশকের কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। সকল মানদণ্ডই আপেক্ষিক—এ-অনির্ভরযোগ্যতা স্মরণে রেখেও নব্বইদশকের কবিকৃতির মধ্যে প্রবেশের জন্য অন্তত দুটো মানদণ্ড আপাতভাবে মনে রাখা যেতে পারে। প্রথমত এ-সময়খণ্ডের আকর ও আকরণকে কবিতায় ধারণ ও দ্বিতীয়ত এ-সময়খণ্ডের ভেতর কবি তার হিসেবে উত্থান বা কাব্যকৃতির বোধিজন স্বীকৃত।

নব্বইদশকের কালিক পটভূমি হিসেবে এ-সময়খণ্ডের আকরসমূহ খানিকটা উল্লেখ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক।

নব্বইদশক তথ্য বিপ্লবের দশক। এ-দশকেই এ-অঞ্চল সাইবার প্রবাহে প্রবেশ করে। এ সাইবারনেটিক্সের প্রথম জীবাণু ধারকটি যদিও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ১৯৬৫ সালে সাভারে বসিয়েছিল, তথাপি ব্যাপক সংক্রমণ ঘটে এ-দশকের প্রারম্ভ পর্যায়েই। সাথে যুক্ত হয় ডিশসংস্কৃতি। ফলে, এতোদিনের ধীর-শ্লথ ও অনাধুনিক প্রিন্টেড তথ্য/তত্ত্ব প্রবাহের স্থানে দ্রুতগামী ও সর্বগ্রাসী ইলেকট্রনিক তথ্যসংস্কৃতি প্রবাহে এ-অঞ্চল প্রবেশ করে। নব্বইদশকের সামনে খুলে যায় বিশ্বের বিশাল-জানালা। এ-জানালার উন্মাতাল হাওয়া একইসাথে সৃষ্টি করে সম্ভাবনা ও সংকট। কবি তাঁর এ-বিশ্বগ্রামের, বিশ্বসংযুক্তির ভেতর নিজের আইডেনটিটি ক্রাইসিসে পতিত হন; কল্লোলিত, হু-হু মাঠের ভেতর নিঃসঙ্গ মানুষে পরিণত হন। দুটো বিশ্বযুদ্ধ মানুষের বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছিল এগুলো বহু-পুরাতন কথা, গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রাইকা মানুষের সর্বশেষ ভরসাস্থলটিকে এ-দশকের প্রান্তে ভেঙ্গে ফেলে। মানুষ টুথপেষ্টের মতো, স্যানিটারী ন্যাপকিনের মতো খোলাবাজারে নিক্ষিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধুই একটি অসহায়-বাজার। সমাজের অগ্রগামী অংশ হিসেবে এ-অসহায়ত্ব নব্বইয়ের কবিদের তাড়া করেছে। স্নায়ুযুদ্ধ-পতন উত্তর বিশ্বরাজনীতিতে নিশ্চয় মার্কিনীদের একচেটিয়া অধিপত্য, বেপরোয়া আগ্রাসন, দমননীতি এবং এদেশের পাশ্চাত্যদের অনুসরণ এ-দশকের কবিদের বিবমিষিত করেছে।

উনিশশতকে এ-অঞ্চলে তথাকথিত রেঁনেসাঁ বা আলোকপর্ব সংগঠিত হয়েছিল ঔপনিবেশকদের দোসর মিশনারীদের দ্বারা। আর বিশশতকে সংগঠিত হয়েছিল এনজিওদের দ্বারা। তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন, সুশীল সমাজ ইত্যাকার প্রপঞ্চের অর্থ ও অর্থহীনতা এ-দশকের কবিরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। একাকী অনেক কবি এ-সমস্ত বিশশতকীয় অর্থনৈতিক মিশনারীর কাজে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, আছেন।

আমাদের গ্রামের ও বিশ্বগ্রামের এ সমূহ-ঘটনা ও ক্রিয়া এ-পাড়ায় এবং তারও আগে ইংরেজিভাষিত পশ্চিমীপাড়ায় প্রতিক্রিয়ার সূচনা করেছে। বৌদ্ধিক মহলে এসেছে নতুন তত্ত্ব ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে। বিনির্মাণবাদ, পোস্টমডার্নিজম, উত্তরঔপনিবেশিকতা তারই ফলশ্রুতি। এ-তরঙ্গাভিঘাত ডায়মন্ড হারবার হয়ে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পৌছোতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছে। এবং নব্বইয়ের প্রাথমিক পর্যায়েই ঢাকার প্রান্তে এসেছে। অবশ্য ততোদিনে অনূদিত, অনুসৃত, আত্মীকৃতও হয়েছে। উত্তরআধুনিকতা, সাবঅল্টার্ন এধরনের বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি এ-কালখণ্ডের চিন্তাধারাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত, অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ইতিহাসকে নদীর প্রবাহের সাথে তুলনা করেছেন এবং এর পালাবদলকে বলেছেন 'নদী বাঁক' পরিবর্তন। নব্বই-এর কবিতাকর্মও পর্বপরিচয়হীন হওয়া অসম্ভব। এরা পূর্ববর্তী দশকসমূহের উত্তরাধিকার শ্রেণীতে বহন করছে। এক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নব্বইয়ের কবিতা-আশির লিটলম্যাগাজিনকেন্দ্রিক অন্তর্মুখী গহনচারী উত্তরাধিকারকেই অধিক গ্রহণ করছে। জীবনানন্দ-উত্তর বাংলাকবিতা ক্রমশ তরলায়িত ও বহির্মুখ হতে থাকে। সত্তরের দশকে এসে তা জলবৎ রূপ পায়। অনেকটা এর প্রতিক্রিয়ায় আশির দশকে কবিতা অনেকটা স্থিতধী, অন্তর্মুখী, শুদ্ধচারী হতে থাকে। এক্ষেত্রে দৈনিকের জনপাতা থেকে লিটলম্যাগাজিনভিত্তিক সাহিত্যচর্চা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ফলে আশির দশকের লিটলম্যাগাজিন গাণ্ডিব, পেঁচা, নদী, প্রান্ত যেমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে নব্বইয়ে তেমনি 'সূচক' 'শব্দপাঠ' 'দৃষ্টব্য' 'প্রতিশিল্পা' প্রভৃতি নব্বই-এর অন্তর্মুখী কবিতাকে ধারণ করে

নব্বইয়ের সময়খণ্ডের ভেতর সংগঠিত, চিন্তায়িত যে-প্রভাবকসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে তার সংক্রমণে এ-দশকের কবিতা হয়ে ওঠে অন্তর্মুখী, আত্মভাষিক। ম্যাক্রোমুখী চেতনার স্থলে কবিরা হয়ে উঠেন মাইক্রোমুখী। বিপুলবিশ্বে তাঁরা নিয়ত একাকী। ফিরে তাকান নিজের দিকে। ত্রিশেরদশক থেকে ক্রম-আমদানীকৃত তথাকথিত আধুনিকতা থেকে ম্লান মুখে তাকান প্রান্তিকায়িত অভিজ্ঞতার দিকে। কৃত্রিম নাগরিক চেতনা অবক্ষয়বোধ পশ্চিমী চশমার ঘোলাকাচে দেখা গ্রামচেতনার প্রতিপক্ষে তাঁরা দাঁড়ান একেবারে জমির আলের উপর, বুবুর অভিজ্ঞতার ভেতর।

জীবনানন্দ-উত্তর বাংলাকবিতা ক্রমশ বক্তব্য প্রধান হয়ে ওঠে। কবিতা অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম না-হয়ে, হয়ে ওঠে বক্তব্য প্রদানের মাধ্যম। কোনো কবিতা পড়লে মনে হতে থাকে এগুলো বুঝিবা সংবাদপত্রের প্রতিবেদন। অথবা, কোনো ছোটগল্পের সিনোপসিস। কাহিনী কাঠামোর ভেতর দিয়ে যে-কথা বলা হয় তাও যেন শেষ পর্যন্ত অনুভূতিকে সঞ্চারিত না-করে সুড়সুড়ি প্রদান করে। পাওয়া যায় দুঃখকে চিৎকার করে ফেরি করা, রাস্তার রাজনৈতিককর্মীর লিখে দেওয়া স্লোগান অথবা নবমশ্রেণীর ছাত্রীকে খুশী করে এমত প্রেমবাণী রচনা। কবিতাবলীকে ক্রাপটমেন্টশীপ দেয়ার প্রবণতা। বলাবাহুল্য, এ-প্রবণতাগুলো আশির দশকে বদলাতে থাকে। কবিতাকর্ম বোধিজাত সাধনালব্ধ ধীমানকর্ম হয়ে উঠতে থাকে, তার স্ফূরণ ঘটে নব্বইতে এসে।

চিৎকার, উচ্চকণ্ঠ প্রবাহের প্রান্তে এসে নব্বইয়ের কবিতা মৌন, নতমুখ আত্মকথনরত ব্যক্তির সাধনা। বিখণ্ডিত, বিভক্তকৃত, নিঃসঙ্গ একাকী ব্যক্তির আত্মকথনে হয়তোবা কুণ্ডলায়িত এ-কবিতা। ক্ষুদ্র, সুক্ষ্ম গভীরতলশায়ী অনুভূতি জাগানিয়া ভাবনা-খণ্ডরাশি। অনুভব ও বোধ প্রকাশে উন্মুল এ-কবিতাগুলো। কিন্তু এ-কবিতাগুলোর বোধ এসেছে কোনো ধার করা চেতনা থেকে নয়, শোকাভাসিত প্রান্তিকজন, গহীন জনপথ, আবহমান এ-ভূমির চেতনা থেকে। এ-কারণে বিনষ্টির ভেতরও এ-কবিতা ক্ষীণ আশাবাদ ধারণ করে। পশ্চিমী চশমার বদলে এ-দশকের কবিরা এ-শহর এ-গ্রামগুলোকে দেখেছেন মরমী মন দিয়ে। অনাভিজাত, অনালোকিত দলিতজন ও তাদের বিশ্বাস ও বিষয় উঠে এসেছে এ-কবিতাগুলোতে। শৈশবে কবির শিশ্নে মায়ের চুমু খাওয়ার স্মৃতি যেমনি আছে, তেমনি আছে তেলের শিশি হাতে নিয়ে হাটে যাওয়ার দৃশ্য। সিন্ধু নদীতীরে যে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি কূপ থেকে জল আনতে গিয়ে আর্যদের আঘাতে মারা গেছে তার কষ্ট যেমন আছে, তেমনি আছে শবরের উন্মত্ততার ভেতর বয়ে চলা কষ্টগান। এ-জনভূমি, এ-জনপথ, এ-জলাভূমি ও শহরের গলি সকলেই আছেন কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা প্রকাশে কোনো রগরগে বাস্তবতার দৈন্য নেই, মৌনতা সান্ধ্য মলিনতা আছে। বক্তব্যের স্থলে আছে বোধ, কাহিনী বলার স্থলে আছে কাহিনী কাঠামোর আবহ, বাস্তবতার স্থলে আছে সমকালীনতা, সমাজের স্থলে আছে চিরকালীন সমাজ। এ-কবিতাগুলো কোনো নির্দিষ্ট একক একমাত্রিক অর্থকে বহন করে না অথবা কোনো অর্থই বহন করে না। ফলে কবিতাগুলো বহুমাত্রিক, বহুস্বরিক। আমরা একটি ছকের সাহায্যে কবিতা ও নব্বই দশকের কবিতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি :

প্রচল কবিতানব্বইয়ের কবিতা/ নতুন কবিতা

বক্তব্য	–	বোধ
প্রসঙ্গ/ বিষয়	–	অনুষঙ্গ
কাহিনী/গল্প বলা	–	কাহিনীর আভাস, পৌরাণিক বা লোক কাহিনীর প্রতিভাস
সমাজবাস্তবতা/ রাজনৈতিক অঙ্গীকার	–	অধিবাস্তবতা/ রাজনীতি সচেতনতার কৌণিক প্রকাশ
সমকালীন প্রসঙ্গ	–	চিরায়ত প্রসঙ্গ/পৌরাণিক প্রসঙ্গ
উচ্চকণ্ঠিত হাহাকার, হা-হুতাশ	–	অন্তর্গত মনোযোগ/ আত্মকথন/ মনোকথন
উঠকো নাগারিকতা	–	লোকায়তিক শেকড়ায়ন
ধর্মচেতনা	–	মরমী চেতনা (অবশ্য ধর্মচেতনার প্রকাশ কারো কারো কবিতায় আছে, কিন্তু তাঁরা গৌণ-কবি।)
যৌথবদ্ধতা	–	নৈশব্দচেতনা
স্থূল সুড়সুড়ি/ বক্তব্য প্রদান/ককফনিক	–	বৌদ্ধিকবোধন/ বোধসঞ্চালন/ব্যঙ্গ-স্যাটায়ার/ বহুমাত্রিকতা/পলিফনিক
অর্থনিশ্চয়তা	–	অর্থ-অনিশ্চয়তা/অর্থহীনতা
ছন্দ	–	ছন্দহীনতা
অন্ত অনুপ্রাস	–	মধ্য-অনুপ্রাস/ধ্বনিসাম্য
আবৃত্তিযোগ্য	–	নিবিড় পাঠকামী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-স্বাতন্ত্র্য/পার্থক্যের তালিকা আরো দীর্ঘায়িত করা যায়। বলাবাহুল্য, স্বাতন্ত্র্যিক এ-বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো নির্দিষ্ট একজন কবির মধ্যেই পাওয়া যাবে না, ছড়িয়ে আছে, ছিটিয়ে আছে নব্বইয়ের সকলের মাঝে। এ-প্রসঙ্গে নব্বইয়ের কবিতার ভেতর প্রবহমান ধারাসমূহের কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন। নব্বইয়ের কবিতার দু'টো ধারা প্রাথমিক পর্যায়েই চোখে পড়ে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রথাগত ধারা অপরটি নিরীক্ষাপ্রবণ ধারা। প্রথাগত কবিরা মূলত এ-দশকের না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আশির দশক থেকে ছিটকে নব্বইয়ে এসেছেন। এরা বোধ ও বোধির ক্ষেত্রে ষাট দশকের কাব্যচেতনা বহন করছেন। এদের কবিতার স্লোগানধর্মিতা, পশ্চিমা অবক্ষয়বোধ ও অন্যান্য ব্যাপারে জনপ্রিয় ধারার কাব্য উপকরণ সহজেই ধরা পড়ে। নিরীক্ষাপ্রবণ নব্বইদশকের কবিদের কবিতার মধ্যেও উপধারা রয়েছে।

ক. গ্রামীণসংস্কৃতি লোকায়তিকবোধ ও ঐতিহ্য-চেতনা নব্বইয়ের কবিতার প্রভাববিস্তারকারী একটি উপধারা। এ-ধারার কবিদের কবিতার বক্তব্য/প্রসঙ্গ/অংশ জুড়ে আছে আবহমান বাংলার জল, মাটি। শব্দ, চিত্রকল্প নির্মাণে আঞ্চলিকতার বহুল-ব্যবহার এদের কবিতায় রয়েছে। এদের কেউ-কেউ মধ্যযুগের পুরাণে বি-ব্যবহার করেছেন।

খ. ধ্রুপদীবোধ ও মিথচেতনার কবিরা তাদের প্রকাশ ও অনুভব প্রকাশে আর্কিটাইপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন ভারতীয়, প্রাচ্যীয়, মধ্যপ্রাচ্যীয় মিথ ও লিজেন্ডসমূহকে। এক্ষেত্রে গ্রীক ও প্রতীচ্য পুরাণের অব্যবহার লক্ষ্যণীয়। কিন্তু, কোথাও সরাসরি মিথ বা মিথচরিত্রের উল্লেখ করেননি। কিন্তু কবিতাগুলোর গভীরতলে মিথকাঠামো দণ্ডায়মান। এঁদের কবিতা ধ্রুপদীবোধ সঞ্চারী।

গ. মরমীচেতনা নব্বইয়ের কবিতার এক উজ্জ্বল প্রান্ত। বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে বাউল মারফতি গানের পুনর্নির্মাণ যেমন এ-দশকেই দেখা যায় কবিতার ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটে। এক্ষেত্র সুফিবাদী, বৈষ্ণববাদী, বাউলতাত্ত্বিক অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবহমান। অবশ্য, এ-ধারার কোনো কোনো কবিতার সাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনা/বোধ লক্ষ্য করা গেছে। নৈঃসঙ্গবোধ, আত্মকথন, একান্তব্যক্তিক অনুভব-অনুভূতির প্রকাশ নব্বইয়ের প্রায় সকল ধারার কবিতার মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে।

১৯৯০–১৯৯৯ সময়খণ্ড নব্বইয়ের কবিতার সূচনাকাল। ইতোমধ্যে এ-দশকের কবিরা তাঁদের প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করেছেন। শতাব্দীর শেষ দশকে বৈশ্যযুগের তীব্রতীরের মুখে তুলে নিয়েছেন যে-গান, তা হয়ত আগামী-কবিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। কেননা, এ তমসা-নদীর তীরে ত্রিসন্ধ্যায় যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউ-কেউ প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহবুবুল হক

'Postmodern Bangla Poetry' : *অধুনান্তিক বাংলা কবিতার সংকলন*

গত শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য পরিমণ্ডলে 'পোস্টমডার্ন' বিষয়টি ব্যাপক আলোড়ন তোলে। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী লেখক-বুদ্ধিজীবীরা লিটলম্যাগাজিনের অনুসন্ধিৎসু সম্পাদকগণ 'পোস্টমডার্নিজম' ইত্যাদি শব্দ ও তত্ত্ব নিয়ে নানামুখী বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন। এর একাংশ ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক ও সচেতন পর্যবেক্ষণ ও পঠন-পাঠনের প্রতিক্রিয়া, একাংশ সতর্ক অনুকার এবং বহুলাংশই নির্বোধ অবিমৃশ্যকার। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই 'পোস্টমডার্ন' জৌলুস হারিয়ে পুরোনো পরিচ্ছদের মতো পড়ে থাকে। আরও নতুন নতুন 'পেপারব্যাক থিওরি' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে শিল্প-সাহিত্যাঙ্গন। কিন্তু 'পোস্টমডার্ন' শব্দটি তার সমস্ত তেজস্ক্রিয়া নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যে নিছক চা-এর কাপে ঝড় তোলার জন্য আসেনি।

তর্ক-বিতর্কের অবসরেই অনেক সৃজনশীল লেখক-কবি-সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় 'পোস্টমডার্ন' ভাবানুষঙ্গের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। তন্মধ্যে কবি, বিশেষত তরুণ কবিদের মধ্যেও এই চর্চা পরিপুষ্টতা পায়। 'পোস্টমডার্ন' শব্দটির বাংলা পরিভাষা নিয়ে নানামতের ভিড়ে 'উত্তর-আধুনিক' শব্দটি মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেলেও অব্যাহত থাকে বিতর্ক। কিন্তু তরুণ কবিদের আগ্রহ 'পোস্টমডার্ন' তথা উত্তর-আধুনিকতার নানা বৈশিষ্ট্যকে কবিতায় ধারণ করার দিকে। এই ডামাডোলের মধ্যেই 'বইমেলা'কে কেন্দ্র করে দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তরুণ কবিদের একঝাঁক কাব্যগ্রন্থ বাংলাদেশের কবিতাঙ্গনকে সচকিত করে তোলে। উত্তর-আধুনিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এ-সময়ের কবি এবং কাব্যগ্রন্থ যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি বিবেচ্য নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের কবিতায় উত্তর-আধুনিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ বাংলাদেশের কবিতায় উল্লিখিত সময়কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হলে বিশ্বব্যাপী 'পোস্টমডার্ন' ধারণার উল্লেখ অনিবার্য।

এক দশকের কবিতার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাটি মলাটবন্দি করার এক সাহসী ও শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা—'Postmodern Bangla Poetry'। ভারতের সমীর রায়চৌধুরী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বাংলাদেশের তুষার গায়েন ও কামরুল হাসানের সম্পাদনায় ইংরেজিভাষায় মুদ্রিত এ কাব্যসংকলনে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের ৪৫ জন এবং ভারতের ৫৫ জন কবি। নামকরণ থেকে সংকলনটির উচ্চাভিলাষী চারিত্র্য স্পষ্ট হয়ে যায়। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সবাই বয়সে তরুণ, কবিতাক্ষেত্রে বিচরণ গত এক দশকের মধ্যে এবং প্রধানত লিটলম্যাগাজিনের লেখককর্মী। অর্থাৎ নামাঙ্কনের সাথে লেখকদের স্বতন্ত্র অবস্থান নির্মাণের চেষ্টা জড়িয়ে আছে।

গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো বাংলায় সুলভ হলেও যেহেতু ইংরেজিতেই এগুলো প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকের কাছে পৌঁছেছে সে-কারণে আলোচনার ক্ষেত্রে এর ইংরেজি রূপকেই অনুসরণ ও গ্রহণ করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সংকলনের বাংলাদেশ অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এ-পর্যালোচনা।

২

বিশ্বব্যাপী চিন্তার জগতে আধুনিকতা বা মডার্নিটির ধারণাটি একান্তই আর্থরাজনীতিক প্রোথিতজাত তা আমরা জানি। বস্তুত পৃথিবীর চিন্তাক্ষেত্রগুলো তখনই অর্থ বা ব্যবসাকেন্দ্রিক এবং তৎসূত্রে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতে থাকে। বিশুদ্ধ দর্শনের পরিবর্তে বহুজাতিক কোম্পানি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্তৃক নির্বাচিত, নির্মিত ও পরিবেশিত দৈনন্দিন জীবনদর্শনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া শুরু হয় তার পর থেকেই। এখন তো বিশ্বায়ন বা অবাধ বাণিজ্যের দৈত্য আমাদের মতো পরাঙ্মুখ, ন্যুব্জপৃষ্ঠ, হা-ভাতে জাতি-গোষ্ঠীর জাতীয়তাটিকে পুনর্গঠিত করে নিজেদের মতো বানানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের কবিকুল তাই পণ্যায়ন ও বিশ্বায়নের 'আশীর্বাদ' নিয়েই কাব্যচর্চা শুরু করেছে। যাঁরা জ্যেষ্ঠ তাঁদের কেউ-কেউ কবিতার অনির্দেশ্য পথচলা নিয়ে শঙ্কিত হয়েছেন, নিজস্ব কবিতা-বলয়ে আবর্তিত হয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন পরিবর্তন-চিহ্ন, চিহ্নের পরিবর্তন। বিষয়গুলো আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকাংশে তুষার গায়েন ও কামরুল হাসানের যৌথ পর্যালোচনায় স্থান পেয়েছে। ২০০১ সালে প্রকাশিত 'Postmodern Bangla Poetry'র সাথে বর্তমান সংকলনের গুণগত স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয় তিনটি সমৃদ্ধ নিবন্ধে। সমীর রায়চৌধুরী এবং মলয় রায়চৌধুরীর নাতিদীর্ঘ আলোচনায় বিশ্বব্যাপী 'পোস্টমডার্ন' বা 'পোস্টমডার্নিটি'র বর্তমান বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য সুসংবদ্ধভাবে উঠে এসেছে। The Advent of New Physics in Poetry-তে সমীর রায়চৌধুরী বিজ্ঞানের Quantum তত্ত্বের মতো 'পোস্টমডার্ন'কে একটি open ended তথা উন্মুক্ত জ্ঞানসূত্র হিসেবে এর বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেছেন। ইউরোপের পোস্টমডার্নিটির সাথে লাতিন আমেরিকা-আফ্রিকা-এশিয়ার পোস্টমডার্নিটির সাযুজ্য ও দূরত্বের ক্ষেত্রে সময় ও স্থানের প্রভাবকে বিবেচনায় আনা যেমন জরুরি তেমনিভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো মতবাদ, ধর্মবিশ্বাস বা জ্ঞান-পদ্ধতির সাথে এর পারম্পর্য রক্ষা করে চলার ক্ষমতা। মলয় রায়চৌধুরীর মুখবন্ধেও আমরা একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকৃতি লক্ষ করি। বাংলাদেশের ভাষাবৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি, স্থানিক বিশেষত্বকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের পোস্টমডার্ন তথা 'উত্তর-আধুনিক' তথা 'অধুনান্তিক' কবিতা। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী সাহিত্যচর্চার অগ্রপথিক মলয় রায়চৌধুরীর মুখবন্ধটি সংকলনের পূর্ণতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে। তবে বাংলাদেশের কবিতা এবং পোস্টমডার্ন চর্চা নিয়ে এক দীর্ঘ ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ In search of Postmodern Poetry of Bangladesh—এ-সংকলনের বাংলাদেশ অংশের সম্পাদক তুষার গায়েন এবং কামরুল হাসান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পটপরিবর্তন, দৈশিক-বৈশ্বিক বহুবঙ্কিম রাজনীতির লেখচিত্রের উত্থান-পতনকে তুল্যমূল্যে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে উত্তর-আধুনিকতার উপকরণ ও অনুষঙ্গ-প্রতিষঙ্গ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্থনি গিডেন্‌স 'পোস্টমডার্নিটি'কে একটি স্বতন্ত্র ও নতুন সমাজব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকরূপে বলেছিলেন এবং পোস্টমডার্নিজম, তার ব্যাখ্যায় সে-ধরনের একটি সমাজ সম্পর্কে বা পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে একধরনের সচেতনতা বা সজ্ঞান অবস্থান। সে-হিসেবে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থাকে পোস্টমডার্ন বলা যায় কি না এমন প্রশ্ন দিয়ে নিবন্ধটি শুরু করে লেখকদ্বয় বিষয়ের সর্বসাম্প্রতিক বিস্তৃতি ও মূল্যায়নকে আলোচনায় নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশের 'অধুনান্তিক' শিল্প-সাহিত্য বিষয় ও চারিত্র্যবিচারে 'পোস্টমডার্ন' সাহিত্যের যে যে প্রান্ত স্পর্শ করে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করলেও এ-আলোচনায় বিশেষভাবে পাওয়া যায় স্থানিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পুনর্গঠনে কবিদের বাড়তি অভিনিবেশ। তরুণ কবিদের কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে বলে প্রতীতি হয়। সুতরাং গত শতাব্দীর নয়ের দশকে বাংলাদেশের কবিতায় পোস্টমডার্ন বা উত্তর-আধুনিক লক্ষণগুলো যে-প্রক্রিয়ায় বা যে-তাৎপর্যে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল একযুগের আলোড়নে তা আরও পরিব্যাপ্ত, সুচিহ্নিত হয়েছে; ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগসীমা বা প্রয়োগক্ষেত্রও পালটে গেছে। তাই 'Postmodern Bangla Poetry' বাংলাদেশের কবিদের উত্তর-আধুনিকতা নিয়ে সাম্প্রতিক চিন্তাচেতনার কিংবা তাঁদের কবিতার উত্তর-আধুনিক উদ্দীপনাকে চিহ্নিত করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

৩

একটা সময় ছিল যখন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উত্তরণের পর্যায়কেই আধুনিকতা-উত্তর পর্ব বলে মনে করা হত। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধোত্তর একরৈখিক বিশ্ব-পরিস্থিতিতে সমস্ত ছক পালটে গিয়ে পুঁজি-পণ্য-বাণিজ্যের সমীকরণে সূত্রবদ্ধ হয়ে আছে ব্যাষ্টি ও সমষ্টি উভয়ই। শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেখানে আধুনিকতা বা মডার্নিটির প্রভাব ছিল বা আছে 'পোস্টমডার্নিটি' বা উত্তর-আধুনিকতা সেখানেই প্রতিষ্ঠা করেছে পুঁজি ও বহুজাতিক কোম্পানির ইচ্ছেমাফিক মন্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মন্ত্রের বলে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে বদলে যাচ্ছে সাহিত্য-শিল্প, চিত্রকলা, স্থাপত্য। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও অভ্যাসের ওপর, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে এক অদৃশ্য শক্তি-পুঁজি। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা এসব অব্যাহত চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত নয়, তার অভিক্ষেপ পাওয়া যায় কবিতায়—আলোচ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি :

> We born from comodities, and death means
> division from that,
> Without just forgetfulness human nature haven't any
> synonyms, antonyms,
> There's money, freedom, establishment
> only love, the eternal immense existence.
> *[Deconstruction : Ejaz Eusoofi]*

আধুনিকতা যদি হয় বস্তুকে আপাত স্পষ্ট, দ্বিধাবিভক্ত ও পরস্পর বিপরীত শ্রেণীতে দেখার প্রবণতা তা হলে উত্তর-আধুনিকতা এই দ্বিধাবিভক্ত শ্রেণী বা শাখা বিলুপ্ত করে তাদের অবাধ সাংস্কৃতিক নির্ভরতাকেই প্রকাশ করে। ইতিহাসকে বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করাই এর লক্ষ্য। এই ইতিহাস আবার শুধু অতীতকে অবিকৃতভাবে বর্ণনা করা নয়। এর সাথে সাংস্কৃতিক বা আদর্শিক মতভিন্নতা ও বহুত্বের প্রতিনিধিত্ব এবং ভাষ্য সম্পৃক্ত থাকে সুতরাং "what 'really' happend" যদি ইতিহাস হয়, তা হলে তাকে একটি অলীক ধারণাই মনে করছেন পোস্টমডার্ন তাত্ত্বিকগণ। যেমন ওরাল্টার বেঞ্জামিন মনে করেন 'History is only accessible to us in narrative form' অর্থাৎ ভাষ্যকার ও ভাষ্য মিলে ইতিহাস হয়। এরকম আরও বহু মৌলিক বিষয়ে পোস্টমডার্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত জ্ঞানের ভারসাম্য ও আস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের কবিতায় অংশগ্রহণকারী কবিদের মানসগঠনটি ঠিক সে-পর্যায়ের নয়। অনেক কবিতার মধ্যেই 'আইডিনটিটি'র প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা কবির প্রাথমিক প্রস্তুতিকালের আত্মজিজ্ঞাসা-জারিত—এর সাথে সংযোগ নেই ইতিহাস বা সংস্কৃতির উত্তর-আধুনিক সংজ্ঞার। অবশ্য তৃতীয়-বিশ্বের এই হতদরিদ্র দেশের মানুষ জীবন-জীবিকা, চাওয়া-পাওয়ার টানাপড়েন কদর্য-নোংরা ইন্দ্রিয়চর্চা আর ততোধিক কুৎসিত রাজনীতির সাথে বোঝাপড়া করে টিকটিকির মতো টিকে থাকার যে সার্থকতা দেখিয়ে চলেছে তার প্রতিচ্ছায়া বেশকিছু কবিতায় পাওয়া যায়—

> ১
> The fire of hunger smolders in his hut;
> he looks for the wood that would chop the axe,
> while his axe looks for the white hangs of death—
>
> In an internecine duel one they looked—
> in the fragrant sandalwood grove, Life.
> *[Sandalwood : Khandakar Ashraf Hossain]*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

If you move the bridge the other shore will always
remain at a distance
My feet has left this shore—I am already on the bridge
your fiance's are not bathing in the river, but are the crocodiles
If I go once and come back will you adore me again?
Don't move the bridge, if I come back I shall be
Crocodile's feed.
[Don't move the bridge : Zafar Ahmed Rashed]

৩

Is this but a provocation of time
which, in its abstructness,
call your body away, towards scattered
aimlessness?
I walk, dreamless, the valley of likeness
and when day and night get charred with desire
I gather you once again in the void and in the
shape of void.
[Continents Without a Bridge : Taposh Jaiyen]

AMARBOI.COM

উল্লিখিত কবিতা তিনটি তিনজন কবির হলেও একই সুরে বাঁধা। এতে মানুষের অসহায়ত্বের কথা আছে, আছে স্বপ্নের সংকট। তিনটি কবিতাই সম্ভাবনাহীন বর্তমানকে সম্পর্কহীন অনির্দেশ্যতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে উত্তর-আধুনিক সময়চেতনা বলা যায় কি? উত্তর-আধুনিকতা নস্টালজিয়াকে উৎসাহ দেয়, তবে স্মৃতিচারণের ধূসরতার জন্য নয়, পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্সৃজনের জন্য। এর উদাহরণ আমরা টিভি/সিনেমার নানা অনুষ্ঠানে, ছবিতে, ছাপার অক্ষরে, রঙে, পোশাকি-চুলের ছাঁটে প্রতিনিয়ত দেখি। অর্থাৎ ইতিহাস ও নস্টালজিয়ার এক অদ্ভুত জারণ-বিজারণের মধ্য দিয়ে পোস্টমডার্ন ইতিহাসচেতনা বা সময়চেতনা এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের কবিদের কাছে এই প্রবণতাটি ভিন্ন অনুষঙ্গে রূপ নিয়েছে দেখতে পাই। আঞ্চলিক, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বা জাতিভিত্তিক বহুবর্ণিল সাংস্কৃতিক উপাদান ও উত্তরাধিকার এর পুনরুদ্ধার ও ব্যবহার উত্তর-আধুনিক প্রবণতার অন্যতম দিক। আধুনিকতার কালে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, জাত-শ্রেণী-গোত্রের ঐতিহ্যিক মূল্যবোধকে পরস্পর সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বৃহত্তর ঐক্য অটুট রাখার চেষ্টা হয়েছে আর উত্তর-আধুনিকতা চায় সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্য ও বহুত্বকে ফিরিয়ে দিতে। তাই বাংলাদেশের আধা-সামন্ত, আধা-পুঁজিবাদী সমাজের কবি অবগাহনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে যায়—

১

In summer's Biju festival the trees go drunk
butterflies fly away in forests and woods

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

the grass goes to sleep on footpath of dreams
as hillocks and hills celebrate joy.
[The Super Space Walks in the Folds of cloth : Alka Nandita]

২
Clouds have been frozen in the night
like a curtain as vivid as a river, unyielding.
Moonlight was so transparent in the moon,
is this what we call suprenatural? omni? sweeping?
It has swept me away to that far off chest of chimbuk.
[Ruma Series : Kamrul Hassan]

৩
Over there in Kurhigram, Kingfisher and Pankowri
are stepbrothers
When all rivers tame down they make their
nest on the river.
They engage in arow—wives and children alll
together.
Once the rivers calm down
all housewives shackled in scriptural
throng to riverside breaking the bounds.
They perk like larje crytals
[Kurhigram : Masud Khan]

AMARBOI.COM

চর্যাপদ থেকে শুরু করে আদিবাসীদের ভাষা ও সাহিত্য, আঞ্চলিক শব্দ থেকে শুরু করে খিস্তি-খেউড় ব্যবহারের প্রবণতাও দেখা গিয়েছিল উত্তর-আধুনিকতা চর্চার প্রথম পর্বে। তবে শব্দের অনুষঙ্গে ছাড়া আর কোথাও এ-বিষয়ের তেমন কোনো প্রভাব পাওয়া যায়নি। অগ্রজ অনেক কবিই এসব বিষয় ও উপকরণকে কবিতায় ব্যবহার করে যশস্বী হয়েছেন এমন উদাহরণ অজস্র। তথাপি 'Postmodern Bangla Poetry'-তে এমন বেশ কিছু কবিতা পাওয়া যায় যাতে বিষয়ের চমৎকারিত্ব আছে। এগুলো কখনো কখনো পোস্টমডার্নের 'Remake' এবং 'Hyper-reality'র কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন—

১
I am quite delighted, the two kids also are delighted
They tell me, Uncle, we have never seen so many dead fishes.
Tell us about the price.'
But what a surprise! Nobody wants to talk about the price.
[Fish Market : Kamruzzaman Kamu]

২
Letters are always sent to the addresses

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

subject to the payment for the postage
But what about those recipients who are traceless
and who are exited to the forest?
[Return letter office : Shaheen Momtaz]

৩

Crushing the mirror (Crrhing only means atomic storm)
whan I pressed Mouri close to me... (here we have a magnetic
Island)
She of that moment.. (the offended force of gravilty)
Looked at me with silent eyes... (the signs are vague)
[Mouri : Moyeen Chowdhuri)

বাংলাদেশের ৪৫ জন কবির প্রায় একশো ত্রিশটি কবিতার ইংরেজি সংস্করণ স্থান পেয়েছে এ-সংকলনে। এতগুলো কবিতাকে ইংরেজিতে রূপ দেয়ার কাজটি দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ। এই বিশাল অনুবাদযজ্ঞে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যেকের নাম অনূদিত কবিতার সাথে মুদ্রিত হয়েছে। মাতৃভাষাই কবিতাকে আস্বাদনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। তবুও ইংরেজি ভাষাভাষী কবিতা-পাঠকদের কাছে বাংলাভাষার কবিতাকে পরিচিত করার এবং সেসাথে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার পোস্টমডার্ন প্রবণতাগুলোকে পাঠকের বিবেচনার জন্য তুলে ধরার এ-উদ্যোগের প্রশংসা তুষার গায়েন ও কামরুল হাসানসহ ভারতের দুজন সম্পাদকের প্রাপ্য। অনুবাদের ক্ষেত্রে ফুটনোটে আঞ্চলিক বা দেশী নাম শব্দের ব্যাখ্যা সংকলকদের তৎপরতা এবং সতর্কতার পরিচয় বহন করে। সাবলীল অনুবাদ এবং সমৃদ্ধ মুখবন্ধের সমন্বয়ে 'Postmodern Bangla Poetry' একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~